কেবল মিথ্যা কৈফিয়ৎ পেশ করিয়া আসিতেছে, তাহা হিসাব করিয়া লইবার কিছু নাই।

এই যখন অবস্থা, তখন অকস্মাৎ একদিন সায়াহ্ন বেলায় মাত্র জন দুই লোক সঙ্গে লইয়া নূতন ভূস্বামী আসিয়া গ্রামের কাছারী-বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন; পাল্কী হইতে অবতরণ পর্য্যন্ত করিলেননা, কেবল গোমস্তা এককড়ি নন্দীকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন যে তিনি দিনকয়েক শান্তিকুঞ্জে বাস করিবেন, এবং পরক্ষণেই গন্তব্য পথে চলিয়া গেলেন। আশঙ্কায় উৎকণ্ঠায় এককড়ির মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। হয়ত, সেখানে প্রবেশ করিবার পথ নাই, হয়ত সমস্ত দরজা-জানলা চোরে চুরি করিয়া লইয়া গেছে, হয়ত ঘরে-ঘরে বাঘ-ভালুকের দল বস-বাস করিয়া আছে,—তথায় কি যে আছে, আর কি যে নাই, তাহার কোন জ্ঞানই এককড়ির ছিলনা।

এই সন্ধ্যাবেলায় কোথায় লোকজন, কোথায় আলোর বন্দোবস্ত, কোথায় খাবার-দাবার আয়োজন—হঠাৎ এখন সে কি করিবে, কাহার শরণাপন্ন হইবে, চিন্তা করিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ ভারি এবং মাথা ঝিম্-ঝিম্ করিতে লাগিল। চাকুরি ত গেছেই,—সে যাক্, কিন্তু এই দুর্দ্দান্ত নবীন মনিবের যে সকল ইতিবৃত্ত সে ইতিমধ্যে লোক-পরম্পরায় সংগ্রহ করিতে পারিয়াছে, তাহার কোনটাই তাহাকে কোন ভরসা দিলনা। এবং এই যে খবর নাই, এত্তালা নাই, এই হঠাৎ শুভাগমন, এ যখন কেবল তাহারই জন্য, তখন, ইঁহারই জমিদারীতে বাস করিয়া ছেলে পুলে লইয়া কোথায় পালাইয়া যে সে আত্মরক্ষা করিবে, ইহার কোন কিনারাই তাহার চোখে পড়িলনা।

মনিবকে সে কখনো চোখে দেখে নাই,—তাহার প্রয়োজনই হয় নাই,—আজও সে সাহস করিয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারে নাই;

কিন্তু সঙ্কীর্ণ পথপ্রান্তে বাহকেরা অদৃশ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পাল্‌কির ছায়াচ্ছন্ন অভ্যন্তরে যে মুখের চেহারা তাহার মনশ্চক্ষে প্রতিফলিত হইয়া উঠিল, তাহা অতি ভয়ঙ্কর। তাহার অনেক গাফলতি অনেক চুরির এইবার যে একটা কঠোর বোঝা-পড়া সরজমিনে বসিয়া চলিতে থাকিবে, তাহার কোন অংশ আর কাহারও স্কন্ধে আরোপ করা সম্ভবপর হইবে কিনা, ইহাই যখন সে ভাবিবার চেষ্টা করিতেছিল, ঠিক এমনি সময়ে কাছারির বড় পেয়াদা ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে বেচারা তাগাদায় গিয়াছিল; পথের মধ্যে এই দুর্ঘটনার সম্বাদ পাইয়াছে। হাঁপাইতে হাঁপাইতে জিজ্ঞাসা করিল, নন্দী মশাই, হুজুর আস্‌ছেন না?

এককড়ি চোখ তুলিয়া শুধু বলিল, হুঁ।

বিশ্বম্ভর আশ্চর্য্য হইয়া ক্ষণকাল এককড়ির পাণ্ডুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পরে কহিল, হুঁ কি গো নন্দী মশাই? স্বয়ং হুজুর আস্‌ছেন যে!

এককড়ি মনে মনে একপ্রকার মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিল; বিকৃত স্বরে জবাব দিল, আস্‌ছেন ত আমি কোর্ব কি? খবর নেই, এত্তালা নেই,—হুজুর আস্‌ছেন! হুজুর বলে ত আর মাথা কেটে নিতে পারবেনা!

এই আকস্মিক উত্তেজনার অর্থ সহসা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া খানিকক্ষণ বিশ্বম্ভর মৌন হইয়া রহিল, কিন্তু তাহার মগজ যেমন পরিষ্কার তেম্‌নি ঠাণ্ডা, এবং পিয়াদা হইলেও গমস্তার সহিত সম্বন্ধটা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। এককড়িকে সে ভিতরে লইয়া গিয়া অতি অল্পকালের মধ্যেই সান্ত্বনা দান করিল, এবং মদের বোতল, মাংস এবং আনুসঙ্গিক আরও একটা বস্তুর গোপন ইঙ্গিত করিয়া এতবড় আশার বাণী শুনাইতেও ইতস্ততঃ করিলনা যে, পুরুষের ভাগ্যের সীমা যখন দেবতারাও নির্দ্দেশ

করিতে পারেননা, তখন হুজুরের নজরে পড়িলে নন্দী মশায়ের অদৃষ্টেও কেন যে একদিন সদরের নায়েবী পদ মিলিবেনা, এমন কথা কেহই জোর করিয়া বলিতে পারেননা।

অনতিকাল মধ্যেই এককড়ি যখন জন কয়েক লোক, গোটাদুই আলো এবং সামান্য কিছু ফল-মূল সংগ্রহ করিয়া লইয়া বিশ্বম্ভরকে সঙ্গে করিয়া শান্তিকুঞ্জের ভাঙা গেটের সম্মুখে উপস্থিত হইল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। দেখিল ইতিমধ্যেই কিছু-কিছু ডাল-পালা ভাঙিয়া ফেলিয়া পথটাকে চলনসই করা হইয়াছে; তথাপি, এই বনময় অন্ধকার পথে সহসা প্রবেশ করিতে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত কাহারও ভরসা হইলনা। এবং প্রবেশ করিয়াও পা ফেলিতে প্রতিপদেই তাহাদের গা ছমছম্ করিতে লাগিল। বিঘা দশেক ভূমি ব্যাপিয়া এই বন, সুতরাং পথও অল্প নহে, তাহা অতিক্রম করিবার দুঃখও অল্প নহে। কোথাও একটা দীপ নাই,—কেবল চাতালের একধারে যেখানে বাহকেরা পাল্‌কি নামাইয়া রাখিয়া একত্র বসিয়া ধূমপান করিতেছে তাহারই অদূরে একখণ্ড জ্বলন্ত শুষ্ককাষ্ঠ হইতে কতকটা স্থান যৎকিঞ্চিৎ আলোকিত হইয়াছে। খবর পাইয়া ভৃত্য আসিয়া এককড়িকে একটা ঘরের মধ্যে লইয়া গেল। সমস্ত কক্ষ মদের গন্ধে পরিপূর্ণ, এককোণে মিটমিট করিয়া একটা মোমবাতি জ্বলিতেছে এবং অপর প্রান্তে একটা ভাঙা তক্তপোষের উপর বিছানা পাতিয়া বীজ্‌গাঁয়ের জমিদার জীবানন্দ চৌধুরী বসিয়া আছেন। লোকটা অত্যন্ত রোগা, এবং ফর্সা; বয়স অনুমান করা অতিশয় কঠিন, কারণ উপদ্রবে অত্যাচারে মুখখানা শুকাইয়া যেন একেবারে কাঠের মত শক্ত হইয়া উঠিয়াছে। সম্মুখে সুরাপূর্ণ কাঁচের গেলাস, এবং তাহারই পার্শ্বে বিচিত্র আকারের একটা মদের বোতল প্রায় শেষ হইয়াছে। বালিশের তলা

হইতে একটা নেপালী কুক্‌রীর কিয়দংশ দেখা যাইতেছে এবং তাহারই সন্নিকটে একটা খোলা বাক্সর মধ্যে একজোড়া পিস্তল সাজান রহিয়াছে।

এককড়ি ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া হাতজোড় করিয়া দাঁড়াইল। তাহার মনিব কহিলেন, তোমার নাম এককড়ি নন্দী ? তুমিই এখানকার গমস্তা ?

ভয়ে এককড়ির হৃদ্‌পিণ্ড দুলিতেছিল, সে অস্ফুট কম্পিত কণ্ঠে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হুজুর !

সে ভাবিয়া আসিয়াছিল এইবার এই বাড়ীর কথা উঠিবে, কিন্তু হুজুর তাহার কোন উল্লেখ করিলেননা, শুধু জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কাছারীর তশিল কত ?

এককড়ি বলিল, আজ্ঞে, প্রায় হাজার পাঁচেক টাকা।

হাজার পাঁচেক ? বেশ। আমি দিন আষ্টেক আছি, তার মধ্যে হাজার দশেক টাকা চাই।

এককড়ি কহিল, যে আজ্ঞে।

তাহার মনিব বলিলেন, কাল সকালে তোমার কাছারীতে গিয়ে বোস্‌ব,— বেলা দশটা এগারোটা হবে,—তার পূর্ব্বে আমার ঘুম ভাঙেনা। প্রজাদের খবর দিয়ো।

এককড়ি সানন্দে মাথা নাড়িয়া কহিল, যে আজ্ঞে। কারণ ইহা বলা বাহুল্য যে খাজনার অতিরিক্ত টাকা আদায়ের গুরুভারে এককড়ি আপনাকে নিরতিশয় প্রপীড়িত বা বিপন্ন জ্ঞান করে নাই। সে পুলকিত চিত্তে কহিল, আমি রাত্রের মধ্যেই আজ চতুর্দ্দিকে লোক পাঠিয়ে দেব যেন্ কেউ না বল্‌তে পারে সে সময়ে খবর পায়নি।

জীবানন্দ মাথা হেলাইয়া সম্মতি দান করিলেন, এবং মদের পাত্রটা মুখে তুলিয়া সমস্তটা এক চুমুকে পান করিয়া সেটা ধীরে ধীরে রাখিয়া

দিতে দিতে বলিলেন, এককড়ি, তোমাদের এখানে বোধকরি বিলিতি মদের দোকান নেই। তা' না থাক্, যা' আমার সঙ্গে আছে তাতেই এ ক'টা দিন চলে যাবে, কিন্তু মাংস আমার রোজ চাই।

এককড়ি প্রস্তুত হইয়াই ছিল, কহিল, এ আর বেশি কথা কি হুজুর। মা চণ্ডীর সরেস মহাপ্রসাদ আমি রোজ হুজুরে দিয়ে যাবো।

হুজুর খুসী হইয়া কহিলেন, বেশ, বেশ। তারপরে বোতল হইতে কতকটা সুরা পাত্রে ঢালিয়া তাহা পান করিলেন, এবং মুখ মুছিতে মুছিতে বলিলেন, আরও একটা কথা আছে এককড়ি!

এককড়ির সাহস বাড়িতেছিল, কহিল, আজ্ঞে করুন?

তিনি মুখের মধ্যে গোটা দুই লবঙ্গ ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, দেখ এককড়ি, আমি বিবাহ করিনি,—বোধ হয় কখনো কোরবও না।

এককড়ি মৌন হইয়া রহিল। তখন এই মদ্যপ ভূস্বামী একটা শুষ্ক হাস্য করিয়া কহিলেন, কিন্তু তাই বলে আমি ভীষ্মদেব,—বলি মহাভারত পড়েচ ত?—তার ভীষ্মদেব সেজেও বসিনি,—শুকদেব হয়েও উঠিনি,—বলি, কথাটা বুঝলে ত এককড়ি? ওটা চাই।

এককড়ি লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া একটুখানি ঘাড় নাড়িল, মুখ ফুটিয়া জবাব দিতে পারিলনা। কিন্তু যে নির্লজ্জ উক্তিতে জমিদারের গমস্তার পর্য্যন্ত লজ্জা বোধ হয়, একথা যিনি অবলীলাক্রমে উচ্চারণ করিলেন তিনি ইহা গ্রাহ্যও করিলেননা, কহিলেন, অপর সকলের মত চাকরকে দিয়ে এ সব কথা বলাতে আমি ভালবাসিনে, তাতে ঠক্‌তে হয়। আচ্ছা এখন যাও। আমার বেহারাদের খাওয়া-দাওয়ার যোগাড় করে দিয়ো;—ওরা তাড়িটা আস্‌টাও বোধ করি খায়। সেদিকেও একটু নজর রেখো। আচ্ছা যাও।

এককড়ি মাথা নাড়িয়া সায় দিয়া আর এক দফা ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল, হুজুর হঠাৎ ডাকিয়া প্রশ্ন করিলেন, এ গাঁয়ে দুষ্ট বজ্জাত প্রজা কেউ আছে জানো ?

এককড়ি ফিরিয়া দাঁড়াইল। এইখানে তাহার অনেকদিনের একটা পুরাতন ক্ষত ছিল,—মনিবের প্রশ্নটা ঠিক সেইখানেই আঘাত করিল। কিন্তু বেদনাটাকে সে একটা সংযমের আবরণ দিয়া নিরুৎসুক কণ্ঠে কহিল, আজ্ঞে, না, তা' এমন কেউ,—শুধু তারাদাস চক্কোত্তি,—তা' সে : আবার হুজুরের প্রজা নয়

তারাদাসটা কে ?

এককড়ি কহিল, গড়চণ্ডীর সেবায়ৎ।

এই সেবায়ৎদিগের সহিত জমিদারী সংস্পর্শে এককড়ির অনেক কলহ-বিবাদ হইয়া গেছে, কিন্তু সে জন্য তাহার বিশেষ কোন ক্ষোভ ছিলনা। কিন্তু বৎসর দুই পূর্ব্বে একটা পাকা কাঁঠাল গাছ লইয়া যে লড়াই বাধে, সে জ্বালা তাহার যায় নাই। কারণ কাঁঠালের তক্তাগুলা ছিল তাহার নিজের বাটীর জন্য এবং সেই হেতু শেষ পর্য্যন্ত তাহাকেই নতি স্বীকার করিয়া গোপনে মিটমাট করিয়া লইতে হয়।

এককড়ি কহিতে লাগিল, কি কোর্‌ব হুজুর, সদরে আর্জ্জি কোরে সুবিচার পাইনে,—দেওয়ানজী গেরাহ্যিই করেননা—নইলে চক্কোত্তিকে টিট্ করতে কতক্ষণ লাগে! কিন্তু এও নিবেদন করচি, হুজুর, আস্‌কারা দিলে ওরা প্রজা বিগ্‌ড়ে দেবে,—তখন গাঁ শাসন করা ভার হবে।

হুজুরের কিন্তু নেশা বাড়িয়া উঠিতেছিল, তিনি নিস্পৃহ জড়িত কণ্ঠে বলিলেন, তুমি তারাদাসের নামটাই ত করলে, এককড়ি—আবার ওরা এল কারা ?

এককড়ি কহিল, চক্কোত্তির মেয়ে ভৈরবী। নইলে চক্কোত্তি মশাই নিজে তত লোক মন্দ নয়, কিন্তু মেয়েটাই হচ্চে আসল সর্ব্বনাশী। দেশের যত বোম্বেটে বদ্‌মাস্‌ গুলো হয়েছে যেন একেবারে তার গোলাম।

জমিদার বাবুর কানে বোধ করি সমস্ত কথাগুলা পৌঁছিল না। তিনি তেম্‌নি অস্ফুটস্বরে বলিলেন, হবারই কথা। কত বয়স? দেখ্‌তে কেমন?

এককড়ি কহিল, বয়স তেইশ চব্বিশ হতে পারে। আর রূপের কথা যদি বলেন হুজুর, ত সে যেন এক কাট-খোট্টা সেপাই। না আছে মেয়েলি ছিরি, না আছে মেয়েলি ছাঁদ। যেন চুয়াড়, যেন হাতিয়ার বেঁধে লড়াই করতে চলেচে। তাতেই ত দেশের ছোটলোকগুলো মনে করে গড়ের উনিই হচ্চেন সাক্ষাৎ চণ্ডী।

জীবানন্দ অকস্মাৎ সোজা উঠিয়া বসিলেন। উৎসাহ ও কৌতূহলে দুই রক্তচক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, বল কি এককড়ি? ব্যাপারটা কি খুলে বল ত শুনি? না হয় চুয়াড়ের মতই দেখ্‌তে, তবু ত গৃহস্থ ব্রাহ্মণের মেয়ে,—সর্ব্বনাশীই বা হোল কি কোরে, আর বোম্বাটে বদ্‌মাসের দলই বা তার জুটল কোথা থেকে?

এককড়ি কহিল, তা' আর আশ্চয্যি কি হুজুর! এই বলিয়া সে ভৈরবীর যে ইতিহাসটা দিল তাহা সংক্ষেপে এইরূপ—

সে কহিল, ভৈরবী কাহারও নাম নয়, গড়চণ্ডীর প্রধান সেবিকাদের ইহা একটা সাধারণ উপাধি। যেমন বর্ত্তমান ভৈরবীর নাম ষোড়শী এবং ইহার পূর্ব্বে যিনি ছিলেন তাহার নাম ছিল মাতঙ্গিনী ভৈরবী। মাতার আদেশে তাঁহার সেবায়ৎ কখনও পুরুষ হইতে পারেনা, মেয়েরাই এ পদ চিরদিন অধিকার করিয়া আসিতেছে।

আন্দাজ বৎসর পোনের ষোল হইবে হঠাৎ একদিন জানা যায় মাতঙ্গিনী ভৈরবীর স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে। কথাটা অনেক কষ্টে যখন সত্য বলিয়াই প্রমাণিত হয়, তখন বাধ্য হইয়া মাতঙ্গিনীকে পদত্যাগ করিয়া কাশী চলিয়া যাইতে হয়।

জীবানন্দ এতক্ষণ চুপ করিয়া শুনিতেছিলেন, আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিলেন, বিধবা হলে বুঝি ভৈরবী-গিরী খারিজ হয়ে যায়?

এককড়ি কহিল, হাঁ হুজুর।

তাই বুঝি তিনি স্বামীটিকে অজ্ঞাতবাসে পাঠিয়েছিলেন?

এককড়ি বলিল, সে ছাড়া আর ত কোন উপায় নেই হুজুর। মায়ের আদেশে বিয়ের তেরাত্রি পরে স্বামীকে আর ভৈরবীর স্পর্শ করবারও যো নেই। তাই, দূর দেশে থেকে দুঃখী গরীবের একটা ছেলে ধরে এনে বিয়ে দিয়ে পরের দিনই টাকাকড়ি দিয়ে সেই যে বিদায় করা হয়, আর কখনো কেউ তার ছায়া পর্য্যন্ত দেখ্‌তে পায়না। এই-ই নিয়ম, এই-ই চিরকাল ধরে হয়ে আস্‌চে।

জীবানন্দ সহাস্যে কহিলেন, বল কি এককড়ি, একেবারে দেশান্তর? ভৈরবী মানুষ, রাত্রে নিরিবিলি একপাত্র সুধা ঢেলে দেওয়া—গরম মশলা দিয়ে চাট্টি মহাপ্রসাদ রেঁধে খাওয়ানো,—একেবারে কিছুই কর্‌তে পায়না?

এককড়ি মাথা নাড়িয়া বলিল, না হুজুর, মায়ের ভৈরবীকে স্বামী স্পর্শ করতে নেই। কিন্তু তাই বলে কি স্বামী ছাড়া গাঁয়ে আর পুরুষ নেই? মাতু ভৈরবীকেও দেখেচি, ষোড়শী ভৈরবীকেও দেখ্‌চি। লোক-গুলো কি আর থামকা তার পায়ে-পায়ে জড়ায়! কথায় কথায় হুজুরে সঙ্গেই মামলা-মকদ্দমা বাধিয়ে দেয়!

জীবানন্দ হাসিয়া কহিলেন, মেয়ে-মোহন্ত আর কি! তাতে দোষ নেই। কিন্তু মাতুর পরে ইনি জুটলেন কি কোরে?

এককড়ি বলিল, চক্কোত্তি মশাই হচ্চেন মাতঙ্গিনীর ভাগ্নে। ঢাকা না কোথায় কোন্ মহাজনের আড়তে খাতা লিখ্‌ছিলেন, চিঠি পেয়ে চলে এলেন,—সঙ্গে একটা বছর দশেকের মেয়ে। কোথা থেকে একটা পাত্রও জুটিয়ে আন্‌লেন—কি জাত, কার ছেলে, কোথায় ঘর—রাতারাতি বিয়ে হোল, রাতারাতি চালান্ দিয়ে দিলেন—তারপরে দিব্যি গদিতে বসিয়ে রাজ ভোগে আছেন। কেবা কথা কয়, কেবা জিজ্ঞেসা করে? গাঁয়েও মানুষ নেই,—রাজারও শাসন নেই! এই বলিয়া সে জমিদারকেই কটাক্ষ করিল। কিন্তু চাহিয়া বুঝিল এ বক্রোক্তি নিষ্ফল হইয়াছে। রাজা নিমীলিত চক্ষে এক নিমিষেই যেন তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কোন কথা নাই,—পাছে তাহার কিছুমাত্র অবিবেচনায় এই তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া যায়, এই ভয়ে সে পুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চল দাঁড়াইয়া মনে মনে মাতালের পিতৃপুরুষের আদ্যশ্রাদ্ধ করিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া যাইবে কিনা ভাবিতেছিল, এমনি সময়ে জীবানন্দ ঠিক সহজ মানুষের মতই পুনরায় কথা কহিলেন। বলিলেন, বছর পোনের পূর্ব্বে না? আচ্ছা, এই তারাদাস লোকটা কি দেখ্‌তে খুব বেঁটে আর ফর্সা?

এককড়ি কহিল, না হুজুর, চক্কোত্তি মশায়ের রঙ্ ফর্সা বটে, কিন্তু ইনি খুব দীর্ঘাঙ্গ।

দীর্ঘাঙ্গ? আচ্ছা, লোকটা যে ঢাকায় মহাজনের গদিতে খাতা লিখ্‌ত এ তুমি জান্‌লে কি কোরে? এমন ত হতে পারে সে কলকাতায় রাঁধুনি বামনের কাজ কোরত?

এককড়ি মাথা নাড়িয়া বলিল, না হুজুর, সত্যিই তিনি খাতা

লিখ্‌তেন। তাঁর ছ'মাসের মাইনে বাকি ছিল, আমিই নালিশ কর্‌বার ভয় দেখিয়ে চিঠি লিখে টাকাটা আদায় করে দিই।

জীবানন্দ কহিলেন তা'হলে সত্যি। আচ্ছা, এই লোকটাই কি বছর পাঁচেক পূর্ব্বে একটা প্রজা উত্‌খাতের মামলায় মামার বিপক্ষে সাক্ষী দিয়েছিল?

এককড়ি মস্ত একটা মাথার ঝাঁকানি দিয়া বলিল, হুজুরের নজর থেকে কিছুই এড়ায়না। আজ্ঞে, এই সেই তারাদাস।

জীবানন্দ ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া কহিলেন, হুঁ। সেবার অনেক টাকার ফেরে ফেলে দিয়েছিল। এরা কতখানি জমি ভোগ করে?

এককড়ি মনে মনে হিসাব করিয়া বলিল, পঞ্চাশ বাট বিঘের কম নয়।

জীবানন্দ মুহূর্ত্ত কাল মৌন থাকিয়া কহিলেন, কাল তুমি নিজে গিয়ে একে জানিয়ে এসো যে বিঘে পিছু দশটাকা আমার নজর চাই। আমি আট দিন আছি।

এককড়ি কুণ্ঠিত এবং সঙ্কুচিত হইয়া কহিল, আজ্ঞে, সে যে নিষ্কর দেবোত্তর, হুজুর।

না, দেবোত্তর এ গাঁয়ে এক ফোঁটা নেই। সেলামি না পেলে সমস্ত বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে।

এককড়ি নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল। সে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের জন্য নয়, তাঁহার কন্যা কাটখোট্টা ষোড়শী ভৈরবীর কথাই স্মরণ করিয়া। জমিদার ত একদিন চলিয়া যাইবেন, কিন্তু তাহাকে যে এই গ্রামেই বাস করিতে হইবে। একবার সে অস্ফুটে বলিতেও গেল,—কিন্তু হুজুর—

কিন্তু বক্তব্যটা উহার অধিক অগ্রসর হইতে পাইলনা। হুজুর মাঝখানেই থামাইয়া দিয়া কহিলেন, কিন্তু এখন থাক্‌ এককড়ি। আমার

টাকার, রেকার,—পাঁচ ছ'শ টাকা আমি ছাড়তে পারবনা, ওটা তাদের দিতেই হবে। কাল চক্রবর্ত্তীকে খবর দিয়ো যেন কাছারিতে হাজির থাকে। দলিল পত্র কিছু থাকে ত তাও সঙ্গে আন্‌তে পারে। রাত হ'ল, এখন তুমি যেতে পারো। লোকজনদের খাবার বন্দোবস্ত করে দিও,—সদরে ফিরে তোমাকে মনে রাখ্‌ব।

হুজুর মা বাপ! বলিয়া এককড়ি আর একদফা ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

২

জমিদার জীবানন্দ চৌধুরী মাত্র পাঁচদিন চণ্ডীগড়ে পদার্পণ করিয়াছেন, এইটুকু সময়ের অনাচার ও অত্যাচারে সমস্ত গ্রামখানা যেন জ্বলিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। নজরের টাকাও আদায় হইতেছে, কিন্তু সে যে কি করিয়া হইতেছে তাহা জমিদার সরকারে চাকরি না করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করাও পাগ্লামি।

তারাদাস চক্রবর্ত্তী আদেশ মত প্রথম দিন হাজির হইয়া নজর দিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন, এমন কি ছয় ঘণ্টা কাল-তীক্ষ্ণ রৌদ্রে খাড়া দাঁড়াইয়াও স্বীকার করেন নাই। কিন্তু সর্ব্বসমক্ষে কান ধরিয়া ওঠ্-বোস, ঘোড়দৌড় এবং ব্যাঙের নাচ নাচাইবার প্রস্তাবে আর ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। চণ্ডী মাতার নিকট কায়মনে জমিদার গোষ্ঠীর বংশ-লোপের আবেদন করিয়া, প্রকাশ্যে, পাঁচ দিনের করাড়ে টাকা আদায় দিবার অঙ্গীকারে অব্যাহতি পাইয়া বাড়ী আসেন। আজ সেই দিন, কিন্তু সকাল হইতে কোথাও তাঁহাকে দেখা যাইতেছেনা।

ইতিমধ্যে প্রত্যহ মহাপ্রসাদ যোগাইতে হইয়াছে; পুকুরের মাছ, বাগানের ফল মূল, চালের লাউকুমড়া জমিদারের লোক যথেচ্ছা টানিয়া ছিঁড়িয়া লইয়া গেছে,—ষোড়শী প্রতিবাদ করিতে চাহিয়াছে, কিন্তু তারাদাস কিছুতেই একটা কথাও কহিতে দেয় নাই, তাহার হাতে ধরিয়া কাঁদাকাটা করিয়া যেমন করিয়া হোক নিবৃত্ত করিয়া রাখিয়াছে। পিতার অপমান হইতে আরম্ভ করিয়া এই সকল নির্য্যাতন সে কোনমতে এতদিন সহিয়াছিল, কিন্তু আজিকার ঘটনায় তাহার সমস্ত সঞ্চিত

ক্রোধ এক মুহূর্তে অগ্ন্যুৎপাতের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। পিতার নিঃশব্দ অন্তর্ধানের হেতু ও তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলাফলের ভার তাহার একাকী মন যেন আজ আর বহিতে পারিতেছিলনা। এমনি করিয়া সমস্ত সকাল ও মধ্যাহ্ন যখন অপরাহ্ণে গড়াইয়া পড়িল, তখন রাত্রের অন্ধকারে উপবাসী পিতার গোপনে ফিরিয়া আসার প্রত্যাশা করিয়া সে দুটা রাঁধিতে বসিয়াছিল, এমন সময়ে মন্দিরের পরিচারিকা আসিয়া যে অত্যাচার বর্ণনা করিল, তাহা এই—

মাতাল ভূস্বামীর হঠাৎ খেয়াল হইয়াছে যে অতঃপর নিষিদ্ধ মাংস ত নহেই, এমন কি বৃথা মাংসও ভোজন করিবেননা। অথচ পাঁঠার মাংস যথেষ্ট সুস্বাদু বা রুচিকর নহে। তাই আজ জমিদারের লোক ডোমপাড়া হইতে একটা খাসি আনিয়া মন্দিরে হাজির করে, এবং তাহাকে মহাপ্রসাদ করিয়া দিতে বলে। পুরোহিত প্রথমটা আপত্তি করে, কিন্তু শেষে আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া উহাকেই উৎসর্গ করিয়া যথারীতি বলি দিয়া দেবীর মহাপ্রসাদ করিয়া দেয়।

শুনিবামাত্রই ষোড়শী হাঁড়িটা দুম্ করিয়া চুলা হইতে নামাইয়া দিয়া ক্রোধে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া দ্রুতবেগে মন্দিরে চলিয়াছিল, বহির্দ্বারে জন চারেক হিন্দুস্থানী পাইক তাহার গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইল। বিশ্বম্ভর দূর হইতে বাড়ীটা দেখাইয়া দিয়া সরিয়া পড়িল। ইহারা জমিদারের পাল্‌কি-বেহারা। মুখে তাড়ির দুর্গন্ধ, চোখগুলা রাঙা—অত্যন্ত উৎশৃঙ্খল অবস্থা। যে লোকটা বাঙ্‌লা শিখিয়াছে, সে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিল, শালা ঠাকুর মোশাই ঘোরে আছে? শালা টাকা দেবেনা ভেগে ফির্‌চে।

ষোড়শী চাহিয়া দেখিল কোথাও কেহ নাই। পাছে এই দুর্বিনীত

মদ-মত্ত পশুগুলা হঠাৎ তাহাকেই অপমান করিয়া বসে। এই ভয়ে সে দুর্জ্জয় ক্রোধ প্রাণপণে সম্বরণ করিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, না, বাবা বাড়ী নেই।

কোথা ছিপ্ছে?

আমি জানিনে, বলিয়া ষোড়শী পাশ কাটাইবার চেষ্টা করিতেই লোকটা হাত বাড়াইয়া একটা অত্যন্ত অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করিয়া কহিল, না আছে ত তুই চোল্। গোলায় গামছা লাগায়ে খিঁচে লিয়ে যাবো।

এ অপমান ষোড়শীকে একেবারে আত্মহারা করিয়া ফেলিল; সে প্রচণ্ড একটা ধমক্ দিয়া কহিল, খবরদার বল্চি। চ্ আমিই যাবো,—তোদের মাতালটা আমাকে কি করতে পারে দেখিগে। বলিয়া সে পরিণাম-ভয়হীন উন্মাদিনীর ন্যায় নিজেই দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া চলিল।

পথে দুই এক জন পরিচিত লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল; কিন্তু ষোড়শী ভ্রূক্ষেপও করিলনা। জমিদারের লোকগুলা পিছনে হল্লা করিয়া চলিয়াছে, ইহার অর্থ পল্লীগ্রামের কাহাকেও বুঝাইয়া বলা নিষ্প্রয়োজন বলিয়াই শুধু নয়, কাহারও সাহায্য ভিক্ষা করিয়া এতবড় অবমাননাকে আর নিজের মুখে চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া দিতে তাহার কিছুতেই প্রবৃত্তি হইলনা।

কাছারি বাড়ী বেশি দূরে নয়, এককড়ি সম্মুখেই ছিল। সে দেখিবামাত্রই বলিয়া উঠিল, আমি জানিনে,—কিছুই আমি জানিনে—সর্দ্দারজী, হুজুরের কাছে নিয়ে যাও। বলিয়া সে শান্তি কুটীরের উদ্দেশে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া তাড়াতাড়ি গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

এতক্ষণে ষোড়শী নিজের বিপদের গুরুত্ব সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিল।

কোথায় যাইতে হইবে বুঝিয়াও জিজ্ঞাসা করিল, আমাকে কোথায় যেতে হবে?

লোকটা এককড়ির প্রদর্শিত দিকটা নির্দ্দেশ করিয়া কেবল কহিল, চল্।

এ যাইতেই হইবে, তবুও কহিল, আমার কাছে ত টাকা নেই সর্দ্দার, হুজুরের কাছে আমাকে নিয়ে গিয়ে তোমাদের কি লাভ হবে?

কিন্তু সর্দ্দার বলিয়া যাহাকে ভিক্ষা জানানো হইল, সে এই আবেদনের ধার দিয়াও গেলনা। শুধু প্রত্যুত্তরে একটা বিশ্রী ভঙ্গী করিয়া বলিল, চল্ মাগী চল্।

আর ষোড়শী কথা কহিলনা। এই লোকগুলা স্থানান্তর হইতে আসিয়াছে, তাহার মর্য্যাদার কোন ধারণাই ইহাদের নাই। সুতরাং টাকার জন্য, খাজনার জন্য নর-নারী নির্বিচারে সামান্য প্রজার প্রতি যে আচরণে নিত্য অভ্যস্ত, এ ক্ষেত্রেও তাহার কোন ব্যতিক্রম হইবেনা। অনুনয় বিনয় নিষ্ফল, কাঁদা-কাটায় কেহ সাহায্য করিতে আসিবেনা। অবাধ্য হইলে হয়ত পথের মধ্যেই টানা-হেঁচড়া বাধাইয়া দিবে। প্রকাশ্য রাজপথে অপমানের এই চরম কদর্য্যতার চিত্র তাহাকে মুখ বাঁধিয়া যেন সুমুখের দিকে ঠেলিয়া দিল। পথে রাখাল বালকেরা গরু লইয়া ফিরিয়াছে, কৃষকেরা দিনের কর্ম্ম শেষ করিয়া বোঝা মাথায় ঘরে চলিয়াছে,—সবাই অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল; ষোড়শী কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাত করিলনা, কাহাকেও কিছু বলিবার উদ্যম করিলনা, কেবল মনে মনে কহিতে লাগিল, মা ধরিত্রী, দ্বিধা হও!

সূর্য্য অস্ত গেল, অন্ধকার অগ্রসর হইয়া আসিল। সে যন্ত্রচালিত

পুতুলের মত নীরবে শান্তি কুটীরের গেটের মধ্যে প্রবেশ করিল ; প্রাণ্রিবার, আপত্তি করিবার কোথাও এতটুকু চেষ্টা পর্য্যন্ত করিলনা।

যে ঘরে আনিয়া তাহাকে হাজির করা হইল, এটা সেই ঘর এককড়ি যেখানে সেদিন প্রবেশ করিয়া ভয়ে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল। তেমনি আবর্জ্জনা, তেমনি মদের গন্ধ। সাদা, কালো, লম্বা, বেঁটে, নানা আকারের শূন্য মদের বোতল চারিদিকে ছড়ানো। শিয়রের দেয়ালে খান দুই চক্‌চকে ভোজালে টাঙানো, এক কোণে একটা বন্দুক ঠেস দিয়া রাখা, হাতের কাছে একটা ভাঙা তেপায়ের উপর এক জোড়া পিস্তল,—অদূরে ঠিক সুমুখের বারান্দায় কি একটা বন্য পশুর কাঁচা চামড়া ছাদ হইতে ঝুলানো—তাহারি বিকট দুর্গন্ধ মাঝে মাঝে নাকে লাগিতেছে। বোধ হয় খানিক পূর্ব্বেই গুলি করিয়া একটা শিয়াল মারা হইয়াছে ; সেটা তখন পর্য্যন্ত মেঝেয় পড়িয়া,—তাহারই রক্ত গড়াইয়া কতকটা স্থান রাঙা হইয়া আছে। জমিদার শয্যার উপরে চিত হইয়া শুইয়া কি একখানা বই পড়িতেছিলেন। মাথার কাছে আর একটা মোটা বাঁধানো বইকে বাতিদান করিয়া মোমবাতি জ্বালানো হইয়াছে ; সেই আলোকে চক্ষের পলকে অনেক বস্তুই যোড়শীর চোখে পড়িল। বিছানায় বোধ করি কেবল চাদরের অভাবেই একটা বহুমূল্যের শাল পাতা, তাহার অনেকখানিই মাটিতে লুটাইতেছে ; দামী সোণার ঘড়িটার উপরে আধ-পোড়া একখণ্ড চুরুট হইতে তখনও ধূমের সূক্ষ্ম রেখাটা ঘুরিয়া ঘুরিয়া উপরে উঠিতেছে ; খাটের নীচে একটা রূপার পাত্রে ভুক্তাবশিষ্ট কতকগুলা হাড়-গোড় হয়ত সকাল হইতেই পড়িয়া আছে ; তাহারই কাছে পড়িয়া একটা জরি-পাড়ের ঢাকাই চাদর,—বোধ হয় হাতের কাছে হাত মুছিবার রুমাল বা গামছার অভাবেই ইহাতে হাত মুছিয়া ফেলিয়া দিয়াছে।

বইয়ের ছায়ায় লোকটার মুখের চেহারা ষোড়শী দেখিতে পাইলনা, কিন্তু তবুও তাহার মনে হইল ইহাকে সে আয়নার মত স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছে। ইহার ধর্ম্ম নাই, পুণ্য নাই, লজ্জা নাই, সঙ্কোচ নাই—এ নির্ম্মম, এ পাষাণ! ইহার মুহূর্ত্তের প্রয়োজনের কাছেও কাহারও কোন মূল্য কোন মর্য্যাদা নাই! এই পিশাচ-পুরীর অভ্যন্তরে এই ভয়ঙ্করের হাতের মধ্যে আপনাকে একান্ত ভাবে কল্পনা করিয়া ক্ষণকালের জন্য ষোড়শীর সকল ইন্দ্রিয় যেন অচেতন হইয়া পড়িতে চাহিল।

সাড়া পাইয়া লোকটা জিজ্ঞাসা করিল, কে?

বাহিরে হইতে সর্দ্দার ঘটনাটা সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া চক্রবর্ত্তীর উদ্দেশে একটা অকথ্য গালি দিয়া কহিল, হুজুর! উস্‌কো বেটিকো পাকড় লায়া।

কাকে? ভৈরবীকে? বলিয়া জীবানন্দ বই ফেলিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। বোধ হয় এ হুকুম সে দেয় নাই। কিন্তু, পরক্ষণেই কহিল, ঠিক হয়েছে। আচ্ছা যা।

তাহারা চলিয়া গেলে ষোড়শীকে উদ্দেশ করিয়া প্রশ্ন করিল, তোমাদের আজ টাকা দেবার কথা। এনেচ?

ষোড়শীর শুষ্ক কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া রহিল, কিছুতেই স্বর ফুটিলনা।

জীবানন্দ ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া পুনরায় কহিল, আনোনি জানি। কিন্তু কেন?

এবার ষোড়শী প্রাণপণ চেষ্টায় জবাব দিল। আস্তে আস্তে বলিল, আমাদের নেই।

না থাকলে সমস্ত রাত্রি তোমাকে পাইকদের ঘরে আটক থাকতে হবে। তার মানে জানো?

ষোড়শী দ্বারের চৌকাটটা দুই হাতে সবলে চাপিয়া ধরিয়া চোখ বুজিয়া

নীরব হইয়া রহিল। অসম্ভব বলিয়া সে এখানে কিছুই ভাবিতেও পারিলনা।

তাহার এই ভয়ানক বিবর্ণ মুখের চেহারা দূর হইতেও বোধ হয় জীবানন্দের চোখে পড়িল, এবং মূর্চ্ছা হইতে তাহার এই আত্মরক্ষার চেষ্টাটাও বোধ হয় তাহার অগোচর রহিলনা; মিনিট খানেক সে নিজেও কেমন যেন আচ্ছন্নের ন্যায় বসিয়া রহিল। তার পরে বাতির আলোটা হঠাৎ হাতে তুলিয়া লইয়া এই মৃতকল্প অচেতনপ্রায় রমণীর একেবারে মুখের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। এবং আরতির পূর্ব্বে পূজারী যেমন করিয়া দীপ জ্বালিয়া প্রতিমার মুখ নিরীক্ষণ করে, ঠিক তেমনি করিয়া এই মহা পাপিষ্ঠ স্তব্ধ গম্ভীর মুখে এই সন্ন্যাসিনীর নিমীলিত চক্ষের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া তাহার গৈরিক বস্ত্র, তাহার এলায়িত রুক্ষ কেশভার, তাহার পাণ্ডুর ওষ্ঠাধর, তাহার সবল সুস্থ ঋজু দেহ, সমস্তই সে যেন দুই বিস্ফারিত চক্ষু দিয়া নিঃশব্দে গিলিতে লাগিল।

নারীর একজাতীয় রূপ আছে যাহাকে যৌবনের অপর প্রান্তে না পৌঁছিয়া পুরুষে কোন দিন দেখিতে পায়না। সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব অদ্ভুত নারী-রূপই আজ ষোড়শীর তৈলহীন বিপর্য্যস্ত চুলে তাহার উপবাস কঠিন দেহে, তাহার নিপীড়িত যৌবনের রুক্ষতায়, তাহার উৎসাদিত প্রবৃত্তির শুষ্কতায়, শূন্যতায়,—তাহার সকল অঙ্গে অঙ্গে এই প্রথম জীবানন্দের চক্ষের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হইয়া দেখা দিয়াছে।

রমণীর দেহ লইয়া যাহার বীভৎস লীলা এই বিশবর্ষ ব্যাপিয়া অবাধে বাহিয়াছে,—কত শোভা, কত লজ্জা, কত মাধুর্য্যই যে এই ব্যভিচারের ঘূর্ণাবর্ত্তে অতলে তলাইয়াছে তাহার দাগটুকু পর্য্যন্ত পাষণ্ডের মনে নাই; লালসার সেই অগ্নিজিহ্বা আজ যখন অকস্মাৎ বাধা পাইল, তখন কিছুক্ষণের জন্য এই অপরিচিত বিস্ময়ে তাহার মদোন্মত্ত বিকৃত দৃষ্টি স্তব্ধ, গম্ভীর এবং আবিষ্ট হইয়া রহিল।

ভৈরবীকে মাথায় কাপড় দিতে নাই, সে অধোমুখে চোখ বুজিয়া হতজ্ঞানের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল, কিন্তু জীবানন্দ নীরবে ফিরিয়া গিয়া আলোটা রাখিয়া দিল, এবং মদের বোতল হইতে কয়েক পাত্র উপর্য্যুপরি পান করিতে লাগিল।

মিনিট পোনর এই ভাবে নিঃশব্দে কাটিয়া গেলে হঠাৎ একসময়ে সে সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল। মনে হইল এতক্ষণে সে তাহার মূৰ্চ্ছিত-প্রায় পশুপ্রকৃতিটাকে চাবুক মারিয়া মারিয়া উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছে। প্রশ্ন করিল তোমার নাম ষোড়শী, না?

এ পক্ষ হইতে কোন সাড়া আসিলনা।

জীবানন্দ পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিল, তোমার বয়স কত?

কিন্তু তথাপি কোন উত্তর না পাইয়া তাহার কণ্ঠস্বর কঠিন হইল, কহিল, চুপ করে থেকে বিশেষ কোন লাভ হবেনা। জবাব দাও।

ষোড়শী অনেক কষ্টে মৃদুস্বরে কহিল, আমার বয়স আটাশ।

জীবানন্দ বলিল, বেশ। তা'হলে খবর যদি সত্যি হয় ত এই উনিশ কুড়ি বৎসর ধরে তুমি ভৈরবীগিরী কর্‌চ; খুব সম্ভব অনেক টাকা জমিয়েচ। দিতে পার্‌বে না কেন?

ষোড়শী তেম্‌নি আস্তে আস্তে উত্তর দিল, আপনাকে ত আগেই জানিয়েছি আমার টাকা নেই।

এই সশঙ্ক মৃদু কণ্ঠস্বরের মধ্যেও যে সত্যের দৃঢ়তা ছিল তাহা জমি-দারের কানে বাজিল। সে এ লইয়া আর তর্ক করিলনা; কহিল, বেশ, তা'হলে আরও দশ জনে যা কর্‌চে তাই কর। যা'দের টাকা আছে তা'দের কাছে জমি বাঁধা দিয়ে হোক্‌, বিক্রী করে হোক্‌ দাওগে।

ষোড়শী কহিল, তারা পারে, জমি তাদের। কিন্তু দেবতার সম্পত্তি বাঁধা দেবার, বিক্রী করবার ত আমার অধিকার নেই।

জীবানন্দ এক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ হাসিয়া বলিল, নেবার অধিকার কি ছাই আমারই আছে? এক কপর্দ্দকও না। তবুও নিচ্চি, কেন না আমার চাই। এই 'চাই'টাই হচ্চে সংসারে খাঁটি অধিকার। তোমারও যখন দেওয়া চাই-ই, তখন—বুঝলে?

ষোড়শী নিঃশব্দে স্থির হইয়া রহিল; জীবানন্দ কহিতে লাগিল, ভাবে মনে হয় তুমি লেখাপড়া কিছু জানো; তা' যদি হয় তজমিদারের প্রাপ্যটা নিয়ে আর হাঙ্গামা কোরো না, দিয়ো।

ষোড়শী এবার সাহস করিয়া মুখ তুলিয়া কহিল, ওটা কি আপনি জমিদারের প্রাপ্য বল্‌তে চান?

জীবানন্দ কহিল, না, প্রাপ্য বল্‌তে চাইনে; ওটা তোমাদের দেয় এই বল্‌তে চাই। তোমার মনে হ'তে পারে বটে, অন্য জমিদারকে ত দিতে হয়নি। তার কারণ, তাঁরা আমার মত সরল ছিলেননা। স্পষ্ট করে দাবী করেননি, কিন্তু প্রায় সমস্ত গ্রামখানাই ধীরে ধীরে বে-দখল করে নিয়েছেন। তাঁরা একরকম বুঝেছিলেন, আমি একরকম বুঝি। যাক্‌, এত রাত্রে কি একা বাড়ী যেতে পারবে? যাদের সঙ্গে তুমি এসেছিলে তাদের আর সঙ্গে দিতে চাইনে।

এতক্ষণ ও এতগুলা কথাবার্ত্তায় ষোড়শীর ভয়টাও কতকটা অভ্যাস হইয়া আসিতেছিল, সে সবিনয়ে কহিল, আপনার হুকুম হলেই যেতে পারি।

জীবানন্দ সবিস্ময়ে কহিল, একলা? এই অন্ধকার রাত্রে? ভারি কষ্ট হবে যে! এই বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

তাহার কথা ও হাসির ইঙ্গিত এতই স্পষ্ট যে, যে আশঙ্কা ষোড়শীর কমিতেছিল, তাহাই একেবারে চতুর্গুণ হইয়া ফিরিয়া আসিল। সে মাথা নাড়িয়া ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর দিল, না আমাকে এখুনি যেতেই হবে। বলিয়া পা বাড়াইবার উদ্যোগ করিতেই জীবানন্দ তেমনি সহাস্যে কহিল, বেশ ত, টাকা না হয় নাই দেবে ষোড়শী। তা' ছাড়া আরও অনেক রকমের সুবিধে—

কিন্তু প্রস্তাব শেষ হইতে পাইলনা। ইহার মুখে নিজের নাম শুনিয়াই ষোড়শী অকস্মাৎ প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, আপনার টাকা, আপনার সুবিধা আপনারই থাক্‌, আমাকে যেতে দিন! এই বলিয়া সে যথার্থই এবার এক পা অগ্রসর হইয়া গেল। কিন্তু যে লোকগুলাকে এই

লোকটাও তাহার সঙ্গে দিতে সাহস করে না তাহাদিগকেই সম্মুখে কিছুদূরে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সে আপনিই থমকিয়া দাঁড়াইল।

তাহার বাক্য ও কার্য্যের কোন প্রতিবাদ জমিদার করিলনা, কিন্তু তাহার মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিল।

এক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, তুমি মদ খাও?

ষোড়শী কহিল, না।

জীবানন্দ জিজ্ঞাসা করিল, তোমার জন দুই অন্তরঙ্গ পুরুষ বন্ধু আছে শুনেছি। সত্যি?

ষোড়শী তেম্‌নি মাথা নাড়িয়া বলিল, না, মিছে কথা।

জীবানন্দ আবার ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া প্রশ্ন করিল, তোমার পূর্ব্বেকার সকল ভৈরবীই মদ খেতেন,—সত্যি?

ষোড়শী কহিল, সত্যি।

জীবানন্দ কহিল, মাতঙ্গী ভৈরবীর চরিত্র ভাল ছিল না,—এখনো তার সাক্ষী আছে। সত্যি না মিছে?

ষোড়শী লজ্জিত মৃদু কণ্ঠে বলিল, সত্যি বলেই শুনেছি।

জীবানন্দ কহিল, শুনেছ? ভাল। তবে হঠাৎ তুমিই বা এমন দলছাড়া গোত্রছাড়া ভাল হতে গেলে কেন?

প্রত্যুত্তরে ষোড়শী এই কথাই বলিতে গেল যে ভাল হইবার অধিকার সকলেরই আছে; কিন্তু সহসা একটা অত্যন্ত পরুষ কণ্ঠস্বর তাহাকে মাঝখানেই থামাইয়া দিল। জমিদার জীবানন্দ সোজা উঠিয়া বসিয়া কহিল, মেয়েমানুষের সঙ্গে তর্কও আমি করিনে, তাদের মতামতও কখনো জান্‌তে চাইনে। তুমি ভাল কি মন্দ, চুল চিরে তার বিচার করবারও আমার সময় নেই। আমি বলি, চণ্ডীগড়ের সাবেক ভৈরবীদের যে

ভাবে কেটেছে তোমারও তেমনি ভাবে কেটে গেলেই যথেষ্ট। আজ তুমি এই বাড়ীতেই থাকবে।

হুকুম শুনিয়া ষোড়শী বজ্রাহতের ন্যায় একেবারে কাঠ হইয়া গেল। জীবানন্দ কহিতে লাগিল, তোমার সম্বন্ধে কি কোরে যে এতটা সহ্য করেচি জানিনে, আর কেউ এ বেয়াদপি করলে এতক্ষণ তাকে প্যাইকদের ঘরে পাঠিয়ে দিতুম। এমন অনেককে দিয়েচি।

ইহা ভিত্তিহীন শূন্য আস্ফালন নহে, তাহা শুনিলেই বুঝা যায়। ষোড়শী অকস্মাৎ কাঁদিয়া ফেলিল, গলায় আঁচল দিয়া দুইহাত জোড় করিয়া অশ্রুরুদ্ধ স্বরে কেবল কহিল, আমার যা কিছু আছে সব নিয়ে আজ আমাকে ছেড়ে দিন।

জীবানন্দ মুহূর্ত্তকাল চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া বলিল, কেন বল ত? এ রকম কান্নাও নতুন নয়, এ রকম ভিক্ষেও এই নতুন শুনচিনে। কিন্তু তাদের সব স্বামীপুত্র ছিল,—কতকটা না হয় বুঝ্‌তেও পারি।

তাহাদের স্বামী-পুত্র ছিল! শুনিয়া ষোড়শী শিহরিয়া উঠিল।

জীবানন্দ কহিতে লাগিল, কিন্তু তোমার ত সে বালাই নেই। প্রায় ষোল বছরের মধ্যে তোমার স্বামীকে ত তুমি চোখেও দেখনি। তা ছাড়া তোমাদের ত এতে দোষই নেই।

ষোড়শী যুক্তহস্তেই দাঁড়াইয়া ছিল, অশ্রুরুদ্ধ স্বরে বলিল, স্বামীকে আমার ভাল মনে নেই সত্যি, কিন্তু, তিনি ত আছেন! যথার্থ বল্‌চি আপনাকে কখনো কোন অন্যায়ই আমি আজ পর্য্যন্ত করিনি। দয়া করে আমাকে ছেড়ে দিন—

জীবানন্দ হাঁক দিয়া ডাকিল, মহাবীর—

ষোড়শী আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিয়া বলিল, আমাকে আপনি মেরে ফেলতে পারবেন, কিন্তু—

জীবানন্দ কহিল, আচ্ছা, ও বাহাদুরী করগে ওদের ঘরে গিয়ে। মহাবীর—

ষোড়শী মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া বলিল, কারও সাধ্য নেই আমাকে প্রাণ থাক্‌তে নিয়ে যেতে পারে। আমার যা' কিছু দুর্দ্দশা—যত অত্যাচার আপনার সামনেই হোক—আপনি আজও ব্রাহ্মণ, আপনি আজও ভদ্রলোক!

কিন্তু এতবড় অভিযোগেও জীবানন্দ হাসিল; সে হাসি যেমন কঠিন তেম্‌নি নিষ্ঠুর। কহিল, তোমার কথাগুলো শুন্‌তে মন্দ নয়, কিন্তু কান্না দেখে আমার দয়া হয়না! ও আমি অনেক শুনি। মেয়েমানুষের ওপর আমার এতটুকু লোভ নেই,—ভাল না লাগলেই চাকরদের দিয়ে দিই। তোমাকেও দিয়ে দিতুম, শুধু এই বোধ হয় আজ প্রথম একটু মোহ জন্মেছে। ঠিক জানিনে—নেশা না কাটলে ঠাওর পাচ্চিনে।

মহাবীর দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া সাড়া দিল, হুজুর!

জীবানন্দ সম্মুখের কবাটটায় অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, একে আজ রাত্রের মত ও-ঘরে বন্ধ করে রেখে দে। কাল আবার দেখা যাবে।

ষোড়শী গলদশ্রু নয়নে কহিল, আমার সর্ব্বনাশটা একবার ভেবে দেখুন, হুজুর! কাল যে আমি আর মুখ দেখাতে পারবোনা।

জীবানন্দ কহিল, দু'একদিন। তার পরে পারবে। সেই লিভারের ব্যথাটা আজ ভারি বেড়েছে—আর বেশি বিরক্ত কোরোনা,—যাও।

মহাবীর তাড়া দিয়া বলিল, আরে, উঠ্‌না মাগী,—চোল্‌!

কিন্তু তাহার কথা শেষ না হইতেই অকস্মাৎ উভয়েই চমকিয়া উঠিল। জীবানন্দ ভয়ানক ধমক্ দিয়া কহিল, খবরদার, শুয়োরের বাচ্চা, ভাল কোরে কথা বল্! ফের্ যদি কখনো আমার হুকুম ছাড়া কোনো মেয়েমানুষকে ধরে আনিস্ তো গুলি কোরে মেরে ফেল্ব। বলিতে বলিতেই মাথার বালিশটা তাড়াতাড়ি পেটের নীচে টানিয়া লইয়া উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল, এবং যাতনার একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া কহিল, আজকের মত ও-ঘরে বন্ধ থাকো, কাল তোমার সতী-পনার বোঝা-পড়া হবে। এই,—যা' না আমার সুমুখ থেকে সরিয়ে নিয়ে।

মহাবীর আস্তে আস্তে বলিল, চলিয়ে—

ষোড়শী নিরুত্তরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া নির্দ্দেশ মত পাশের অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করিতে যাইতেছিল, হঠাৎ তাহার নাম ধরিয়া ডাকিয়া জীবানন্দ কহিল, একটু দাঁড়াও,—তুমি পড়তে জানো, না?

ষোড়শী মৃদুকণ্ঠে বলিল, জানি।

জীবানন্দ কহিল, তা'হলে একটু কাজ করে যাও। ওই যে বাক্সটা,—ওর মধ্যে আর একটা ছোট কাগজের বাক্স পাবে। কয়েকটা ছোট বড় শিশি আছে, যার গায়ে বাঙ্লায় 'মরফিয়া' লেখা, তার থেকে একটুখানি ঘুমের ওষুধ দিয়ে যাও। কিন্তু খুব সাবধান, এ ভয়ানক বিষ। মহাবীর, আলোটা ধর্।

বাতির আলোকে ষোড়শী কম্পিত হস্তে বাক্স খুলিয়া শিশি বাহির করিল, এবং সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, কতটুকু দিতে হবে?

জীবানন্দ তীব্র বেদনায় আবার একটা অব্যক্ত ধ্বনি করিয়া কহিল, ঐ তো বল্লুম খুব একটুখানি। আমি উঠ্তেও পারচিনে, আমার হাতেরও ঠিক নেই, চোখেরও ঠিক নেই। ওতেই একটা কাঁচের ঝিনুক

আছে, তার অর্দ্ধেকেরও কম। একটু বেশি হয়ে গেলে এ ঘুম তোমার চণ্ডীর বাবা এসেও ভাঙাতে পারবেনা।

ষোড়শী সন্ধান করিয়া ঝিনুক বাহির করিল, কিন্তু পরিমাণ স্থির করিতে তাহার হাত কাঁপিতে লাগিল। তার পরে অনেক যত্নে অনেক সাবধানে যখন সে নির্দ্দেশ মত ঔষধ লইয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন নির্বিচারে সেই বিষ হাত বাড়াইয়া লইয়া জীবানন্দ মুখে ফেলিয়া দিল। প্রশ্ন করিলনা, পরীক্ষা করিলনা, একবার চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখিলনা।

পার্শ্বের অন্ধকার ঘরের মধ্যে রাখিয়া বাহিরে হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া মহাবীর চলিয়া গেল, কিন্তু ভিতরে হইতে বন্ধ করিবার উপায় না থাকায় ষোড়শী সেই রুদ্ধ দ্বারেই পিঠ দিয়া অত্যন্ত সতর্ক হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার দেহ ও মন শ্রান্তি ও অবসাদের শেষ সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিল, এবং রাত্রের মধ্যেও হয়ত আর কোন বিপদের সম্ভাবনা ছিলনা, কিন্তু তথাপি, ঘুমাইয়া পড়াও ত কোন মতে চলিবেনা। এখানে একবিন্দু শৈথিল্যের স্থান নাই,—এখানে একান্ত অসম্ভবের বিরুদ্ধেও তাহাকে সর্ব্বতোভাবে জাগ্রত থাকিতে হইবে।

কিন্তু বাকি রাত্রিটা যেমন করিয়াই কাটুক, কাল তাহার সতীত্বের অতিশয় কঠোর পরীক্ষা হইবে তাহা সে নিজের কানেই শুনিয়াছে, এবং ইহা হইতে বাঁচিবার কি যে উপায় আছে তাহাও তাহার সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত।

নিজের পিতার কথা মনে করিয়া ষোড়শী ভরসা পাইবে কি লজ্জায় মরিয়া গেল। তাঁহাকে সে ভাল করিয়াই চিনিত, তিনি যেমন ভীতু তেমনি নীচাশয়। অনেক রাত্রে ঘরে ফিরিয়া এ দুর্ঘটনা জানিয়াও হয়ত তিনি প্রকাশ করিবেন না,—বরঞ্চ সামাজিক গোলযোগের ভয়ে চাপিয়া দিবারই চেষ্টা করিবেন। মনে মনে এই বলিয়া তর্ক করিবেন, ষোড়শীকে একদিন জমিদার ছাড়িয়া দিবেই, কিন্তু, কথাটা ঘাঁটাঘাঁটি করিয়া দেব-সম্পত্তি হইতেই যদি বঞ্চিত হইতে হয় ত লাভের চেয়ে লোকসানের অঙ্কটাই ঢের বেশি ভারি হইয়া উঠিবে। উপরন্তু, নজরের টাকাটার সম্বন্ধেও যে তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বহুদূর অগ্রসর হইয়া যাইবে ইহাও ষোড়শী

স্পষ্ট দেখিতে লাগিল। তা'ছাড়া এই দুর্দ্দান্ত ভূস্বামীর বিরুদ্ধে তিনি করিবেনই বা কি! ছয় সাত ক্রোশের মধ্যে একটা থানা নাই চৌকি নাই,—পুলিশের কাছে খবর দিতে গেলেও যে পরিমাণ সময়, অর্থ, এবং লোকবলের প্রয়োজন তাহার কোনটাই তারাদাসের নাই। অতএব, অত্যাচার যত বড়ই হোক, এই সুবৃহৎ শক্তির সম্মুখে অবনত শিরে সহ করা ব্যতীত আর যে গত্যন্তর নাই এই কথাটাই, চোখে আঙ্গুল দিয়া ষোড়শীকে বারবার দেখাইয়া দিতে লাগিল।

অথচ, সমস্ত দুশ্চিন্তার মধ্যে মিশিয়া তাহার আর একটা চিন্তার ধারা নীরবে অনুক্ষণ বহিয়া যাইতেছিল,—সে ওই তাহার চণ্ডীমাতা, যাঁহাকে শিশুকাল হইতে সে কায়মনে পূজা করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু ওই যে লোকটা ও-ঘরে ঘুমাইতেছে,—যাহার গাঢ়, ভারী নিঃশ্বাসের শব্দ অস্পষ্ট হইয়া তাহার কানে পৌঁছিতেছে, উহার ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, ভাল ও মন্দ, আপনার ও পর,—পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুর প্রতি কি গভীর নির্ম্মম অবহেলা! নারীর চোখের জলে উহার করুণা নাই; রমণীর রূপ ও যৌবনে উহার মমতা নাই, আকর্ষণ নাই; স্বামী-পুত্রবতীর সতী-ধর্ম্মকে নিতান্ত নিরর্থক হত্যা করিতে উহার বাধে না; তাহাদের হৃদয়ের রক্তে দুই পা ভরিয়া গেলেও ভ্রূক্ষেপ করেনা;—যে নিজের প্রাণটাকে পর্য্যন্ত এই মাত্র তাহার হাতে তুলিয়া দিয়া তাহারি প্রদত্ত বিষ অসঙ্কোচে চোখ মুদিয়া ভক্ষণ করিল,—এতটুকু দ্বিধা করিলনা, অশ্রদ্ধা ও অনাসক্তির এই অপরিমেয় পাষাণ-ভার ঠেলিয়া কি মা চণ্ডীই তাহার পরিত্রাণের পথ করিতে পারিবেন!

এমনি করিয়া সে যেদিকে দৃষ্টিপাত করিল নিদারুণ আঁধার ব্যতীত, এতটুকু আলোক রশ্মিও চোখে পড়িলনা! তখন পরিপূর্ণ নিরাশ্বাস তাহার ওই একমাত্র দেবতার মন্দির ঘুরিয়াই কেবল কল্পনার জাল বুনিতে লাগিল।

ভোরের দিকে বোধ করি সে একটুখানি তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল, হঠাৎ পিঠের উপর একটা চাপ অনুভব করিয়া ধড়মড় করিয়া সোজা উঠিয়া বসিয়া দেখিল জানালা দিয়া সূর্য্যের আলোক ঘরে প্রবেশ করিয়াছে।

বাহিরে হইতে যে দ্বার ঠেলিতেছিল; সে কহিল, আপনি বেরিয়ে আসুন আমি এককড়ি।

ষোড়শী গায়ের বস্ত্র সংযত করিয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং দ্বার খুলিয়া সম্মুখেই দেখিতে পাইল গত রাত্রির সেই শয্যার উপরে জীবানন্দ প্রায় তেম্‌নি ভাবেই বালিশ ঠেস্ দিয়া বসিয়া আছে। কাল দীপের স্বল্প আলোকে তাহার মুখখানা ষোড়শী ভাল দেখিতে পায় নাই, কিন্তু আজ এক মুহূর্ত্তের দৃষ্টিপাতেই দেখিতে পাইল সুদীর্ঘ অত্যাচার তাহার দেহের প্রতি অঙ্গে কত বড় গভীর আঘাত করিয়াছে। বয়স ঠিক অনুমান হয় না,—হয় ত চল্লিশ, হয় ত আরও বেশি,—রগের দুই ধারে কিছু কিছু চুল পাকিয়াছে, প্রশস্ত ললাট রেখায় ভরা, তাহারি উপরে কালো কালো ছাপ পড়িয়াছে। যক্ষ্মা রোগীর চোখের মত দৃষ্টি অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ এবং তাহারই নীচে শীর্ণ নাকটা যেন খাঁড়ার মত ঝুলিয়া পড়িয়াছে। সমস্ত মুখখানা অত্যন্ত ম্লান, তাহারই সঙ্গে মিশিয়া ভিতরের কি একটা অব্যক্ত বেদনা যেন কালিমা ব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছে।

জীবানন্দ হাত নাড়িয়া অস্ফুট কণ্ঠে কহিল, তোমার ভয় নেই, কাছে এসো।

ষোড়শী ধীরে ধীরে কয়েকপদ অগ্রসর হইয়া নতনেত্রে নীরবে দাঁড়াইল। জীবানন্দ কহিল, পুলিশের লোক বাড়ী ঘিরে ফেলেছে,—ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব গেটের মধ্যে ঢুকেছেন,—এলেন বলে।

ষোড়শী মনে মনে চমকিয়া উঠিল, কিন্তু কথা কহিলনা। জীবানন্দ

বলিতে লাগিল, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট টুরে বেরিয়ে ক্রোশখানেক দূরে তাঁবু ফেলেছিলেন, তোমার বাবা কাল রাত্রেই তাঁর কাছে গিয়ে সমস্ত জানিয়েছেন। কেবল তাতেই এতটা হোতো না, কে-সাহেবের নিজেরই আমার উপর ভারি রাগ। গত বৎসর দু'বার ফাঁদে ফেল্‌বার চেষ্টা করেছিলো, কিন্তু পারেনি ;—আজ একেবারে হাতে-হাতে ধরে ফেলেছে, —বলিয়া সে একটু হাসিল।

এককড়ি মুখ চুন করিয়া পাশে দাঁড়াইয়া ছিল, কহিল, হুজুর, এবার বোধ হয় আমাদেরও আর রক্ষে নেই।

জীবানন্দ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, সম্ভব বটে। ষোড়শীকে কহিল, শোধ নিতে চাও ত এই-ই সময়। আমাকে জেলে দিতেও পারো।

ষোড়শী জবাব দিতে গিয়া মুখ তুলিয়াই দেখিল জীবানন্দ তাহার মুখের প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া আছে। চোখ নামাইয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, এতে জেল হবে কেন?

জীবানন্দ কহিল, আইন। তা ছাড়া কে-সাহেবের হাতে পড়েছি। বাদুড়বাগানের মেসে থাকতে এরই কাছে একবার দিন কুড়ি হাজত-বাসও হয়ে গেছে। কিছুতে জামিন দিলেনা,—আর জামিন বা তখন হোতো কে!

ষোড়শী হঠাৎ উৎসুক কণ্ঠে প্রশ্ন করিয়া ফেলিল, আপনি কি কখনো বাদুড়বাগানের মেসে ছিলেন?

জীবানন্দ কহিল, হাঁ। ওই সময়ে একটা প্রণয়কাণ্ডের বৃন্দে হয়ে ছিলুম,—ব্যাটা আয়ান ঘোষ কিছুতে ছাড়লেনা,—পুলিশে দিলে। যাক্, সে অনেক কথা। কে আমাকে ভোলেনি, বেশ চেনে। আজও পালাতে পারতুম, কিন্তু ব্যথায় শয্যাগত হয়ে পড়েচি, নড়বার যো নেই।

ষোড়শী আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, কালকের ব্যথাটা কি আপনার সারেনি ?

জীবানন্দ কহিল, না, ভয়ানক বেড়েচে। তা ছাড়া এ সারবার ব্যথাও নয়।

ষোড়শী একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আমাকে কি করতে হবে ?

জীবানন্দ কহিল, শুধু বল্‌তে হবে তুমি নিজের ইচ্ছেয় এসেচ, নিজের ইচ্ছেয় এখানে আছো। তার বদলে তোমাকে সমস্ত দেবোত্তর ছেড়ে দেব, হাজার টাকা নগদ দেব, আর নজরের টাকার ত কথাই নেই।

এককড়ি এই কথাগুলারই বোধ হয় প্রতিধ্বনি করিতে যাইতেছিল, কিন্তু ষোড়শীর মুখের পানে চাহিয়া সে সহসা থামিয়া গেল। ষোড়শী সোজা জীবানন্দের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, এ কথা স্বীকার করার অর্থ বোঝেন ? তার পরেও কি আমার জমিতে, টাকা-কড়িতে প্রয়োজন থাক্‌তে পারে বলে আপনি বিশ্বাস্ করেন ?

জীবানন্দের মুখখানা প্রথমে ফ্যাকাশে হইল, এবং সেই পাণ্ডু মুখের তীক্ষ্ণ-তীব্র দুটি চক্ষে কোথা হইতে তাহার গত রাত্রির তেম্‌নি স্নিগ্ধ মুগ্ধ দৃষ্টি যেন ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিয়া স্থির হইয়া রহিল! অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সে একটা কথাও কহিল না, তারপরে আস্তে আস্তে মাথা নাড়িয়া বলিল, তাই বটে ষোড়শী, তাই বটে। জীবনে আজও ত তুমি পাপ করোনি,—ও তুমি পারবেনা সত্যি।

একটুখানি হাসিয়া বলিল, টাকা-কড়ির বদলে যে সম্ভ্রম বেচা যায় না—ও যেন আমি ভুলেই গেছি। তাই হোক্, যা সত্যি তাই তুমি

দে'লো,—জমিদারের তরফ থেকে আর কোন উপদ্রব তোমার ওপর হবেনা।

এককড়ি ব্যাকুল হইয়া আবার কি কতকগুলা বলিতে গেল কিন্তু বাহিরের রুদ্ধ দ্বারে পুনঃ পুনঃ করাঘাতের শব্দে এবারও তাহা বলা হইলনা, কেবল তাহার মুখখানাই একেবারে শাদা হইয়া রহিল।

জীবানন্দ সাড়া দিয়া কহিল, খোলা আছে, ভিতরে আসুন। এবং পরক্ষণেই উন্মুক্ত দরজার সম্মুখে দেখা গেল ছোট-বড় জন কয়েক পুলিশ কর্ম্মচারীর পিছনে দাঁড়াইয়া স্বয়ং জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট এবং তাঁহারই কাঁধের উপর দিয়া উঁকি মারিতেছে তারাদাস চক্রবর্ত্তী। সে ভিতরে ঢুকিয়াই কাঁদিয়া বলিল, ধর্ম্মাবতার, হুজুর! এই আমার মেয়ে, মা চণ্ডীর ভৈরবী! আপনার দয়া না হলে আজ ওকে টাকার জন্যে খুন করে ফেল্‌তো ধর্ম্মাবতার!

কে-সাহেব ষোড়শীর আপাদমস্তক পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষণ করিয়া পরিষ্কার বাঙলায় জিজ্ঞাসা করিলেন তোমারই নাম ষোড়শী? তোমাকেই বাড়ী থেকে ধরে এনে উনি বন্ধ করে রেখেছেন?

ষোড়শী মাথা নাড়িয়া কহিল, না, আমি নিজের ইচ্ছেয় এসেচি, কেউ আমার গায়ে হাত দেয়নি।

চক্রবর্ত্তী চেঁচামেঁচি করিয়া উঠিল, না হুজুর ভয়ানক মিথ্যে কথা। গ্রামশুদ্ধ সাক্ষী আছে। মা আমার ভাত রাঁধছিল, আটজন পাইক গিয়ে মাকে বাড়ী থেকে মারতে মারতে টেনে এনেচে।

ম্যাজিষ্ট্রেট জীবানন্দের প্রতি কটাক্ষে চাহিয়া ষোড়শীকে পুনশ্চ বলিলেন, তোমার কোন ভয় নেই, তুমি সত্যি কথা বল। তোমাকে বাড়ী থেকে ধরে এনেছে?

না, আমি আপনি এসেছি।

ঐখানে তোমার কি প্রয়োজন ?

ষোড়শী শুধু কহিল, আমার কাজ ছিল।

সাহেব একটু হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন, সমস্ত রাত্রিই কাজ ছিল ?

ষোড়শী তেম্‌নি মাথা নাড়িয়া শান্ত মৃদু কণ্ঠে বলিল, হাঁ, সমস্ত রাত্রিই আমার কাজ ছিল। ওঁর অসুখ করেছিল বলে বাড়ী ফিরে যেতে পারিনি।

তারাদাস চেঁচাইয়া বলিল, বিশ্বাস করবেন না হুজুর, সমস্ত মিছে,—সমস্ত বানানো। আগাগোড়া শিখানো কথা।

সাহেব তাহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া শুধু মুখ টিপিয়া একটু হাসিলেন, এবং শিস্ দিতে দিতে প্রথমে বন্দুকটা এবং পরে রিভলভার দুটো বেশ করিয়া পরীক্ষা করিয়া জীবানন্দকে কেবল বলিলেন, আশা করি এ সকল রাখবার আপনার হুকুম আছে ; এবং তাহার পরে ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

বাহিরে হইতে তাঁহার গলা শোনা গেল,—হামারা ঘোড়া লাও, এবং ক্ষণেক পরেই ঘোড়ার খুরের শব্দে বুঝা গেল জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাড়ী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

৫

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিল, পুলিশ-কর্ম্মচারীও আপনার অনুচরগণকে স্থানত্যাগের ইঙ্গিত জ্ঞাপন করিলেন,—এইবার তারাদাসের নিজের অবস্থাটা তাঁহার কাছে প্রকট হইয়া উঠিল। এতক্ষণ সে যেন এক মোহাবৃত প্রগাঢ় কুহেলিকার মধ্যে দাঁড়াইয়া ছিল, হঠাৎ মধ্যাহ্ন সূর্য্য-কিরণে তাহার বাষ্পটুকু পর্য্যন্ত উবিয়া গিয়া দুঃখের আকাশ একেবারে দিগন্ত ব্যাপিয়া ধূধূ করিতে লাগিল। যতদূর দৃষ্টি যায় কোথাও ছায়া কোথাও আশ্রয়, কোথাও লুকাইবার স্থান নাই,—কেবল সে আর তাহার মৃত্যু মুখোমুখি দাঁড়াইয়া দাঁত মেলিয়া হাসিতেছে।

সমস্ত জেলার যিনি ভাগ্যবিধাতা, অনুগ্রহ ও অনুকম্পা তাঁহার নিতান্তই অপ্রত্যাশিত ও আশাতীত সুলভে লাভ করিয়া কল্পনা তাহার দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া উঠিয়াছিল। মনে করিয়াছিল এ কেবল ওই অত্যাচারী মাতালটাকে হাতে-হাতে ধরাইয়া দেওয়াই নয়, এ তাহার ভাগ্য-লক্ষ্মীর অপর্য্যাপ্ত দান। তাঁহার বরহস্তের দশ অঙ্গুলির ফাঁকে ফাঁকে আজ যে বস্তু ঝরিয়া পড়িবে, সে শুধু ওই জমিদারগোষ্ঠীর সর্ব্বনাশ নয়, এ তাহার জমি-জমা ও টাকা মোহরের রাশি। তাহার একমাত্র আশঙ্কা ছিল পাছে না তাহারা সময়ে পৌঁছিতে পারে, পাছে সম্বাদ দিয়া কেহ পূর্ব্বাহ্লেই সতর্ক করিয়া দেয়। এবং এ পক্ষে তাহার চিন্তা, পরিশ্রম ও উদ্যমের অবধি ছিল না। ইহার বিফলতার দণ্ডও সে যে না ভাবিয়াছিল, তাহা নয়, কিন্তু সে নিষ্ফলতা পৌঁছিল যখন এই দিক দিয়া, ষোড়শীর স্বহস্তের আঘাতেই যখন

কামনার এতবড় পাষাণ-প্রাসাদ ভিত্তি সমেত ধূলিসাৎ হইয়া গেল, তখন প্রথমটা তারাদাস মূঢ়ের মত চেঁচামেঁচি করিল, তার পর হতজ্ঞানের ন্যায় কিছুক্ষণ স্তব্ধ অভিভূত ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া অকস্মাৎ এক বুক-ফাটা ক্রন্দনে উপস্থিত সকলকে সচকিত করিয়া পুলিশ-কর্ম্মচারীর পায়ের নীচে পড়িয়া কাঁদিয়া বলিল, বাবুমশায়, আমার কি হবে ! আমাকে যে এবার জমিদারের লোক জ্যান্ত পুঁতে ফেল্‌বে !

ইন্‌সপেক্টর বাবুটি প্রবীণ গোছের ভদ্রলোক, তিনি শশব্যস্ত হইয়া তাহাকে চেষ্টা করিয়া হাত ধরিয়া তুলিলেন, এবং আশ্বাস দিয়া সদয় কণ্ঠে কহিলেন, ভয় কি ঠাকুর, তুমি যেমন ছিলে তেম্‌নি থাকোগে। স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তোমারি সহায় রইলেন,—আর কেউ তোমাকে জুলুম করবেনা।

এই বলিয়া তিনি কটাক্ষে একবার জীবানন্দের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তারাদাস চোখ মুছিতে মুছিতে কহিল, সাহেব যে রাগ করে চলে গেলেন বাবু!

ইন্‌সপেক্টর বাবু মুচকিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, না, ঠাকুর, রাগ করেননি। তবে, আজকের এই ঠাট্টাটুকু তিনি সহজে ভুল্‌তে পারবেন বলে মনে হয়না। তা ছাড়া আমরাও মরিনি, থানাও যা হোক্ একটা আছে। বলিয়া আর একবার জমিদারের শয্যার প্রতি তিনি আড় চোখে চাহিয়া লইলেন। এই ইঙ্গিতটুকুর অর্থ তাঁহার যাই হোক, জমিদারের তরফ হইতে কিন্তু ইহার কোনরূপ প্রত্যুত্তর আসিল না। এক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, এখন চল ঠাকুর, যাওয়া যাক্? যেতেও ত হবে অনেকটা।

সব্‌ ইনস্‌পেক্টর বাবুটির বয়স কম, তিনি অল্প একটু হাসিয়া কহিলেন, ঠাকুরটি তবে কি একাই যাবেন না কি ?

কথাটায় সবাই হাসিল। যে চৌকিদার দুজন দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহারাও হাসিয়া মুখ ফিরাইল! এমন কি এককড়ি পর্য্যন্ত মুখ রাঙা করিয়া কড়িকাঠে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল।

এই কদর্য্য ইঙ্গিতে তারাদাসের চোখের অশ্রু চোখের পলকে অগ্নি-শিখায় রূপান্তরিত হইয়া গেল। সে ষোড়শীর প্রতি কঠোর দৃষ্টিপাত করিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল, যেতে হয় আমি একাই যাবো। আবার ও'র মুখ ।,—আবার ওকে বাড়ী ঢুক্তে দেবো আপনারা ভেবেচেন! ইনস-ক্টর বাবু সহাস্যে কহিলেন, মুখ তুমি না দেখ্তে পারো কেউ মাথার ব্যি দেবেনা ঠাকুর! কিন্তু যার বাড়ী, তাকে বাড়ী ঢুক্তে না দিয়ে আবার যেন নতুন ফ্যাসাদে পোড়োনা।

তারাদাস আস্ফালন করিয়া বলিল, বাড়ী কার? বাড়ী আমার। আমিই ভৈরবী করেচি, আমিই ওকে দূর করে তাড়াবো। কলকাঠি এই তারা চক্কোত্তির হাতে! এই বলিয়া সে সজোরে নিজের বুক ঠুকিয়া বলিল, নইলে কে ও জানেন? শুন্বেন ওর মায়ের—

ইনস্পেক্টর থামাইয়া দিয়া কহিলেন, থামো ঠাকুর থামো। রাগের মাথায় পুলিশের কাছে সব কথা বলে ফেল্তে নেই—তাতে বিপদে পড়তে হয়। ষোড়শীর প্রতি চাহিয়া কহিলেন, তুমি যেতে চাও ত আমরা তোমাকে নিরাপদে ঘরে পৌঁছে দিতে পারি। চল, আর দেরি কোরোনা।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত ষোড়শী অধোমুখে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া ছিল, ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না। পুলিশের ছোটবাবু মুখ টিপিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, যাবার বিলম্ব আছে বুঝি?

ষোড়শী মুখ তুলিয়া চাহিল, কিন্তু জবাব দিল ইনস্পেক্টর বাবুকে। কহিল, আপনারা যান, আমার যেতে এখনো দেরী আছে।

দেরী আছে! হারামজাদী, তোকে যদি না খুন করি ত আমি মনোহর চক্কোত্তির ছেলে নই! এই বলিয়া তারাদাস উন্মাদের ন্যায় লাফাইয়া উঠিয়া বোধ হয় তাহাকে যথার্থই কঠিন আঘাত করিত, কিন্তু ইনস্‌পেক্টর বাবু ধরিয়া ফেলিয়া ধমক দিয়া কহিলেন, ফের্ যদি বাড়াবাড়ি কর ত তোমাকে থানায় ধরে নিয়ে যাবো। চল, ভালমানুষের মত ঘরে চল।

এই বলিয়া তিনি লোকটাকে একপ্রকার টানিয়া লইয়াই গেলেন, কিন্তু তারাদাস তাঁহার হিত কথায় কর্ণপাতও করিলনা। যতদূর শোনা গেল, সে সুউচ্চ কণ্ঠে ষোড়শীর মাতার সম্বন্ধে যা তা বলিতে বলিতে এবং তাহাকে অচিরে হত্যা করিবার কঠিনতম শপথ পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করিতে করিতে গেল।

পুলিশের সম্পর্কীয় সকলেই যথার্থ বিদায় গ্রহণ করিল, কিম্বা কোথাও কেহ লুকাইয়া রহিয়া গেল, এ বিষয়ে নিঃসংশয় হইতে ধূর্ত্ত এককড়ি পা টিপিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেলে জীবানন্দ ইঙ্গিত করিয়া ষোড়শীকে আর একটু নিকটে আহ্বান করিয়া অতিশয় ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি এঁদের সঙ্গে গেলেনা কেন?

ষোড়শী কহিল, এঁদের সঙ্গে ত আমি আসিনি।

জীবানন্দ কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে থাকিয়া বলিল, তোমার বিষয়ের ছাড় লিখে দিতে দু'চার দিন দেরী হবে, কিন্তু টাকাটা কি তুমি আজই নিয়ে যাবে?

ষোড়শী কহিল, তাই দিন।

জীবানন্দ শয্যার এক নিভৃত প্রদেশে হাত দিয়া এক তাড়া নোট টানিয়া বাহির করিল। সেইগুলা গণনা করিতে করিতে ষোড়শীর মুখের প্রতি বার বার চাহিয়া দেখিয়া একটুখানি হাসিয়া কহিল, আমার

কথাটায় সবাই হাসিল। যে চৌকিদার দুজন দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহারাও হাসিয়া মুখ ফিরাইল! এমন কি এককড়ি পর্য্যন্ত মুখ রাঙা করিয়া কড়িকাঠে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল।

এই কদর্য্য ইঙ্গিতে তারাদাসের চোখের অশ্রু চোখের পলকে অগ্নি-শিখায় রূপান্তরিত হইয়া গেল। সে ষোড়শীর প্রতি কঠোর দৃষ্টিপাত করিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল, যেতে হয় আমি একাই যাবো। আবার ও'র মুখ দেখ্‌ব,—আবার ওকে বাড়ী ঢুক্‌তে দেবো আপনারা ভেবেচেন! ইনস-পেক্টর বাবু সহাস্যে কহিলেন, মুখ তুমি না দেখ্‌তে পারো কেউ মাথার দিব্যি দেবেনা ঠাকুর! কিন্তু যার বাড়ী, তাকে বাড়ী ঢুক্‌তে না দিয়ে আবার যেন নতুন ফ্যাসাদে পোড়োনা।

তারাদাস আস্ফালন করিয়া বলিল, বাড়ী কার? বাড়ী আমার। আমিই ভৈরবী করেচি, আমিই ওকে দূর করে তাড়াবো। কলকাঠি এই তারা চক্কোত্তির হাতে! এই বলিয়া সে সজোরে নিজের বুক ঠুকিয়া বলিল, নইলে কে ও জানেন? শুন্‌বেন ওর মায়ের—

ইনস্‌পেক্টর থামাইয়া দিয়া কহিলেন, থামো ঠাকুর থামো। রাগের মাথায় পুলিশের কাছে সব কথা বলে ফেল্‌তে নেই—তাতে বিপদে পড়তে হয়। ষোড়শীর প্রতি চাহিয়া কহিলেন, তুমি যেতে চাও ত আমরা তোমাকে নিরাপদে ঘরে পৌঁছে দিতে পারি। চল, আর দেরি কোরোনা।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত ষোড়শী অধোমুখে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া ছিল, ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না। পুলিশের ছোটবাবু মুখ টিপিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, যাবার বিলম্ব আছে বুঝি?

ষোড়শী মুখ তুলিয়া চাহিল, কিন্তু জবাব দিল ইনস্‌পেক্টর বাবুকে। কহিল, আপনারা যান, আমার যেতে এখনো দেরী আছে।

দেরী আছে! হারামজাদী, তোকে যদি না খুন করি ত আমি মনোহর চক্কোত্তির ছেলে নই! এই বলিয়া তারাদাস উন্মাদের ন্যায় লাফাইয়া উঠিয়া বোধ হয় তাহাকে যথার্থই কঠিন আঘাত করিত, কিন্তু ইনস্‌পেক্টর বাবু ধরিয়া ফেলিয়া ধমক দিয়া কহিলেন, ফের্ যদি বাড়াবাড়ি কর ত তোমাকে থানায় ধরে নিয়ে যাবো। চল, ভালমানুষের মত ঘরে চল।

এই বলিয়া তিনি লোকটাকে একপ্রকার টানিয়া লইয়াই গেলেন, কিন্তু তারাদাস তাঁহার হিত কথায় কর্ণপাতও করিলনা। যতদূর শোনা গেল, সে সুউচ্চ কণ্ঠে ষোড়শীর মাতার সম্বন্ধে যা তা বলিতে বলিতে এবং তাহাকে অচিরে হত্যা করিবার কঠিনতম শপথ পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করিতে করিতে গেল।

পুলিশের সম্পর্কীয় সকলেই যথার্থ বিদায় গ্রহণ করিল, কিম্বা কোথাও কেহ লুকাইয়া রহিয়া গেল, এ বিষয়ে নিঃসংশয় হইতে ধূর্ত্ত এককড়ি পা টিপিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেলে জীবানন্দ ইঙ্গিত করিয়া ষোড়শীকে আর একটু নিকটে আহ্বান করিয়া অতিশয় ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি এঁদের সঙ্গে গেলেনা কেন?

ষোড়শী কহিল, এঁদের সঙ্গে ত আমি আসিনি।

জীবানন্দ কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে থাকিয়া বলিল, তোমার বিষয়ের ছাড় লিখে দিতে দু'চার দিন দেরী হবে, কিন্তু টাকাটা কি তুমি আজই নিয়ে যাবে?

ষোড়শী কহিল, তাই দিন।

জীবানন্দ শয্যার এক নিভৃত প্রদেশে হাত দিয়া এক তাড়া নোট টানিয়া বাহির করিল। সেইগুলা গণনা করিতে করিতে ষোড়শীর মুখের প্রতি বার বার চাহিয়া দেখিয়া একটুখানি হাসিয়া কহিল, আমার

কিছুতে লজ্জা করেনা, কিন্তু আমারও এগুলো তোমার হাতে তুলে দিতে বাধ বাধ ঠেক্‌চে।

ষোড়শী শান্ত নম্র কণ্ঠে বলিল, কিন্তু তাই ত দেবার কথা ছিল।

জীবানন্দর পাংশু মুখের উপর ক্ষণিকের জন্য লজ্জার আরক্ত আভা ভাসিয়া গেল, কহিল, কথা যাই থাক্ ষোড়শী, আমাকে বাঁচাতে তুমি যা খোয়ালে, তার দাম টাকায় ধার্য্য করচি, এ মনে করার চেয়ে বরঞ্চ আমার না বাঁচাই ছিল ভাল।

ষোড়শী তাহার মুখের উপর দুই চক্ষুর অচপল দৃষ্টি স্থির রাখিয়া কহিল, কিন্তু মেয়েমানুষের দাম ত আপনি এই দিয়েই চিরদিন ধার্য্য করে এসেছেন।

জীবানন্দ নিরুত্তরে বসিয়া রহিল। ষোড়শী কহিল, বেশ, আজ যদি সে মত আপনার বদ্‌লে থাকে, টাকা না হয় রেখে দিন, আপনাকে কিছুই দিতে হবেনা। কিন্তু আমাকে কি সত্যিই এখনো চিন্তে পারেন নি? ভাল করে চেয়ে দেখুন দিকি?

জীবানন্দ নীরবে চাহিয়া রহিল, বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার চোখে পলক পর্য্যন্ত পড়িলনা। তারপরে ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া কহিল, বোধ হয় পেরেচি। ছেলেবেলায় তোমার নাম অলকা ছিল না?

ষোড়শী হাসিলনা, কিন্তু তাহার সমস্ত মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, কহিল, আমার নাম ষোড়শী। ভৈরবীর দশমহাবিদ্যার নাম ছাড়া আর কোন নাম থাকেনা। কিন্তু অলকাকে আপনার মনে আছে?

জীবানন্দ নিরুৎসুক কণ্ঠে বলিল, কিছু কিছু মনে আছে বই কি। তোমার মায়ের হোটেলে যখন মাঝে মাঝে খেতে যেতাম, তখন তুমি ছ' সাত বছরের মেয়ে। কিন্তু আমাকে ত তুমি অনায়াসে চিন্‌তে পেরেছ?

এই কণ্ঠস্বর ও তাহার নিগূঢ় অর্থ অনুভব করিয়া ষোড়শী কিছুক্ষণ

নিরুত্তরে থাকিয়া অবশেষে সহজভাবে বলিল, তার কারণ, অলকার বয়স তখন ছ' সাত নয়, ন' দশ বৎসর ছিল। এবং আপনার মনেও হতে পারে, তার মা তাকে আপনার বাহন বলে পরিহাস করিতেন। তা ছাড়া আপনার মুখের আর যত বদলই হোক্ ডান চোখের ওই তিলটির কখনো পরিবর্ত্তন হবে না। অলকার মাকে মনে পড়ে ?

জীবানন্দ কহিল, পড়ে। তাঁর সম্বন্ধে তারাদাস যা বল্‌তে বল্‌তে গেল তাও বুঝ্‌তে পারচি। তিনি বেঁচে আছেন ?

না। বছর দশেক পূর্ব্বে তাঁর কাশীলাভ হয়েছে। আপনাকে তিনি বড় ভালবাসতেন, না ?

জীবানন্দের শীর্ণ মুখের উপর এবার উদ্বেগের ছায়া পড়িল, কহিল, হাঁ। একবার বিপদে পড়ে তাঁর কাছে একশ টাকা ধার নিয়েছিলাম, সেটা বোধ হয় আর শোধ দেওয়া হয়নি।

সহসা ষোড়শীর ওষ্ঠাধর চাপা হাসিতে ফুলিয়া উঠিল, কিন্তু সে তৎক্ষণাৎ তাহা সম্বরণ করিয়া লইয়া সহজ ভাবে কহিল, আপনি সে জন্যে কোন ক্ষোভ মনে রাখ্‌বেননা। অলকার মা সে টাকা ধার বলে আপনাকে দেন্‌নি, যৌতুক বলেই দিয়েছিলেন।

ক্ষণকাল চুপ করিয়া পুনশ্চ কহিল, আজ অপর্য্যাপ্ত সম্পদের দিনে সে সব দুঃখের কথা হয়ত মনে হতে চাইবেনা, হয়ত, সে দিনের একশ টাকার মূল্য আজ হিসেব করাও কঠিন হবে, কিন্তু চেষ্টা করলে এটুকু মনেও পড়তে পারে যে, সে দিনটাও ঠিক এম্‌নি দুর্দ্দিনই ছিল। আজ ষোড়শীর ঋণটাই খুব ভারি বোধ হচ্চে, কিন্তু সেদিন ছোট্ট অলকার কুলটা মায়ের ঋণটাও কম ভারি ছিল না।

জীবানন্দ আহত হইয়া কহিল, তাই মনে করতে পারতাম, যদি না

তিনি ওই ক'টা টাকার জন্যে তাঁর মেয়েকে বিবাহ করতে আমাকে বাধ্য করতেন!

ষোড়শী কহিল, বিবাহ করতে তিনি বাধ্য করেননি, বরঞ্চ করেছিলেন আপনি। কিন্তু থাক্ ওসব বিশ্রী আলোচনা। আপনাকে ত এইমাত্র বলেছি, আজ আর সেই তুচ্ছ টাকা ক'টার মূল্য নিরূপণ সম্ভব হবেনা, কিন্তু ওই মাত্র ছিল অলকার মায়ের জীবনের সঞ্চয়। মেয়ের কোন একটা সদ্গতি করবার ওছাড়া আর কিছু যখন তাঁর হাতে ছিলনা, তখন টাকা ক'টির সঙ্গে মেয়েটাকেও আপনারই হাতে দিতে হ'ল। কিন্তু বিবাহ ত আপনি করেননি, করেছিলেন শুধু একটু তামাসা। সম্প্রদানের সঙ্গে সঙ্গেই সেই যে নিরুদ্দেশ হলেন, এই বোধ হয় তারপরে কাল প্রথম দেখা।

জীবানন্দ কহিল, কিন্তু তারপরে ত তোমার সত্যিকারের বিবাহই হয়েছে শুনেচি।

ষোড়শী ধৈর্য্য হারাইলনা। তেম্নি শান্ত গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিল, তার মানে আর একজনের সঙ্গে? এই না? কিন্তু নিরপরাধ নিরুপায় বালিকার ভাগ্যে এ বিড়ম্বনা যদি ঘটেই থাকে, তবু ত আপনার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।

জীবানন্দ কুণ্ঠিত হইয়া কহিল, ষোড়শী, তখন তুমি ছেলেমানুষ ছিলে, অনেক কথাই ঠিক জানোনা। তোমার মা যদি আজ বেঁচে থাক্‌তেন, তিনি সাক্ষী দিতেন তিনি সত্যি কি চেয়েছিলেন। তোমার বাবাকে আজকের পূর্ব্বে কখনো দেখিনি, কেবল সেই সম্প্রদানের রাত্রে নামটা মাত্র শুনেছিলাম। কিন্তু তিনিই যে তারাদাস, তুমিই যে অলকা, সে আমি স্বপ্নেও কল্পনা করিনি!

ষোড়শী তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিল, আজও ত কল্পনা করবার প্রয়োজন নেই।

জীবানন্দ কহিল, নাই থাক্, কিন্তু তোমার মা জানতেন শুধু কেবল তোমাকে তোমার বাবার হাত থেকে আলাদা রাখবার জন্যেই তিনি যাহোকে একটা—

বিবাহের গণ্ডী টেনে রেখেছিলেন? তা হবেও বা। অলকার মাও বেঁচে নেই, অলকাই আমি কিনা তা নিয়েও আপনার দুশ্চিন্তা করার আবশ্যক নেই। কিন্তু কেন যে ওঁদের সঙ্গে গেলুমনা, কেন যে নিজের সর্ব্বনাশের কোথাও কিছু বাকি রাখলুমনা, সেই কথাটাই আজ আপনাকে বলে যাবো। কাল আপনার সন্দেহ হয়েছিল হয়ত বা আমি লেখা-পড়া জানি; লিখ্‌তে-পড়্‌তে ত ওই এককড়িও জানে, সে নয়,— কিন্তু, আমার যিনি গুরু, তিনি হাতে রেখে কিছু দান করেননা, তাই আজ তাঁরই পায়ে নিজেকে এমন কোরে বলি দিতেও আমার বাধ্‌লনা।

জীবানন্দ কিছুক্ষণ নীরবে নতমুখে থাকিয়া ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া বলিল, কিন্তু ধর, আসল কথা যদি তুমি প্রকাশ কোরে বল, তা'হলে—

ষোড়শী তৎক্ষণাৎ কহিল, আসল কথাটা কি? বিবাহের কথা? কিন্তু সেই ত মিথ্যে। বিয়ে ত হয় নি। তা'ছাড়া সে সমস্যা অলকার, আমার নয়। আমি সারা রাত এখানে কাটিয়ে গিয়ে ও গল্প করলে সর্ব্বনাশের পরিমাণ তাতে এতটুকু কমবেনা। কিন্তু ও কথা ত আর আমি ভাব্‌চিনে। আমার বড় দুঃখ এখন আর আমি নিজে নয়,—সে আপনি। কাল ভেবেছিলুম আপনার বুঝি সাহসের আর অন্ত নেই,— নিজের প্রাণটাও বুঝি তার কাছে ছোট, কিন্তু আজ দেখতে পেলাম সে

ভূল। শুধু যে এক নিরপরাধ নারীর কলঙ্কের মূল্যেই আজ নিজেকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন তাই নয়, একদিন যে অনাথ মেয়েটিকে অকূলে ভাসিয়ে দিয়েই কেবল আত্মরক্ষা করেছিলেন, আজ তাকে চেন্‌বার সাহস পর্য্যন্ত আপনার হয়নি।

জীবানন্দ কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া অকস্মাৎ বলিয়া উঠিল, ষোড়শী, আজ আমি এত নীচে নেবে গেছি যে গৃহস্থের কুলবধূর দোহাই দিলেও তুমি মনে মনে হাস্‌বে, কিন্তু সেদিন অলকাকে বিবাহ কোরে বীজ্‌গার জমিদার-বংশের বধূ বলে সমাজের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়াটাই কি ভাল কাজ হোতো ?

ষোড়শী অসঙ্কোচে উত্তর দিল, সে ঠিক জানিনে, কিন্তু সত্য কাজ হোতো এ জানি। যার সমস্ত দুর্ভাগ্য জেনেও যাকে হাত পেতে নিতে আপনার বাধেনি, তাকে অমন করে ফেলে না পালালে এতবড় লাঞ্ছনা আজ আপনার ভাগ্যে ঘট্‌তনা। সেই সত্যই আজ আপনাকে এ দুর্গতি থেকে বাঁচাতে পারতো। কিন্তু আমি মিথ্যে বক্‌চি, এখন এ সব আর আপনার কাছে বলা নিষ্ফল। আমি চল্লুম,—আপনি কোন কিছু দেবার চেষ্টা করে আর আমাকে অপমান করবেননা।

জীবানন্দ কিছুই কহিলনা, কিন্তু এককড়িকে দ্বারপ্রান্তে দেখিতে পাইয়া সে হঠাৎ যেন কাঙাল হইয়া বলিয়া উঠিল, এককড়ি, তোমাদের এখানে কোন ডাক্তার আছেন ? একবার খবর দিয়ে আনাতে পারো ? তিনি যা' চাবেন আমি তাই দেব !

ষোড়শী চমকিয়া উঠিল। নিজের অভিমান ও উত্তেজনার মধ্যে দিয়া এতক্ষণ পর্য্যন্ত দৃষ্টি তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত দিকেই আবদ্ধ ছিল।

এককড়ি কহিল, ডাক্তার আছে বই কি হুজুর,—আমাদের বল্লভ

ডাক্তারের খাসা হাত-যশ। এই বলিয়া সে সমর্থনের জন্য ভৈরবীর প্রতি চাহিল।

ষোড়শী কথা কহিলনা, কিন্তু জীবানন্দ ব্যগ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, তাঁকেই আন্‌তে পাঠাও এককড়ি, আর একমিনিট দেরি কোরো না। আর ঐখানে সব খালি বোতল পড়ে আছে,—কাউকে বলে দাও গরম জল করে আনুক। কোথায় গেল এরা?

এককড়ি কহিল, ঐ কথাটাই ত নিবেদন করতে আসছিলাম, হুজুর, পুলিশের ভয়ে কে যে কোথায় সরেছে কাউকে খুঁজে পেলামনা।

কেউ নেই, সব পালিয়েছে?

সব, সব, জনপ্রাণী নেই। ওরা কি আর মানুষ হুজুর! কই, আমি ত—

জীবানন্দ ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, ডাক্তার আনা কি হবেনা এককড়ি?

এককড়ি বাধা পাইয়া মনে মনে লজ্জিত হইয়া কহিল, হবে না কেন হুজুর, আমি নিজেই যাচ্চি, এখনো তিনি ঘরেই আছেন। কিন্তু গরম জল করতে গেলে ত বড় দেরি হয়ে যাবে? তা ছাড়া হুজুরকে একলা—

কিন্তু কথাটা শেষ হইবার সময় হইলনা। ভিতরের একটা উচ্ছ্বসিত দুঃসহ বেদনায় জীবানন্দর মুখখানা চক্ষের পলকে বিবর্ণ হইয়া উঠিল, এবং ইহাকেই দমন করিতে সে উপুড় হইয়া পড়িয়া কেবল অস্ফুট কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, উঃ—আর আমি পারিনে!

ষোড়শীকে কিসে যেন কঠিন আঘাত করিল। এতবড় করুণ, হতাশ কণ্ঠস্বরও যে এমন দুর্দ্দান্ত পাষণ্ডের মুখ দিয়া বাহির হইতে পারে, এ যেন তাহার স্বপ্নাতীত। আসলে মানুষ যে কত দুর্ব্বল, কত নিরুপায়, দুঃখের

বেদনায় মানুষে-মানুষে যে কত এক, কত আপনার, এই কথাটা মনে করিয়া তাহার চোখের কোণে জল আসিয়া পড়িল। কিন্তু এক-মুহূর্ত্তে আপনাকে সম্বরণ করিয়া লইয়া সে হতবুদ্ধি এককড়ির প্রতি চাহিয়া কহিল, তুমি বল্লভ ডাক্তারকে ডেকে আনোগে এককড়ি, এখানে যা' করবার আমি কোরবো এখন। পথে কাউকে যদি দেখ্‌তে পাও, পাঠিয়ে দিয়ো, বোলো, পুলিশের ভয় আর কিছু নেই।

এককড়ি আশ্চর্য্য হইলনা, বরঞ্চ খুসী হইয়া বলিল, ডাক্তারবাবুকে যেখানে পাই আমি আন্‌বই। কিন্তু রান্নাঘরটা কি আপনাকে দেখিয়ে দিয়ে যাবো?

ষোড়শী মাথা নাড়িয়া কহিল, দরকার নেই, আমি নিজেই খুঁজে নিতে পারবো। তুমি কিন্তু কোন কারণেই কোথাও দেরি কোরোনা।

আজ্ঞে, না, আমি যাবো আর আস্‌ব, বলিতে বলিতে এককড়ি দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেল।

৬

সন্ধান করিয়া রান্না-ঘর হইতে যখন ষোড়শী বোতলে জল গরম করিয়া আনিয়া উপস্থিত করিল, তখনও লোক-জন কেহ ফিরিয়া আসে নাই। জীবানন্দ তেম্‌নি উপুড় হইয়া পড়িয়া। সে পদশব্দে মুখ তুলিয়া চাহিয়া বলিল, তুমি? ডাক্তার আসেনি?

ষোড়শী কহিল, এখনো ত তাঁদের আসবার সময় হয়নি। এই বলিয়া সে হাতের বোতল দু'টা শয্যার একধারে রাখিয়া দিল।

জীবানন্দ কথাটাকে ঠিক যেন বিশ্বাস করিতে পারিলনা; কহিল, এখনো আসবার সময় হয়নি? ডাক্তার কতদূরে থাকেন জানো?

ষোড়শী কহিল, জানি, কিন্তু পোনর মিনিটের মধ্যেই কি আসা যায়?

জীবানন্দ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, সবে পোনর মিনিট? আমি ভেবেচি দু-ঘণ্টা তিন-ঘণ্টা কি আরও কতক্ষণ যেন এককড়ি তাঁকে আন্‌তে গেছে। হয়ত, তিনিও ভয়ে এখানে আসবেননা অলকা! এই বলিয়া সে চুপ করিয়া আবার উপুড় হইয়া শুইল। তাহার কণ্ঠস্বরে এবং চোখের দৃষ্টিতে ব্যাকুল নিরাশ্বাসের কোথাও যেন আর শেষ রহিলনা।

ষোড়শী ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া স্নিগ্ধ স্বরে কহিল, ডাক্তার আস্‌বেন বই কি। গরম জলের বোতল ততক্ষণ কেন টেনে নিন্‌না?

জীবানন্দ তেম্‌নি ভাবেই মাথা নাড়িয়া বলিল, না, ও থাক্‌। ওতে আমার কিছু হয়না, কেবল কষ্ট বাড়ে।

ষোড়শী সহসা কোন প্রতিবাদ করিলনা। এই উপায়হীন রোগগ্রস্ত

লোকটির মুখ হইতে তাহার নিজের শিশুকালের নামটা এতক্ষণ পরে যেন এই প্রথম তাহার কানে-কানে গুন্ গুন্ করিয়া কি একটা অজানা রহস্যের অর্থ বলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বোধ হয় ইহাতেই মগ্ন হইয়া সে নিজের ও পরের, সুমুখের ও পশ্চাতের সমস্তই ভুলিয়া গিয়া অভিভূতের ন্যায় দাঁড়াইয়া ছিল, হঠাৎ জীবানন্দর প্রশ্নেই তাহার হুঁস হইল।

অলকা ?

নামটাকে আর সে উপেক্ষা করিতে পারিল না। কহিল, আজ্ঞে ?

জীবানন্দ বলিল, এখনো সময় হয়নি ? হয়ত তিনি আস্‌বেননা, হয়ত কোথাও চলে গেছেন।

ষোড়শী কহিল, আমি নিশ্চয় জানি তিনি আস্‌বেন,—তিনি কোথাও যাননি।

বাড়ীতে কেউ কি এখনো ফিরে আসেনি ?

ষোড়শী বলিল, না।

জীবানন্দ একমুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, বোধ হয় তারা আর আস্‌বেনা,—বোধ হয় এককড়িও একটা ছল্ কোরে চলে গেল।

ষোড়শী মৌন হইয়া রহিল। জীবানন্দ নিজেও বোধ হয় একটা ব্যথা সাম্‌লাইয়া লইয়া একটু পরেই বলিল, সবাই গেছে, তারা যেতে পারে,—কেবল তোমারই যাওয়া হবেনা।

কেন ?

বোধ করি আমি বাঁচবনা,—তাই। আমার নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্চে, মনে হচ্চে, পৃথিবীতে আর বুঝি হাওয়া নেই।

আপনার কি বড্ড কষ্ট হচ্চে ?

হুঁ। অলকা, আমাকে তুমি মাপ কর।

ষোড়শী নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল। জীবানন্দ একটু থামিয়া পুনরায় কহিল, আমি ঠাকুর-দেব্‌তা মানিনে,—দরকারও হয়না। কিন্তু একটু আগেই মনে মনে ডাক্‌ছিলুম। জীবনে অনেক পাপ করেচি, তার আর আদি-অবধি নেই। আজ থেকে থেকে কেবলি মনে হচ্চে বুঝি সব দেনা মাথায় নিয়েই যেতে হবে।

ষোড়শী তেম্‌নি নীরবেই দাঁড়াইয়া রহিল। জীবানন্দ কহিল, মানুষ অমরও নয়, মৃত্যুর বয়সও কেউ দাগ দিয়ে রাখেনি—কিন্তু এই যন্ত্রণা আর সইতে পারচিনে—উঃ—মাগো! বলিতে বলিতেই তাহার সর্ব্ব-শরীর ব্যথার অসহ্য তীব্রতায় যেন আকুঞ্চিত হইয়া উঠিল।

ষোড়শী চাহিয়া দেখিল তাহার কেবল দেহই নয়, কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম দিয়াছে এবং বিবর্ণ মুখে দুই নিমীলিত চক্ষের নীচে রক্তহীন ওষ্ঠাধর একটা অত্যন্ত কঠিন রেখায় সংবদ্ধ হইয়া গেছে।

পলকের জন্য কি একটা সে ভাবিয়া লইল, বোধ হয় একবার একটু দ্বিধাও করিল; তারপরে এই পীড়িতের শয্যায় হতভাগ্যের পার্শ্বে গিয়া উপবেশন করিল। গরম জলের বোতল দু'টা সাবধানে তাহার পেটের কাছে টানিয়া দিতে জীবানন্দ কেবল ক্ষণিকের জন্য একবার চোখ মেলি-য়াই আবার মুদিত করিল। ষোড়শী আঁচল দিয়া তাহার ললাটের স্বেদ মুছাইয়া দিল, এবং হাত-পাখার অভাবে সেই অঞ্চলটাই জড় করিয়া ধীরে-ধীরে বাতাস করিতে লাগিল।

জীবানন্দ কোন কথা কহিলনা, কেবল তাহার ডান হাতটা ধীরে ধীরে তুলিয়া ষোড়শীর ক্রোড়ের উপর রাখিয়া নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল।

মিনিট দশ পনেরো এম্‌নি নীরবে কাটিবার পরে জীবানন্দই প্রথমে কথা কহিল। ডাকিল, অলকা?

ষোড়শী কহিল, আপনি আমাকে ষোড়শী বলে ডাক্‌বেন।

আর কি অলকা হতে পারো না?

না।

কোন দিন কোন কারণেই কি—

আপনি অন্য কথা বলুন।

কিন্তু অন্য কথা জীবানন্দর মুখ দিয়া আর বাহির হইলনা, শুধু নিবারিত দীর্ঘশ্বাসের শেষ বাতাসটুকু তাহার বক্ষের সম্মুখটাকে ঈষৎ বিস্ফারিত করিয়া দিয়া শূন্যে মিলাইল।

মিনিট দুই তিন পরে ষোড়শী মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার কষ্টটা কি কিছুই কমেনি?

জীবানন্দ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, বোধ হয় একটু কমেছে। আচ্ছা, যদি বাঁচি, তোমার কি কোন উপকার করতে পারিনে?

ষোড়শী কহিল, না, আমি সন্ন্যাসিনী,—আমার নিজের কোন উপকার করাই কারও সম্ভব নয়।

জীবানন্দ কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, আচ্ছা এমন কিছুই কি নেই, যাতে সন্ন্যাসিনীও খুসি হয়?

ষোড়শী কহিল, তা' হয়ত আছে, কিন্তু সে জন্যে কেন আপনি ব্যস্ত হচ্চেন?

জীবানন্দ এইবার একটুখানি ক্ষীণ হাসি হাসিয়া কহিল, আমার ঢের দোষ আছে, কিন্তু পরের উপকার করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ি, এ দোষ আজও কেউ আমাকে দেয়নি। তা'ছাড়া এখন বল্‌চি বলেই যে ভাল হয়েও

বোল্‌বো, তারও কোন নিশ্চয়তা নেই,—এম্‌নিই বটে! এম্‌নিই বটে! সারাজীবনে এ ছাড়া আর আমার কিছুই বোধ হয় নেই।

ষোড়শী নীরবে আর একবার তাহার কপালের ঘাম মুছাইয়া দিল। জীবানন্দ হঠাৎ সেই হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া কহিল, সন্ন্যাসিনীর কি সুখ দুঃখ নেই? সে খুসি হয়, পৃথিবীতে এমন কি কিছুই নেই?

ষোড়শী বলিল, কিন্তু সে তো আপনার হাতের মধ্যে নয়।

জীবানন্দ বলিল, যা মানুষের হাতের মধ্যে? তেমন কিছু?

ষোড়শী বলিল, তাও আছে, কিন্তু ভাল হয়ে যদি কখনো জিজ্ঞাসা করেন, তখনই জানাবো।

তাহার হাতটাকে জীবানন্দ সহসা বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া বার বার মাথা নাড়িয়া কহিল,না না,আর ভাল হয়ে নয়,—এই কঠিন অসুখের মধ্যেই আমাকে বল! মানুষকে অনেক দুঃখ দিয়েচি, আজ নিজের ব্যথার মধ্যে পরের ব্যথা পরের আশার কথাটা একটু শুনে নিই। নিজের দুঃখটার আজ একটা সদ্গতি হোক্।

ষোড়শী আপনার হাতটাকে ধীরে ধীরে মুক্ত করিয়া লইয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। জীবানন্দ নিজেও মিনিট খানেক স্থির ভাবে থাকিয়া কহিল, বেশ তাই হোক্, সকলের মত আমিও তোমাকে আজ থেকে ষোড়শী বলেই ডাক্‌বো। কাল থেকে আজ পর্য্যন্ত আমি এত যন্ত্রণার মধ্যেও মাঝে মাঝে অনেক কথাই ভেবেচি। বোধ হয় তোমার কথাটাই বেশি। আমি বেঁচে গেলুম, কিন্তু তোমার যে এখানে—

ষোড়শী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, কিন্তু আমার কথা থাক্।

জীবানন্দ বাধা পাইয়া ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল, আমি বুঝেচি ষোড়শী! তোমার জন্যে আমি ভাবি এও আর তুমি

চাও না। এম্‌নিই হওয়া উচিত বটে! বলিয়া সে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিল।

ষোড়শী বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, জীবানন্দ চোখ মেলিয়া কহিল, তুমিও চল্‌লে?

ষোড়শী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না। ঘরটা ভারি নোঙরা হয়ে রয়েচে,—একটু পরিষ্কার করে ফেলি। এই বলিয়া সে সম্মতির জন্য অপেক্ষা না করিয়াই গৃহ-কার্য্যে নিযুক্ত হইল। ঘরের অধিকাংশ জানালা দরজাই এ পর্য্যন্ত খোলা হয় নাই; বিস্তর টানাটানি করিয়া সেগুলো খুলিয়া ফেলিতেই উন্মুক্ত আকাশ দিয়া এক মুহূর্ত্তে আলো ও বাতাসে ঘর ভরিয়া গেল; মেঝের উপর আবর্জ্জনার রাশি নানাস্থানে প্রতিদিন স্তূপাকার হইয়া উঠিয়াছিল, একটা ঝাঁটা সন্ধান করিয়া আনিয়া ষোড়শী সমুদয় পরিষ্কার করিয়া ফেলিল, এবং অঞ্চল দিয়া বিছানাটা ঝাড়িয়া ফেলিয়া বালিশ দুটা যখন যথাস্থানে গুছাইয়া দিল, তখনও জীবানন্দ একটা কথা কহিলনা, কেবল তাহার মলিন মুখের উপর একটা স্নিগ্ধ আলোক যেন কোথা হইতে আসিয়া ধীরে ধীরে স্থিতি লাভ করিতেছিল। ষোড়শী কাজ করিতেছিল, সে শুধু দুই চক্ষু মেলিয়া তাহাকে নীরবে অনুসরণ করিতেছিল, যেন শৃঙ্খলা ও পরিচ্ছন্নতা কি, সমস্ত বেদনা ভুলিয়া সে সংসারের সর্ব্বোত্তম বিস্ময়ের মত জীবনে এই প্রথম দেখিতেছিল।

সহসা বাহিরে অনেকগুলা পদশব্দ শুনিয়া ষোড়শী ঝাঁটাটা রাখিয়া দিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল। এককড়ি দ্বারের কাছে মুখ বাহির করিয়া বলিল, ডাক্তারবাবু এসেছেন।

ষোড়শী কহিল, তাঁকে নিয়ে এস। এই বলিয়া সে তাহার পূর্ব্বস্থানে গিয়া উপবেশন করিল।

পরক্ষণেই যে চিকিৎসকের হাতযশ এ অঞ্চলে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ, সেই বল্লভ ডাক্তার আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন, এবং ষোড়শীকে এখানে এ ভাবে দেখিয়া তিনি একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন।

এককড়ি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, ঐ যে হুজুর। যদি ভাল করতে পারেন ডাক্তারবাবু, বক্‌সিসের কথা ছেড়েই দিন্,—আমরা সবাই আপনার কেনা হয়ে থাক্‌বো।

ডাক্তার নীরবে আসিয়া শয্যাপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন, এবং পকেট হইতে কাঠের চোঙাটা বাহির করিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে রোগ পরীক্ষা করিতে নিযুক্ত হইলেন। বিস্তর ঘসা-মাজা করিয়া তিনি বেশ বড় ডাক্তারের মতই রায় দিলেন। বলিলেন, অত্যাচার করিয়া রোগ জন্মিয়াছে. সাবধান না হইলে প্লীহা কিম্বা লিভার পাকা অসম্ভব নয়,—এবং তাহাতে ভয়ের কথাও আছে। কিন্তু সাবধান হইলে নাও পাকিতে পারে, এবং তাহাতে ভয়ও কম। তবে এ কথা নিশ্চয় যে ঔষধ খাওয়া আবশ্যক।

জীবানন্দ প্রশ্ন করিলেন, এ অবস্থায় কলিকাতায় যাওয়া সম্ভব কি না বল্‌তে পারেন?

ডাক্তার কহিলেন, যদি যেতে পারেন, তা হইলে সম্ভব, নইলে কিছুতেই সম্ভব নয়।

জীবানন্দ পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, এখানে থাক্‌লে ভাল হবে কি না বল্‌তে পারেন।

ডাক্তার অত্যন্ত বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া জবাব দিলেন, আজ্ঞে না হুজুর, তা বল্‌তে পারিনে। তবে, এ কথা নিশ্চয় যে এখানে থাক্‌লেও ভাল হতে পারেন, আবার কলকাতা গিয়ে ভাল নাও হতে পারেন।

জীবানন্দ মনে মনে বিরক্ত হইয়া আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করিলেন না।

ডাক্তার ঔষধের জন্য লোক পাঠাইবার ইঙ্গিত করিয়া উপযুক্ত দর্শনী লইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। এককড়ি তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া দ্বারের বাহিরে পর্য্যন্ত আসিয়া ফিরিয়া গেলে জীবানন্দ তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিলেন, কি হবে এককড়ি ?

এককড়ি সাহস দিয়া বলিল, ভয় কি হুজুর, ওষুধ এল বলে। বল্লভ ডাক্তারের একশিশি মিক্‌চার খেলেই সব ভাল হয়ে যাবে।

জীবানন্দ মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না এককড়ি, তোমাদের বল্লভের মিকচার তোমাদেরই থাক্‌, আমাকে তুমি কেবল কলকাতা যাবার একটা বন্দোবস্ত আজই করে দাও। এই বলিয়া তিনি যে দ্বার দিয়া ষোড়শী কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে অন্যত্র সরিয়া গিয়াছিল, সেই দিকে উৎসুক চক্ষে চাহিয়া রহিলেন।

কিন্তু কেহই ফিরিয়া আসিলনা। মিনিট দুই তিন পরে তাঁহার অধৈর্য্য আর মানা মানিলনা, কহিলেন, ওঁকে একবার ডেকে দিয়ে তুমি যাবার একটা ব্যবস্থা করগে এককড়ি ! আজ যাওয়া আমার চাই-ই।

এ সঙ্কেত এককড়ি চক্ষের নিমিষে বুঝিল, এবং যে আজ্ঞে হুজুর, বলিয়া তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল। কিন্তু ফিরিয়া আসিতে তাহার বিলম্ব হইতে লাগিল, এবং মিনিট পনেরো বিলম্বে যখন সে যথার্থ ই আসিল, তখন একাকীই আসিল ; কহিল, তিনি নেই, বাড়ী চলে গেছেন হুজুর !

জীবানন্দ বিশ্বাস করিতে পারিলনা। ব্যগ্র ব্যাকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আমাকে না জানিয়ে চলে যাবেন ? এমন হতেই পারেনা এককড়ি !

বিশ্বাস করা সত্যই কঠিন। অলকা কোন ব্যবস্থা না করিয়াই চলিয়া ল, একটা কথা বলিয়া গেলনা,—ডাক্তারের অভিমতটুকু শুনিয়া যাইবার

পর্য্যন্ত তাহার ধৈর্য্য রহিলনা—এ কথা জীবানন্দ কিছুতেই যেন মনের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারিলেননা।

এককড়ি বলিল, হাঁ হুজুর, তিনি ডাক্তারবাবু যাবার পরেই চলে গেছেন। বাইরে গোপাল কাওরা বসে আছে, সে দেখেছে ভৈরবী ঠাকরুণ সোজা চলে গেলেন।

জীবানন্দ আর প্রতিবাদ করিলেননা। এককড়ি কহিল, তা'হলে একটু বেলা-বেলি যাত্রা করার ব্যবস্থা করিগে হুজুর?

হাঁ, তাই কর, বলিয়া জীবানন্দ পাশ ফিরিয়া দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া শুইলেন। এককড়ি কলিকাতা যাত্রার বিস্তর খুঁটি নাটির আলোচনা করিতে লাগিল; কিন্তু প্রভুর নিকট হইতে কোন কথারই প্রত্যুত্তর আসিল-না। কথাগুলা তাঁহার কানেই গেল কি না, তাহাও ঠিক বুঝা গেলনা।

৭

জমিদারের বিলাস-কুঞ্জ হইতে ষোড়শী যখন নিঃশব্দে সরিয়া গেল, তখন বেলা বোধ হয় ন'টা-দশটা। এমন করিয়া চলিয়া আসাটা তাহার বিশ্রী ঠেকিতে লাগিল, কিন্তু তখনই মনে হইল, বলিয়া-কহিয়া বিদায় লইয়া আসাটা আরও অশোভন আরও বাড়াবাড়ি হইত। কিন্তু গেটের বাহিরে আসিয়া দেখিল আর একপদও অগ্রসর হওয়া চলেনা। এবার নাবী বর্ষায় কৃষকদের ধান্য রোপণের কাজ-কর্ম্ম তখনও মাঠে শেষ হইয়া যায় নাই, উহাদেরই মাঝখান দিয়া গ্রামের একমাত্র পথ। এই প্রকাশ্য দিনের বেলায় এই পথের উপর দিয়া মুখ উঁচু বা নীচু করিয়া কোন ভাবেই হাঁটিয়া যাইতে তাহার পা উঠিলনা। আকাশের বিদ্যুৎ এক মুহূর্ত্তে অন্ধকারের পর্দ্দা তুলিয়া মেঘাচ্ছন্ন পৃথিবীর বক্ষটাকে যেমন সুস্পষ্ট করিয়া দেয়, দূরের ঐ চাষীগুলাও ঠিক তেমনি করিয়া চক্ষের পলকে ষোড়শীর বিগত রাত্রিটাকে তাহার কাছে অত্যন্ত অনাবৃত করিয়া দিল। আবরণের নীচে যে এত জিনিষ ঢাকা ছিল, কোন মানুষের জীবনেই যে একটা রাত্রির মধ্যে এত বড় ব্যাপার ঘটিয়া উঠিতে পারে দেখিতে পাইয়া সে ক্ষণিকের জন্য যেন হতজ্ঞান হইয়া রহিল। সম্পূর্ণ একটা দিনও কাটে নাই, মাত্র কাল সায়াহ্ন বেলায় অপমানের প্রবল তাড়নে দিগ্বিদিক না ভাবিয়া এই পথ দিয়াই সে হাঁটিয়া গেছে, কিন্তু তাহার পরে? তাহার পরের ঘটনা ঘটিতে মানুষের বহু যুগ লাগিতে পারে, অথচ, তাহার লাগে নাই। এ যেন একটা ভোজ-বাজী হইয়া গেল, তাই আজ পরিচিত পথটারই ও-ধারে তাহার কি যে অপেক্ষা করিয়া আছে তাহা কল্পনা করিতেও পারিলনা। ফটকের

বাহিরে বাগানের ধার দিয়া একটা পায়ে-হাঁটা পথ নদীর দিকে গিয়াছে, কেবল মাত্র সম্মুখের রাস্তাটা বলিয়াই সে এই পথ দিয়া ধীরে ধীরে নদীর তীরে আসিয়া দাঁড়াইল। এ দিকে গ্রাম নাই, গরু-ছাগল চরাইতে ক্বচিৎ কোন রাখাল বালক ভিন্ন এ পথে সচরাচর কেহ চলেনা,—এই নিরালা স্থানটায় সন্ধ্যার জন্য অপেক্ষা করিয়া সে অন্ধকারে গা ঢাকিয়া ঘরে ফিরিবে মনে করিয়া একটা প্রাচীন তেঁতুল গাছের তলায় বসিয়া পড়িল। এতক্ষণ পর্য্যন্ত সে যে ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়াছিল, তাহাতে বর্ত্তমানের চিন্তা ছাড়া আর কিছুই তার মনে ছিলনা। এইবার যে ভবিষ্যৎ সাগ্রহে তাহার পথ চাহিয়া আছে, তাহার কথাই একটি একটি করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিতে লাগিল। তাহাদের ছোট গ্রামে এতক্ষণ কোন কথাই কাহারও অবিদিত নাই; জমিদার তাহাকে ধরিয়া আনিয়াছে, সারারাত্রি আটক রাখিয়াছে,—এই কয়দিনের অত্যাচারে গ্রামে ইহা এমনিই একটা সাধারণ ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে যে, এ জন্য বিশেষ কোনরূপ চিন্তিত হইবার আবশ্যক নাই। এমন কি, কেন যে সে মিথ্যা কহিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের কবল হইতে জমিদারকে উদ্ধার করিয়াছে এ রহস্যোদ্ভেদ করিবার গ্রামে বুদ্ধিমান লোকের অভাব হইবেনা। এ যে একটা বড় রকমের ঘুষের ব্যাপার তাহা সকলেই বুঝিবে। কিন্তু, আসল বিপদ হইতেছে তাহার পিতা তারাদাসকে লইয়া। বহুকাল হইতেই উভয়ের সহজ সম্বন্ধটা বাহিরের অগোচরে ভিতরে ভিতরে পচিয়া উঠিতেছিল, এইবার তাহা ঘৃণার বাষ্পে অনেকখানি স্থান ব্যাপিয়া জ্বলিতে থাকিবে। ইহার শিখা কাহারও দৃষ্টি হইতে আড়াল করা সম্ভব হইবেনা। সংসারে সে লোকটার অসাধ্য কার্য্য নাই। তাহার অনেক কুকর্ম্মে বাধা দিয়া পিতা ও কন্যার মধ্যে অনেক গোপন সংগ্রাম হইয়া গেছে; চিরদিন পিতাকেই পরাভব মানিতে হইয়াছে, অথচ, নানা কারণে

এতকাল তাহাকে ষোড়শীর মাতার সম্বন্ধে মৌন থাকিতেই হইয়াছে। কিন্তু আজ যখন তারাদাস ক্রোধবশে একবার কথাটা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে, তখন আর সে কোন মতেই চুপ করিয়া থাকিবেনা। এই কলঙ্কের কালী দুই হাতে ছড়াইয়া নিজের সঙ্গে আর একজনের সর্ব্বনাশ করিয়া তবে গ্রাম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবে। ইহা যে অকিঞ্চিৎকর নয়, ইহা যে তাহার সমস্ত ভবিষ্যৎটাকে আঁধার করিয়া তুলিবে, তাহাও ষোড়শী দূর হইতে স্পষ্ট দেখিতে লাগিল ; কিন্তু সেই অন্ধকারের অভ্যন্তরে যে কি সঞ্চিত আছে তাহার কোন আভাসই তাহার চোখে পড়িলনা। বেলা বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, এইখানে বসিয়া ভিতরের উদ্যোগ আয়োজনের অস্পষ্ট কোলাহল মাঝে মাঝে তাহার কানে আসিতে লাগিল, এবং তাহারই ফাঁকে ফাঁকে জীবানন্দর মুখের অলকা নাম, তাহার সলজ্জ ক্ষমা-ভিক্ষা, তাহার ব্যাকুল প্রার্থনা, এম্নি কত-কি যেন একটা ভুলে যাওয়া কবিতার ভাঙা-চোরা চরণের মত রহিয়া রহিয়া তাহার মনের মধ্যে অকারণে আনাগোনা করিতে লাগিল ; অথচ যে সঙ্কট ওই গ্রামখানার মধ্যে তাহারই প্রতীক্ষায় উদ্যত হইয়া আছে, তাহার বিভীষিকা সেই মনের মধ্যেই অনুক্ষণ তেম্‌নি ভীষণ হইয়াই রহিল !

ক্রমশঃ, ধীরে ধীরে সূর্য্যদেব অপর প্রান্তে হেলিয়া পড়িলেন, এবং তাহারই একটা দীপ্ত রশ্মি হইতে মুখ ফিরাইতে গিয়া হঠাৎ বহুদূরে পর-পারের মাঠের মধ্যে জমিদারের পাল্‌কিখানা তাহার চোখে পড়িল।

এই দিকেই যখন তাহারা গিয়াছে, তখন, একসময়ে নিকট দিয়াই গিয়াছে, সে খেয়াল করে নাই, হয়ত, চেষ্টা করিলে একটু দেখা যাইতেও পারিত, কিন্তু, এখন অজ্ঞাতসারে শুধু কেবল তার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল।

অপরাহ্ণ সায়াহ্নে এবং সায়াহ্ন সন্ধ্যায় অবসান হইতে অধিক বিলম্ব হইলনা। ষোড়শী গ্রামের উদ্দেশে যাত্রা করিয়া যখন উঠিয়া দাঁড়াইল তখনও মানুষ চিনা যায়, কিন্তু মাঠে লোক ছিলনা। এবং এই নির্জ্জন পথটা অতিক্রম করিয়া যখন নিজের গৃহের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল তখন অন্ধকার গাঢ়তর হইয়াছে। কাহারও সহিত সাক্ষাৎ না হইলেও তাহার মনের মধ্যে ঝড় বহিতেছিল, কিন্তু, সদর দরজায় তালা বন্ধ দেখিয়া সে যেন একটা কঠিন দায় হইতে অব্যাহতি পাইয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। ঘুরিয়া খিড়কীর দ্বারে গিয়া দেখিল ভিতর হইতে তাহা আবদ্ধ ;—ইহাই সে প্রত্যাশা করিয়াছিল,—কিন্তু, এই কবাটটা সে বাহিরে হইতে খুলিবার কৌশল জানিত। অনতিবিলম্বে ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিল ঘরে ঘরে তালা বন্ধ, কেহ কোথাও নাই,—সমস্ত বাড়ীটা অন্ধকার, শূন্য খাঁ খাঁ করিতেছে।

সন্ন্যাসিনীকে অনেক উপবাস করিতে হয়, খাওয়ার কথা তাহার মনেও ছিলনা ; কোথাও নিরালায় একটু শুইতে পাইলেই সে আপাততঃ বাঁচিয়া যাইত ; কিন্তু ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিবার যখন উপায় নাই, তখন বারান্দার উপরেই একধারে সে নিজের অঞ্চলটা পাতিয়া শুইয়া পড়িল। তারাদাস গৃহে নাই, কেন নাই, কি জন্য নাই, কোথায় গিয়াছে, এই সকল কূট প্রশ্নমালা হইতে তাহার নিরতিশয় শ্রান্ত দেহ-মন অত্যন্ত সহজেই সরিয়া দাঁড়াইল, এবং রাত্রিটার মত যে সে নিরুপদ্রবে ঘুমাইতে পাইবে, এই তৃপ্তিটুকু লইয়াই সে দেখিতে দেখিতে নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

ভোর বেলায় ষোড়শীর যখন ঘুম ভাঙ্গিল তাহার অব্যবহিত পরেই সদর দরজায় চাবি খুলার শব্দ হইল এবং যে বিধবা স্ত্রীলোকটি মন্দিরের ও গৃহের কাজ-কর্ম্ম করে, সে আসিয়া প্রবেশ করিল। ষোড়শীকে দেখিয়া

সে অধিক বিস্মিত হইলনা, কহিল, কখন্ এলে মা, রাত্তিরেই ? খিড়কির দোর খুলে ঢুকেছিলে বুঝি ?

ষোড়শী ঘাড় নাড়িয়া সায় দিলে সে বলিল, এই কথাই সক্কলে বলাবলি করছিল মা, রাজাবাবু ত অ-বেলায় চলে গেল, এইবার তোমাকে ছেড়ে দেবে। খাওয়া-দাওয়া হয়নি বুঝি ? কি কোরব মা, ঘরের চাবি বাবাঠাকুর ত রেখে যায়নি, সঙ্গে নে গেছে। তা হোগ্‌গে, দোকান থেকে চাল-ডাল এনে দি, কাঠ-কুটো দুটো জোগাড় কোরে দি, চান কোরে এসে যা হোক দুমুটো ফুটিয়ে নিয়ে মুখে দাও। তারপরে যা' হবার তা' হবে।

ষোড়শী জিজ্ঞাসা করিল, বাবা কোথায় গেছেন জানিস্ রাণীর-মা ?

রাণীর-মা কহিল, শুন্‌চি ত মা, কে নাকি তাঁর বোনের মেয়ে আছে ; তাকেই আন্‌তে গেছে। এলো বলে। আজ বড়কর্ত্তা বাবুর নাতীর মানত পূজো, আজ কি আর কোথাও থাকবার যো আছে ? মন্দিরে ত পহর রাত থাকতে ধূম লেগে গেছে মা !

ষোড়শীর দপ্ করিয়া মনে পড়িল, আজ মঙ্গলবার, আজ জনার্দ্দন রায়ের দৌহিত্রের মানৎ-পূজা উপলক্ষে জয়-চণ্ডীর মন্দিরে হুলুস্থূল কাণ্ড। আজ কোনমতে কোথাও তাহার লুকাইয়া থাকিবার পথ নাই। সে দেবীর ভৈরবী, এতবড় ব্যাপারে তাহাকে হাজির হইতেই হইবে।

এইখানে জনার্দ্দন রায়ের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। লোকটি যেমন ধনী, তেম্‌নি ভীষণ। একবার একজন প্রজার বেগার দেওয়ার উপলক্ষে ষোড়শীর সহিত ইঁহার অত্যন্ত মনোমালিন্য ঘটে,—সে কথা কোন পক্ষই আজও বিস্মৃত হয় নাই। এবং কেবল ষোড়শীই নয়, এ অঞ্চলের সকলেই ইহাকে অত্যন্ত ভয় করে। জমিদার ইঁহাকে খাতির করে, এককড়ি ইঁহার হাত-ধরা। অনাদায়ী বৎসরে ইনিই

জমিদারের সদর খাজনার যোগান্ দেন। দুইশত বিঘা ইঁহার নিজ চাষ এবং ধান-চাল-গুড় হইতে তেজারতী ও বন্ধকী কারবার ইঁহার একচেটে বলিলেও অত্যুক্তি হয়না। অথচ, এই বড়কর্ত্তাই একদিন অতি নিঃস্ব ছিলেন। জনশ্রুতি এইরূপ যে এ সমস্তই তাঁহার মধ্যম জামাতা মিষ্টার বসুর টাকা। তিনি পশ্চিমের কোন্ একটা হাই-কোর্টের বড় ব্যারিষ্টার। বিলাত হইতে ফিরিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়া জাতে উঠিয়াছিলেন। আজ তাঁহারই একমাত্র পুত্রের সর্ব্ববিধ মঙ্গল কামনায় চণ্ডীর পূজার আয়োজন হইতেছে। এবং আয়োজন কেবল আজ নয়, মাসাধিক কাল হইতেই গ্রামের মধ্যে ইহার কথাবার্ত্তা চলিয়াছে। বড়কর্ত্তার যে মেয়েটি এত বড় ঘরে পড়িয়াছে, সেই হৈমবতীকে ষোড়শী ছেলেবেলায় চিনিত। তাহার চেয়ে বয়সে সামান্য কিছু ছোটই হইবে। মন্দির-প্রাঙ্গণে যে ছোট্ট পাঠশালাটি এখনও বসে, সকলের সঙ্গে সেও পড়িতে আসিত। এবং খেলাচ্ছলে যদি কোন দিন ষোড়শী উপস্থিত হইত দেবীর ভৈরবী বলিয়া সকলের সঙ্গে সেও প্রণাম করিয়া পদধূলি লইত। আজ সে বড় ঘরের ঘরণী। আজ হয়ত তাহার দেহে সৌন্দর্য্য এবং ঐশ্বর্য্যের মণি-মাণিক্য ধরেনা,—আজ হয়ত তাহাকে চিনিতেও পারিবেনা। কিন্তু একদিন এমন ছিলনা। সেদিন তাহার রূপ এবং বয়স কোনটাই বেশি ছিলনা; তবু যে সে এতবড় ঘরে পড়িয়াছে, শুনা যায়, সে কেবল এই দেবীর মাহাত্ম্যে। কোন্ এক অমাবস্যায় নাকি এক সিদ্ধ তান্ত্রিক দেবী দর্শনে আসিয়াছিলেন; রায় মহাশয় গোপনে এই কন্যার কল্যাণেই কি সব যাগ-যজ্ঞ করাইয়া লইয়াছিলেন। এই পুত্রটিও নাকি তাঁহারই করুণায়। হতাশ হইয়া হৈম বিদেশে এই দেবীকেই মানৎ করিয়া পুত্রলাভ করিয়াছে।

দাসী কাজ করিতে করিতে কহিল, মা, মন্দিরে আজ হঠাৎ কখন্ ডাক পড়ে বলা যায়না, এইবেলা কেন চানটানগুলো সেরে নিলেনা ?

ষোড়শী অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতেছিল, মন্দিরে ডাক্‌পড়ার নামে চমকিয়া উঠিল। কিন্তু সেজন্য না হোক্ বেলা বাড়িবার পূর্ব্বেই নিভৃতে স্নান করিয়া আসাই ভাল মনে করিয়া সে কালবিলম্ব না করিয়া খিড়্‌কীর দ্বার দিয়া পুষ্করিণীতে চলিয়া গেল। এই পুকুরটায় পাড়ার কেহ বড় একটা আসেনা, তাই সেখানে কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইলনা। ফিরিয়া আসিয়া দেখিল ভিজা কাপড় ছাড়িবার দ্বিতীয় বস্ত্র নাই, গা-মাথা মুছিবার একটা গামছা পর্য্যন্ত বাহিরে নাই। রাণীর-মা লক্ষ্য করিয়া ক্ষুণ্ণ হইল। সে তারাদাসকে দেখিতে পারিতনা, রাগ করিয়া কহিল, বিটলে খড়-কুটোটি পর্য্যন্ত তালা বন্ধ করে গেছে,—আমার একখানি কাচা মটকার কাপড় আছে, মা, নে আসবো ? তাতে তো দোষ নেই।

ষোড়শী কহিল, না, থাক্।

ভিজে কাপড় গায়ে শুখোবে মা, অসুখ করবে যে ?

ষোড়শী চুপ করিয়া রহিল। দাসী তাহার শুষ্ক মুখের প্রতি চাহিয়া ব্যথার সহিত বলিল, ক'দিন যে উপোস করচ মা, তা কে জানে! মেলেচ্ছ ব্যাটাদের ঘরে যে তুমি জলটুকু ছোঁবেনা তা' আমি বেশ জানি। এই বেলা দুটো চাল ডাল দোকান থেকে না হোক্ আমার বাড়ী থেকে এনে রেখে যাইনে মা ?

ষোড়শী মাথা নাড়িয়া শুধু কহিল, না, ওসব এখন থাক্ রাণীর-মা।

এই দাসীটি কায়স্থের মেয়ে। তাহার বোধ-শোধ ছিল, এ লইয়া আর নিষ্ফল পীড়াপীড়ি করিলনা। কাজ-কর্ম্ম শেষ করিয়া, যাইবার

সময় প্রশ্ন করিল, বাবাঠাকুরকে মন্দিরে দেখতে পেলে কি একবার আড়ালে ডেকে পাঠিয়ে দেব?

ষোড়শী কহিল, থাক্, তার আবশ্যক নেই।

দাসী কহিল, তালা দেবার দরকার নেই, দোরটা তুমি ভেতর থেকেই বন্ধ করে দাও। কিন্তু, আচ্ছা মা, কেউ যদি কোন কথা জিজ্ঞেসা করে ত কি—

ষোড়শী ক্ষণকাল মাত্র চুপ করিয়া রহিল, তাহার পরে মুখ তুলিয়া কহিল, হাঁ, বোলো আমি বাড়ীতেই আছি। এবং রাণীর-মা চলিয়া গেলে সে দ্বার আর রুদ্ধ হইলনা, তেমনিই উন্মুক্তই রহিল। সুমুখের বারান্দার উপরে নিঃশব্দে নত মুখে বসিয়া ঘণ্টা দুই তিন যে কেমন করিয়া কোথা দিয়া গেল ষোড়শী জানিতেও পারে নাই; কেবল একটা অনির্দ্দিষ্ট বেদনার মত তাহার মনের মধ্যে এই ভাবটা ছিল যে এইবার তাহার একটা অত্যন্ত কঠোর দুঃসময় আসিতেছে। পরীক্ষাচ্ছলে একটা অতিশয় কদর্য্য আন্দোলন এইবার গ্রামের মধ্যে উত্তাল হইয়া উঠিবে। অথচ, যুদ্ধের জন্য, আত্মরক্ষার জন্য আজ তাহার মন কিছুতেই বদ্ধ-পরিকর হইতে চাহিলনা, বরঞ্চ, সে যেন কেবলি তাহার কানে কানে এই কথাই কহিতে লাগিল, তুমি সন্ন্যাসিনী, এই সকল কথার বড় কথাটা আজ তোমার মনে রাখিতেই হইবে। জ্ঞানে হোক, অজ্ঞানে হোক, ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, একদিন যে তোমার এই দেহটা দেবতার কাযে উৎসর্গ করা হইয়াছিল, এই সকল সত্যের বড় সত্যটা আজ তোমার কিছুতেই অস্বীকার করিলে চলিবেনা। তোমাকে পণ রাখিয়া মিথ্যার বাজী যাহারা খেলিতেছিল, মরুক্ না তাহারা মারা-মারি কাটা-কাটি করিয়া, তুমি এইবার মুক্তি লইয়া বাঁচ।

ঠিক এম্‌নি সময়ে দ্বার খুলিয়া মন্দিরের বৃদ্ধ পুরোহিত প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইল। কহিল, মা, এঁরা একবার তোমাকে ডাকচেন।

চল, বলিয়া ষোড়শী তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। কেন, কোথায় বা কাহারা ডাকিতেছেন, প্রশ্ন মাত্র করিলনা, যেন এই জন্যই সে প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়াছিল। তাহার উদ্যত বিপদ সম্বন্ধে পুরোহিত বেচারার বোধ হয় কিছু আভাস দিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ভৈরবীর মুখের প্রতি চাহিয়া তাহার কোন কথাই মুখে আসিলনা।

আজ মন্দির-প্রাঙ্গণের বড় দ্বার খোলা। প্রবেশ করিতেই দেখিতে পাইল ও-ধারের দেয়ালের গায়ে গোটা দুই কালো রঙের পাঁঠা বাঁধা আছে, এবং বারান্দার একপ্রান্তে পূজার উপকরণ ভারে ভারে স্তূপাকার করা হইয়াছে। তথায় পাঁচ ছয় জন বর্ষীয়সী রমণী বাক্যে এবং কার্য্যে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া আছেন, এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রচণ্ড কলরব উঠিয়াছে প্রাঙ্গণের নাট-মন্দিরের মধ্যে। সেখানে রায় মহাশয়ের সুদৃশ্য এবং প্রশস্ত সতরঞ্চ বিছানো হইয়াছে, এবং তাঁহাকেই মধ্যবর্ত্তী করিয়া গ্রামের প্রবীণের দল যথাযোগ্য মর্য্যাদায় আসীন হইয়া সম্ভবতঃ বিচার করিতেছেন এবং তাহা ষোড়শীকে লইয়া। এতক্ষণ কে শুনিতেছিল বলা যায়না, অথচ আশ্চর্য্য এই যে, যাহার শোনা সব চেয়ে প্রয়োজন সে কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই এই শতকণ্ঠের উদ্দাম বক্তৃতা একেবারে পলকে নিবিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত কোন পক্ষ হইতেই কোন প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল-না। পুরুষেরা সকলেই ষোড়শীর পরিচিত, এবং মেয়েরাও যখন কাজ ফেলিয়া একে একে থামের আড়ালে আসিয়া দাঁড়াইল তাহারাও তাহার অপরিচিত নয়; কেবল যে মেয়েটি সকলের পরে মন্দিরের

মধ্যে হইতে বাহির হইয়া ধীরে ধীরে আসিয়া ঠিক তাহার সম্মুখের জোড়া-থামটা আশ্রয় করিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া তাহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল, সে অচেনা হইলেও ষোড়শী এক মুহূর্ত্তে বুঝিল, এই হৈমবতী। এই মেয়েটি তাহার স্বামী-গৃহ ছাড়িয়া বহুকাল যাবৎ বাপের বাড়ী আসিতে পারে নাই; তাই তাহার সম্বন্ধে জনশ্রুতিও এই বাপের বাড়ীর দেশে উত্তরোত্তর বিবিধ হইয়াই উঠিতেছিল। সে অখাদ্য খানা খায়, ঘাঘ্‌রা এবং জুতা-মোজা পরে, রাস্তায় পুরুষদের হাত ধরিয়া বেড়ায়, সে একেবারে খ্রীষ্টান মেম সাহেব হইয়া গেছে,—এম্‌নি কত কি! আজ কিন্তু ষোড়শী তাহার কিছুই দেখিতে পাইল না। পরণে একখানি মূল্যবান বেনারসি শাড়ী এবং গায়ে দু'একখানা দামী অলঙ্কার ব্যতীত, জুতা-মোজা-ঘাঘ্‌রার কিছুই ছিলনা। বরঞ্চ তাহার সিঁথার সিঁদূর এবং পায়ের আল্‌তা বেশ মোটা করিয়াই দেওয়া, দেখিলেই কোনমতেই মনে হয়না, এ সকল সে বিশেষ করিয়া কেবল আজকার জন্যই ধারণ করিয়া আসিয়াছে। সে সুন্দরী সত্য, কিন্তু অসাধারণ নয়। দেহের রঙ্‌টা হয়ত একটু ময়লার দিকেই, তবে ধনী-ঘরের মেয়েরা যেমন নিরন্তর মাজিয়া ঘষিয়া বর্ণটাকে উজ্জ্বল করিয়া তোলে ইহারও তেমনি—তাহার অধিক নয়। নিমিষের দৃষ্টি-পাতেই ষোড়শীর মনে হইল এই ধনী-গৃহিণী ধনের আড়ম্বরেও যেমন তাহার দেহকে বস্ত্রালঙ্কারের দোকান করিয়া সাজায় নাই, লজ্জা এবং নির্লজ্জতা কোনটার বাড়াবাড়িতেও তেমনি তাহার শিশুকালের গ্রাম-খানিকে বিড়ম্বিত করিয়া তোলে নাই। মেয়েটী নীরবে চাহিয়া রহিল হয়ত শেষ পর্য্যন্ত এমনি নীরবেই রহিবে, কিন্তু ইহারই সম্মুখে নিজের আসন্ন দুর্গতির আশঙ্কায় ষোড়শীর লজ্জায় ঘাড় হেঁট হইয়া গেল।

আরও মিনিট দুইতিন নিঃশব্দে কাটিয়া গেলে বৃদ্ধ সর্ব্বেশ্বর শিরোমণি প্রথমে কথা কহিলেন, ষোড়শীকে উদ্দেশ করিয়া অতিশয় সাধুভাষায় তাঁহাদের অভিমত ব্যক্ত করিয়া বলিলেন, আজ হৈমবতী তাঁর পুত্রের কল্যাণে যে পূজা দিতেছেন তাতে তোমার কোন অধিকার থাক্‌বেনা, তাঁর এই সংকল্প তিনি আমাদের জানিয়েছেন। তাঁর আশঙ্কা তোমাকে দিয়ে তাঁর কার্য্য সুসিদ্ধ হবেনা।

ষোড়শীর মুখ একেবারে পাণ্ডুর হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাহার গলায় জড়িমা ছিলনা। কহিল, বেশ। তাঁর কায যাতে সুসিদ্ধ হয় তিনি তাই করুন।

তাহার এই কণ্ঠস্বরের সুস্পষ্টতায় সর্ব্বেশ্বর শিরোমণি নিজের গলাতেও যেন জোর পাইলেন; বলিলেন, কেবল এইটুকুই ত নয়! আমরা গ্রামস্থ ভদ্রমণ্ডলী আজ স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েচি যে, দেবীর কাজ আর তোমাকে দিয়ে হবেনা! মায়ের ভৈরবী তোমাকে রাখ্‌লে আর চল্‌বেনা। কে আছ, একবার তারাদাস ঠাকুরকে ডাকো ত?

একজন তাহাকে ডাকিতে গেল। ষোড়শীর মুখে যে প্রত্যুত্তর আসিয়াছিল, তাহার পিতার নামে সেইখানেই তাহা বাধিয়া গেল, সে মুখ তুলিয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, কেন চল্‌বেনা? কিন্তু বলিয়া ফেলিয়া সে নিজেই যেন চমকিয়া গেল। ভিড়ের মধ্য হইতে কে একজন কহিল, সে তোমার বাবার মুখেই শুন্‌তে পাবে।

ষোড়শী এ কথার আর কোন উত্তর দিলনা, চাহিয়া দেখিল তাহার পিতা কে-একটি বছর দশেকের মেয়েকে সঙ্গে করিয়া আসিতেছে, এবং তাহাদের পশ্চাতে আর একটী বয়স্থা স্ত্রীলোক সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে। ইহাদের কাহাকেও ষোড়শী পূর্ব্বে দেখে নাই,

তথাপি বুঝিল ,উনিই পিসি, এবং এই মেয়েটিই সেই অচেনা পিসির কন্যা।

এ সমস্তই যে রায় মহাশয়ের কৃপায়, তাহা ভিতরে ভিতরে সকলেই জানিত, ষোড়শীরও অজানিত নয়। রায় মহাশয় নীরব থাকিলেও তাঁহার চোখের উৎসাহ পাইয়াও তারাদাস প্রথমে কথা কহিতে পারিলনা, পরে জড়াইয়া জড়াইয়া যাহা কহিল তাহারও অধিকাংশ স্পষ্ট হইলনা, কেবল একটা কাজের কথা বুঝা গেল যে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, এবং ইহাকে সেবায়েৎ হইতে অপসারিত না করিলে ভাল হইবেনা।

ইহাই যথেষ্ট। একটা কলরব উঠিল, অনেকেই রায় দিলেন যে এতবড় গুরুতর ব্যাপারে কাহারও কোন আপত্তি খাটিতে পারেনা। পারেনা তাহা ঠিক। যাঁহারা চুপ করিয়া রহিলেন, তাঁহারাও এই সত্যটাই মানিয়া লইলেন। কারণ, কেন পারেনা, এমন প্রশ্ন করিবার মত দুঃসাহস কাহারও ছিলনা। অথচ, আশ্চর্য্য এই যে ঠিক তাহাই ঘটিল। কোলাহল থামিলে শিরোমণি এই নিষ্পত্তিটিই বোধ হয় আর একটু ফলাও করিতে যাইতেছিলেন, সহসা একটি মৃদু কণ্ঠস্বর শোনা গেল,—বাবা?

সবাই মুখ তুলিয়া চাহিল। রায় মহাশয় নিজেও মুখ তুলিয়া এদিকে-ওদিকে চাহিয়া পরিশেষে কন্যার কণ্ঠস্বর চিনিতে পারিয়া সস্নেহে সাড়া দিলেন, কেন মা?

হৈম মুখখানি আরও একটু বাড়াইয়া কহিল, আচ্ছা বাবা, সাহেব যে রাগ করেছেন এ কি কোরে জানা গেল?

বড়কর্ত্তা প্রথমে একটু বিস্মিত হইলেন, তারপরে বলিলেন, জানা

গেছে বই কি মা! বেশ ভাল করেই জানা গেছে। এই বলিয়া তিনি তারাদাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

হৈম পিতার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া কহিল, পরশু থেকে ত সমস্তই শুন্‌চি বাবা, তাতে কি ওঁর কথাটাই সত্যি বলে মেনে নিতে হবে?

রায় মহাশয় ইহার ঠিক জবাবটা খুঁজিয়া না পাইয়া শুধু বলিলেন, নয়ই বা কেন শুনি?

হৈম তারাদাসের পুরোবর্ত্তী সেই ছোট মেয়েটাকে দেখাইয়া বলিল, ঐটিকে যখন যোগাড় কোরে এনেচেন, তখন মিথ্যে বলা কি এতই অসম্ভব বাবা? তা' ছাড়া সত্যি-মিথ্যে ত যাচাই করতে হয়, ও ত এক-তরফা রায় দেওয়া চলেনা!

কথা শুনিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইল, এমন কি ষোড়শী পর্য্যন্ত বিস্মিত চক্ষে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল। ইহার উত্তর দিলেন সর্ব্বেশ্বর শিরোমণি। তিনি স্মিতহাস্যে মুখখানি সরস করিয়া কহিলেন, বেটী কৌঁসুলির গিন্নী কি না, তাই জেরা ধরেচে। আচ্ছা, আমি দিচ্চি থামিয়ে। এই বলিয়া তিনি হৈমর প্রতি চাহিয়া কহিলেন, এটা দেবীর মন্দির,—পীঠস্থান! বলি, এটা ত মানিস্?

হৈম ঘাড় নাড়িয়া বলিল, মানি বৈ কি।

শিরোমণি বলিলেন, তা' যদি হয়, তা'হলে তারাদাস বামুনের ছেলে হয়ে কি দেবমন্দিরে দাঁড়িয়ে মিছে কথা কইচে পাগ্‌লি?

এই বলিয়া তিনি প্রবল হাস্যে সমস্ত স্থানটা গরম করিয়া তুলিলেন।

তাঁহার হাসির বেগ মন্দীভূত হইলে হৈম কহিল, আপনি নিজেও ত তাই শিরোমণি জ্যাঠামশাই। অথচ এই দেবমন্দিরে দাঁড়িয়েই ত মিছে

কথার বৃষ্টি করে গেলেন! আমি বলেচি ওঁকে দিয়ে পূজো করালে আমার কাজ সিদ্ধ হবেনা, এর বিন্দু-বিসর্গও ত সত্য নয়!

শিরোমণি হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন, রায় মহাশয় মনে মনে অত্যন্ত কুপিত হইয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিলেন, কে তোমাকে বল্‌লে হৈম, সত্যি নয়, শুনি?

হৈম একটুখানি হাসিয়া কহিল, আমিই বল্‌চি সত্যি নয় বাবা। তার কারণ আমি কখনো অমন কথা বলা ত দূরে, মনেও করিনে। আমি ওঁকে দিয়েই পূজো করাবো; এতে আমার ছেলের কল্যাণই হোক্ আর অকল্যাণই হোক্। ষোড়শীর প্রতি চাহিয়া বলিল, আপনি হয়ত আমাকে চিন্‌তে পার্‌চেননা, কিন্তু আমার আপনাকে তেম্‌নি মনে আছে। চলুন মন্দিরে, আমাদের সময় বয়ে যাচ্চে। এই বলিয়া সে এক পদ অগ্রসর হইয়া বোধ হয় তাহার কাছেই যাইতেছিল, কিন্তু নিজের মেয়ের কাছে অপমানের এই নিদারুণ আঘাতে পিতা ধৈর্য্য হারাইয়া ফেলিলেন; তিনি অকস্মাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া ভীষণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, কখনো না। আমি বেঁচে থাক্‌তে ওকে কিছুতে মন্দিরে ঢুক্‌তে দেবনা। তারাদাস, বল ত ওর মায়ের কথাটা! একবার শুনুক সবাই। ভেবেছিলাম ওটা আর তুল্‌তে হবেনা, সহজেই হবে।

শিরোমণি সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিলেন, না, তারাদাস থাক্। ওর কথা আপনার মেয়ে হয়ত বিশ্বেস করবেনা রায় মশাই! ও-ই বলুক! চণ্ডীর দিকে মুখ করে ও-ই নিজের মায়ের কথা নিজে বলে যাক্! কি বলেন চৌধুরী মশায়? তুমি কি বল হে যোগেন ভট্চায? কেমন? ও-ই নিজে বলুক!

গ্রামের এই দুই দুই দিক্‌পালের সাংঘাতিক অভিযোগে উপস্থিত সকলেই যেন বিভ্রান্ত হইয়া উঠিল। ষোড়শীর পাণ্ডুর ওষ্ঠাধর কি একটা

বলিবার চেষ্টায় বারম্বার কাঁপিতে লাগিল,—মুহূর্ত্ত পরে হয়ত সে কি একটা বলিয়াও ফেলিত, কিন্তু হৈম দ্রুতপদে তাহার কাছে আসিয়া হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া শান্ত দৃঢ় স্বরে বলিল, না, আপনি কিছুতেই কোন কথা বল্‌বেননা। পিতার মুখের প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, আপনারা ওঁর বিচার করতে চান নিজেরাই করুন, কিন্তু ওঁর মায়ের কথা ওঁর নিজের মুখ দিয়ে কবুল করিয়ে নেবেন, এতবড় অন্যায় আমি কোনমতে হতে দেবনা। ওঁরা যা পারেন করুন, চলুন আপনি আমার সঙ্গে মন্দিরের মধ্যে—এই বলিয়া সে আর কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া ষোড়শীকে একপ্রকার জোর করিয়াই সম্মুখের দিকে ঠেলিয়া লইয়া চলিল।

মন্দিরের অভ্যন্তরে একপাশে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া ষোড়শী কহিল—না বোন্, আমি পূজো কোরবনা।

কেন?—বলিয়া হৈম সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, ভৈরবীর মুখ ম্লান, কোনরূপ আনন্দ বা উৎসাহের লেশমাত্র নাই এবং তাহার প্রশ্নের উত্তর সে যেন একটু চিন্তা করিয়াই দিল। কহিল, এর কারণ যদি কখনো বল্‌বার দরকার হয়, সে শুধু তোমাকেই বোল্‌ব, কিন্তু আজ নয়। তা'ছাড়া আমি নিজেও বড়-একটা পূজো করিনে ভাই, যিনি এ কাজ নিত্য করেন তিনিই করুন, আমি কেবল এইখানে দাঁড়িয়ে তোমার ছেলেকে আশীর্ব্বাদ করি, সে যেন দীর্ঘজীবী হয়, নীরোগ হয়, মানুষ হয়। সন্তানের প্রতি ভৈরবীর এই ঐকান্তিক আশীর্ব্বচনেও মায়ের মন হইতে অপ্রসন্নতা ঘুচিলনা। সে কুণ্ঠিতস্বরে কহিল, কিন্তু আজকের দিনটা যে একটু অন্য রকমের দিদি। আপনি নিজের হাতে পূজো না করলে যে ওঁদের কাছে ভারি ছোট হয়ে যাবো। এই বলিয়া সে একবার উন্মুক্ত দ্বার দিয়া বাহিরের বিক্ষুব্ধ জনতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। ষোড়শীর নিজের দৃষ্টিও উহাকে অনুসরণ না করিয়া পারিলনা। দেখিল সকলে এই দিকেই চাহিয়া আছে। তাহাদের চোখ ও মুখের উপর উৎকট কলহের চিহ্ন একান্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে,—ঠিক যেন অধীর সৈনিকের দল কেবলমাত্র তাহাদের অধিপতির ইঙ্গিতের অপেক্ষায় বহু দুঃখে তাহাদের যুদ্ধ-বেগ সংযত করিয়া আছে। কিন্তু রায়-মহাশয় সে ইঙ্গিত দিলেননা। তিনি ঘোর সংসারী লোক, মুহূর্ত্তেই বুঝিলেন উপস্থিত ক্ষেত্রে তিনি প্রকাশ্যে ধনী কন্যা-জামাতার বিরুদ্ধাচরণ করিতে

পারেননা। অল্পকালেই তাঁহার রক্ত-চক্ষু অবনত হইয়া আসিল, এবং কাহাকেও আর একটি কথাও না কহিয়া তিনি গাত্রোত্থান করিয়া ধীরে ধীরে মন্দির-প্রাঙ্গণ ত্যাগ করিয়া গেলেন। দুইচারিজন অনুগত ব্যক্তি ভিন্ন কেহই তাঁহার সঙ্গ লইলনা। বৃদ্ধ শিরোমণি মহাশয় রহিয়া গেলেন, এবং অনেকেই ব্যাপারটা শেষ পর্য্যন্ত কি গড়ায় জানিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিল।

হৈম মিনতি করিয়া কহিল, মা-ভৈরবীর আশীর্ব্বাদ আমরা মাতা-পুত্রে মাথায় কোরে নিলাম, কিন্তু সে আশীর্ব্বাদ আমি আপনার দিয়েই পাকা করে নিতে চাই, দিদি। বেশ, আমি অপেক্ষা করতে পারবো ; পূজা আজ বন্ধ থাক্—যে দিন আপনি আদেশ করবেন, এই উদ্যোগ আয়োজন আবার না হয় সেদিনই হবে।

ষোড়শী মাথা নাড়িয়া কহিল, সে সুবিধে আর হবে কি না এ কথা ত আজ তোমাকে নিশ্চয় করে বল্‌তে পারবনা বোন্।

হৈম সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, তবে কি মা-চণ্ডীর ভৈরবী আর আপনি থাক্‌বেননা ?

ষোড়শী শুধু বলিল, আজও ত তাই আছি।

হৈম কহিল, তবে ? বলিয়াই দেখিতে পাইল দ্বারের চৌকাট ধরিয়া শিরোমণি দাঁড়াইয়া আছেন। চোখোচোখি হইতেই তিনি সদর্পে অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিলেন, তোমার বাবা আর আমি সেই কথাই ত এতক্ষণ বকে মরচি গো ! ভালো, আমাদের সবুর সইবে। উনি কাল হোক্, পরশু হোক্, দু'দিন পরে হোক্, দশদিন পরে হোক্ পূজা করুন ! দিন্ তার জবাব !

হৈম ষোড়শীর মুখের প্রতি নির্নিমেষে চাহিয়া রহিল, কিন্তু সে তার কোন উত্তর দিলনা।

শিরোমণি ভৈরবীর ম্লান মুখের প্রতি কটাক্ষে চাহিয়া সহাস্যে কহিল, মা হৈম, এ তো সোজা প্রশ্ন নয়! এ পীঠস্থান, জাগ্রত্‌ দেবতা, দেবীর ভৈরবী ছাড়া এ দেব অঙ্গ স্পর্শ করা ত যে-সে স্ত্রীলোকের কর্ম্ম নয়! বুকের সে জোর থাকে, থাকুন উনি মায়ের ভৈরবী,—আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু আমরা জানি সে আর ওঁর সাধ্যই নেই!

ইঙ্গিতটা এতই সুস্পষ্ট যে লজ্জায় হৈমর পর্য্যন্ত মাথা হেঁট হইয়া গেল। ষোড়শী নিজেও অভিভূতের মত ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া অকস্মাৎ আপনাকে আপনি ধাক্কা মারিয়া যেন সম্পূর্ণ অচেতন করিয়া তুলিল। শিরোমণিকে সে কোন উত্তর দিলনা, কিন্তু বুড়া পূজারীকে হঠাৎ একটা ধমক্ দিবার মত তীক্ষ্ণ-কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, ছোট্‌ঠাকুর মশাই, তুমি ইতস্ততঃ কোরচ কিসের জন্যে? আমার আদেশ রইল দেবীর পূজা যথারীতি সেরে তুমি নিজের প্রাপ্য নিয়ো, বাকি মন্দিরের ভাঁড়ারে বন্ধ কোরে চাবি আমাকে পাঠিয়ে দিয়ো। হৈমের প্রতি চাহিয়া কহিল, অনেক আয়োজন করেচ, এ সব নষ্ট করা উচিত হবে না ভাই। আমি আশীর্ব্বাদ করে যাচ্চি এতেই তোমার ছেলের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ হবে। আমার নিজের পূজা আহ্নিক এখনো বাকি রয়েচে, আমি এখন চল্‌লাম,—সময় যদি পাই ত আবার আস্‌বো। এই বলিয়া সে আর বাদানুবাদ না করিয়া বাহির হইয়া গেল। মুহূর্ত্ত কয়েকের জন্য সকলেই নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল, কিন্তু ক্ষণপরেই অপমান ও অবহেলায় বৃদ্ধ শিরোমণি অঙ্কুশ আহত পশুর ন্যায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বয়সোচিত মর্য্যাদা-বোধ ও ছদ্ম-গাম্ভীর্য্য কোথায় ভাসিয়া গেল, দৃষ্টি-বাহিভূ্ত ষোড়শীর উদ্দেশে একটা অভদ্র ইঙ্গিত করিয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন, এবার মন্দিরে ঢুক্‌লে গলা-ধাক্কা খেয়ে মরতে হবে জানিস্! নষ্ট মেয়েমানুষ কোথাকার! ভেবেচিস্ গাঁয়ে মানুষ নেই? আজও জনার্দ্দন রায় বেঁচে,

আজও সর্ব্বেশ্বর শিরোমণি মরেনি, তা জানিস্! এই সকল অভিযোগ ও আস্ফালনের প্রতিবাদ করিবার তথায় কেহ ছিলনা, বরঞ্চ তাঁহারই পোষকতায় রমণীগণের মধ্য হইতে বর্ষীয়সী কে একজন বলিয়া ফেলিল, হতভাগীকে ঝাঁটা মেরে দূর কর শিরোমণি মশাই, বড় অহঙ্কার! বড় অহঙ্কার! জমিদারের বাগান-বাড়ীতে এক রাত এক দিন কাটিয়ে এসে বলে কি না বাবুর অসুখ হয়েছিল! হয়েই যদি থাকে ত তোর কি! কিন্তু, বলিতে বলিতেই সহসা প্রতিমার প্রতি চক্ষু পড়িতেই তাঁহার ঈর্ষা-পীড়িত উচ্ছৃঙ্খল রসনা চক্ষের পলকে শান্ত ও সংযত হইয়া গেল; নিজের দুই কান তিনি তৎক্ষণাৎ দুই হাতে স্পর্শ করিয়া কণ্ঠস্বর অত্যন্ত সুমিষ্ট ও কোমল করিয়া অতঃপর কহিতে লাগিলেন, মায়ের ভৈরবী, নিন্দে করলে মহাপাপ হবে, নিন্দে আমি করচিনে, কিন্তু তাই বলে কি এতটা ভাল। সাহেব ভালমানুষ, তাই ছেড়ে দিলে, নইলে মিথ্যের দায়ে নিজের বাপের হাতেই যে দড়ি পোড়ত! কিন্তু ইহাতে উপস্থিত কেহই আর কথা যোগ করিল-না। ষোড়শী যাহাই করুক, সে যে চণ্ডী-মাতার ভৈরবী এই সত্যটা হঠাৎ উত্থাপিত হইয়া না পড়িলে কু-কথার প্রবাহটা বোধ করি এমন করিয়া তখনি থামিত না। কিন্তু তাই বলিয়া শিরোমণি মহাশয়ের রাগ পড়ে নাই, তিনি পুনশ্চ কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, হৈম মলিন অবসন্ন মুখখানি তুলিয়া আস্তে আস্তে কহিল, ওসব কথা এখন থাক্ শিরোমণি জ্যাঠামশাই। তাড়াতাড়ি ত নেই,—এখন আমার ছেলের পূজোটি হয়ে যাক্।

তাই হোক্, তাই হোক্, বলিয়া শিরোমণি তাঁহার দুঃসহ বিরক্তি ও ক্রোধ তখনকার মত সম্বরণ করিয়া চলিয়া গেলেন এবং হৈম অদূরে এক-ধারে নির্জীবের মত নিঃশব্দে বসিয়া পড়িল। এই লজ্জাকর ও নিরতিশয় অপ্রিয়কর আলোচনা সে এই ভাবে বন্ধ করিয়া দিল সত্য, পুরোহিতও

সাড়ম্বরে দেবীর পূজা সুরু করিয়া দিলেন, কিন্তু হৈম তাহার অন্তরের মধ্যে উৎসাহ বা আনন্দের লেশমাত্র খুঁজিয়া পাইলনা। তাহার পিতা ও লোকগুলার দুর্ব্যবহারে এবং বিশেষ করিয়া ওই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের জঘন্য ইতরতায় তাহার যেমন বিতৃষ্ণা জন্মিল, ষোড়শীর অদ্ভুত আচরণেও তাহার মনের ভিতরটা তেমনি অজ্ঞাত গ্লানি ও সংশয়ের ব্যথায় পরিপূর্ণ হইয়া রহিল। তথাপি পুরোহিতের কাজটা কলের মত অবাধে চলিল। জাগ্রত দেবতার পূজা, বলিদান, হোম প্রভৃতি যাহা কিছু অনেক সময় লইয়া সমস্তই ধীরে ধীরে সমাধা হইয়া আসিল, তাহার পুত্রের কল্যাণে শুভকর্ম্মে কোথাও কোন বিঘ্নই ঘটিলনা, কিন্তু ষোড়শী আর ফিরিলনা।

দাসীর ক্রোড়ে ছেলেকে দিয়া হৈম যখন বাড়ী ফিরিয়া আসিল তখন বেলা প্রায় অপরাহ্ণ। আসিয়া দেখিল তাহার পিতা কিম্বা শিরোমণি মহাশয় কেহই এতক্ষণ আলস্যে সময় কাটান নাই। বাহিরের বসিবার ঘরে তুমুল কোলাহল হইতেছে ; তাহার প্রাবল্য দেখিয়া সহজেই বুঝা গেল একযোগে অনেকগুলি বক্তাই স্ব স্ব মন্তব্য প্রকাশের প্রয়াস করিতেছেন। অলক্ষ্যে কোনমতে পাশ কাটাইয়া তাহার বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু পিতার দৃষ্টি এড়াইতে পারিলনা, তিনি হাত নাড়িয়া আহ্বান করিয়া কহিলেন, হৈম, এদিকে একবার শুনে যা' তো মা ?

সে ক্লান্ত দেহে মলিন মুখে ধীরে ধীরে গিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইয়াই দেখিল তথায় একটিমাত্র প্রাণী নীরবে বসিয়া আছেন, যাঁহাকে শ্রোতা বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে,—সে তাহার স্বামী মিষ্টার এন্ বসু, ব্যারিষ্টার। সকলের সমবেত বক্তৃতার উপলক্ষ একমাত্র তিনিই। বেলা দেড়টার ট্রেণে তাঁহার আসিবার একটা কথা ছিল বটে, কিন্তু ঠিক কিছু ছিলনা। স্বামীকে দেখিয়া সে মাথার কাপড়টা আর একটু টানিয়া দিয়া

দ্বারের অন্তরালে সরিয়া দাঁড়াইল। তাহার পিতা সস্নেহ অনুযোগের কণ্ঠে বলিলেন, তখন না বুঝে সুঝে আমাদের কথায় হঠাৎ রাগ কোরে ফেল্‌লে মা, কিন্তু এখন নিজের কানেই ত সব শুন্‌লে? ব্যাপার বুঝ্‌তে ত আর তোমার বাকি নেই, এখন তুমিই বল দেখি মা, অমন মেয়েমানুষকে কি ঠাকুর-দেবতার স্থানে রাখা যায়? এ তো ছেলে-খেলা নয়!

হৈম অত্যন্ত মৃদুস্বরে জবাব দিল, আপনারা যা ভাল বোঝেন করুন।

তাহার পিতা হাস্য করিলেন, কহিলেন, কোরব বই কি মা, কোরব বই কি! করতেই ত গিয়েছিলাম। নির্ম্মল এসেচে ভালই হয়েচে। যদি একটা মামলা মকদ্দমাই বাধে ত বল্‌ পাওয়া যাবে! আর পক্ষে বোধ করি তিনি জমিদারের সাহায্যের আশঙ্কাই করিলেন, কিন্তু শিরোমণি খামকাই উত্তপ্ত হইয়া উঠিলেন এবং হাঁকিয়া কহিলেন, ঘাড় ধরে বার করে দেব তার আবার নালিশ ফরিয়াদ কি হে জনার্দ্দন! জামাই-বাবাজী যখন উপস্থিত আছেন, তখন তিনিই বিচার করুন। তিনিই আমাদের জজ, তিনিই আমাদের ম্যাজিষ্টর! আমরা অন্য জজ-ম্যাজিষ্টর মানিনে। কি বল হে যোগেন ভায়া? তুমি কি বল হে মিত্তির-জা? এই বলিয়া তিনি কয়েকজনের মুখের প্রতি সস্মিত দৃষ্টিপাত করিয়া সহসা কিঞ্চিৎ হাস্য করিলেন। এ ক্ষেত্রে যোগেন ভায়া ও মিত্তিরজার সম্মতি গ্রহণের তাৎপর্য্য ঠিক বুঝা গেলনা, কিন্তু এটা বুঝা গেল, বড়লোক এবং দানশীল জামাই বাবাজী বিচার করুন, আর না করুন, ভবিষ্যতে তাঁহার অনুগ্রহ লাভের পথটা শিরোমণি নিজের জন্য কথঞ্চিৎ প্রশস্ত এবং সুগম করিয়া রাখিলেন।

এই জামাই-বাবাজী মানুষটির মাথার ডগা হইতে জুতার তল পর্য্যন্ত সমস্তই নিষ্কলঙ্ক সাহেবী। সুতরাং প্রত্যুত্তরে মৃদু মধুর হাসিয়া তিনিও যে জবাবটুকু দিলেন তাহাও নিখুঁত সাহেবী। কহিলেন, এই সব মোহন্ত,

মোহন্তানী জাতের লোকগুলোর ব্যাপার সবাই জানে, এরা যেমন অসাধু তেমনি অসচ্চরিত্র। এদের অসাধ্য কাজ নেই। কোন কারণেই এদের প্রশ্রয় দেওয়া অনুচিত। কিন্তু আপনাদের ভৈরবীটি ঠিক কি করেছেন না করেছেন সেটাও নিশ্চিত জানা উচিত।

শিরোমণি বলিয়া উঠিলেন, বাবা নির্ম্মল, জানার আর বাকি কোথাও কিছুই নেই,—কি বল মা, এখনও কি তোমার সন্দেহ আছে? তা'ছাড়া তার মা,—সেই যে একটা মস্ত কথা। এই বলিয়া তিনি হৈমর দিকে বিশেষ একটু কটাক্ষ করিলেন। হৈম অধোমুখে স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার সলজ্জ নীরবতায় ইহাই সকলে অনুভব করিলেন যে সে ভৈরবীর বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট অভিযোগ করিতে লজ্জা এবং সঙ্কোচ বোধ করিতেছে, কিন্তু তাহার সম্বন্ধে ভাল কথা বলিবারও তাহার কিছু নাই।

জনার্দ্দন কন্যাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মা, সমস্ত দিন উপোস করে তোমার মুখ শুকিয়ে গেছে, যাও তুমি বাড়ীর ভেতরে যাও। ভৈরবীকে ডাকতে লোক পাঠানো হয়েছে, যদি আসে ত তোমাকে খবর দেবো।

হৈম চলিয়া যাইতেছিল, এমনি সময়ে যে লোকটা ডাকিতে গিয়াছিল ফিরিয়া আসিয়া যাহা জানাইল তাহার সারমর্ম্ম এই যে, ভৈরবী কেবল যে তাহার প্রজা দিগম্বর ও বিপিনকে দিয়া তালা ভাঙাইয়া সমস্ত ঘরগুলা দখল করিয়া লইয়াছেন তাই নয়, রায় মহাশয়ের হুকুম অগ্রাহ্য করিয়া এখানে আসিতেও সম্মত হন নাই। শুধু কেবল ফকির সাহেবের অনুরোধেই অবশেষে স্বীকার করিয়াছেন। বোধ হয় দশ-পোনর মিনিটের মধ্যেই আসিতে পারেন।

বোধ হয় আসিতে পারেন! তা' বটে! জ্বলন্ত অঙ্গারে ঘৃতাহুতি

পড়িল। এবং সামান্য একটা স্ত্রীলোকের অভাবনীয় দুঃসাহস ও স্পর্দ্ধায় সম্ভ্রান্ত পুরুষগুলির মুখ দিয়া যে সকল শব্দ ও বাক্যাবলীর প্রবাহ নিঃসৃত হইল তাহার আদ্যোপান্ত উল্লেখ না করিয়াও একটা কথা বলা আবশ্যক যে এই ভ্রষ্টা নারীকে কেবল এই মুহূর্ত্তেই গ্রাম হইতে বিদূরিত করা নয়, ইহাকে তালাভাঙা ও অনধিকার প্রবেশের জন্য পুলিশের হাতে দিয়া জেল খাটানোর প্রয়োজনীয়তা তাঁহারা অসংশয়ে প্রকাশ করিলেন। শুধু জামাতা বাবাজীই এই কোলাহলে যোগদান করিলেননা, খুব সম্ভব, তিনি তাঁহার সাহেবী ও ব্যারিষ্টারী এই উভয় মর্য্যাদা রক্ষা করিতেই গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিলেন। কোলাহল কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে জামাতা-সাহেব প্রশ্ন করিলেন, এই ফকির সাহেবটি কেয়? হঠাৎ ইনি জুটলেন কি কোরে?

ইহার সম্বন্ধেও নানাজনে নানা অভিমত প্রকাশ করিলেন। শিরোমণি তাহার সারোদ্ধার করিয়া কহিলেন, ভালো না ছাই! যোচনমান আবার সিদ্ধ পুরুষ! সে সব কিছু নয়, তবে লোকটা কারও মন্দ-টন্দ করেনা; বারুইয়ের ওপারে একটা বটগাছের তলায় আড্ডা; অনেককাল আছে,—তবে মাঝে মাঝে কোথায় যায়, আবার আসে। বছর দুই ছিলনা, আবার শুনচি নাকি দিন পাঁচ ছয় হল ফিরেচে। হয়ত, ওরই মৎলবে তালা ভেঙেছে! বলা কিছুই যায়না,—হাজার হোক্ ম্লেচ্ছ ত!

জামাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু আজ এলেন কি করে?

তারাদাস এতক্ষণ নীরবেই ছিল, এবার কথা কহিল। বলিল, ও-পারের ওই বট্‌গাছের সঙ্গে যায়গা গুলো সব মা-চণ্ডীর। তাই থেকে আলাপ। ফকির সাহেব ষোড়শীকে বড় ভালবাসেন, থাক্‌লে ওখানে ষোড়শী প্রায়ই যায়। তাঁর কাছে পড়া-শুনাও করে দেখেচি। জামাই-

সাহেব একটু হাসির ভাবে কহিলেন, ভালবাসে! বিদ্যাচর্চ্চাও চলে! এই ফকির-সাহেবটির বয়স কত?

তারাদাস লজ্জিত হইয়া বলিল, আজ্ঞে, বুড়োমানুষ তিনি। বয়স বাট বাষট্টির কম নয়, মা বলে ডাকেন। একবার ষোড়শীর ভারি অসুখ হয়েছিল,—প্রায় মরতে বসেছিল,—উনিই ভাল করেন।

সাহেব বলিলেন, ওঃ—তাই না কি! তবে কি জানো বাপু, ওদিকেও সাধু-ফকির, এদিকেও ডাকিনী-যোগিনী! এই সব ভৈরব-ভৈরবীর দলটাকে—কিন্তু শেষ করিতে পারিলেননা। হঠাৎ স্ত্রীর মুখের একাংশে চক্ষু পড়িয়া এই বেফাঁস কথাটা ওখানেই রহিয়া গেল। আর কেহই কথা যোগ করিলনা, কেবল অপ্রতিহতগতি শিরোমণি নিবৃত্ত হইলেননা। অপরাধের বাকিটুকু সদম্ভে সম্পূর্ণ করিয়া দিয়া তিনিই কেবল বলিয়া উঠিলেন, একশোবার বাবাজী, একশো-বার! এই সব ভণ্ড ব্যাটা-বেটিরা যেমন নষ্ট তেমনি ভ্রষ্ট! এই বলিয়া তিনি বাম ও দক্ষিণে দৃষ্টিপাত করিয়া বোধ করি তাঁহার যোগেন ভায়া ও মিত্তিরজার মাথা নাড়াটাও অন্ততঃ প্রত্যাশা করিলেন। কিন্তু এবার তাহারাও নির্ব্বাক্ রহিল, এবং দ্বারের অন্তরাল-বর্ত্তিনী হৈমবতীর শুষ্ক মুখখানি ক্ষণেকের জন্য একেবারে রাঙা হইয়া উঠিল।

ঠিক এই সময়ে ভৈরবীকে সঙ্গে করিয়া, সেই ভণ্ড মুসলমান ফকির ধীর-পদক্ষেপে প্রাঙ্গণের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কাহারও সংশয় রহিলনা যে শিরোমণির উচ্চকণ্ঠে তাঁহাদের শ্রুতিগোচর হইয়াছে।

অনতিবিলম্বে উভয়ে যখন নিকটে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন কাহারও মুখ দিয়া সহসা কথা বাহির হইলনা। একটা অভ্যর্থনা না, বসিতে বলার একটা সামান্য ভদ্রতা-রক্ষা পর্য্যন্ত না। অথচ, মনে মনে সকলেই যেন বিশেষ একটু চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। শিরোমণির

পর্য্যন্ত মনে হইতে লাগিল কি যেন ঠিক হইলনা,—কিসে যেন ভারি একটা ত্রুটি হইতেছে। অথচ সবাই তেম্‌নিই বসিয়া রহিলেন। মিষ্টার বসু-সাহেবের কাছে উভয় আগন্তুকই একেবারে সম্পূর্ণ অপরিচিত। মিনিট দুই-তিন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দ্বারা তিনি দুইজনকেই আপাদ মস্তক বারবার নিরীক্ষণ করিলেন। এই ফকিরটির মাথার চুল হইতে দীর্ঘ দাড়ি গোঁফ সমস্তই একেবারে তুষার শুভ্র, অঙ্গে মুসলমান ফকিরের সাধারণ পোষাক। সচরাচর যাহা দেখা যায় তাহার অধিক কিছু নয়, অথচ,, মনে হয় এই সবল সুদীর্ঘ দেহের উপর এগুলি সমস্ত যেন তাহাদের সামান্যতাকে বহু ঊর্দ্ধে অতিক্রম করিয়া গেছে। তাঁহার গায়ের রঙ জলে ভিজিয়া এবং রৌদ্রে পুড়িয়া এমন একপ্রকার হইয়াছে, যাহা আগে কি ছিল কিছুতেই অনুমান করা যায়না। ফকিরের মুখ ও চোখের উপর সামান্য একটুখানি উৎকণ্ঠিত কৌতূহলের ছায়া পড়িয়াছে বটে, কিন্তু আরও একটু মন দিয়া দেখিলেই দেখা যায়, ইহারই অন্তরালে যে চিত্তখানি বিরাজ করিতেছে, তাহা যেমন শান্ত তেম্‌নি নিরুদ্বেগ এবং তেম্‌নি ভয়হীন। ইঁহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল ষোড়শী। তাহার গৈরিক বস্ত্র, তাহার সুন্দর সুগঠিত, অনাবৃত মাথাটি ভরিয়া রুক্ষ বিস্রস্ত কেশ-ভার, তাহার উপবাস-কঠিন, যৌবন-সন্নদ্ধ দেহের সর্ব্বপ্রকার বাহুল্য-বর্জ্জিত আশ্চর্য্য সুষমা, সর্ব্বোপরি তাহার নত-নেত্রের অপরিদৃষ্ট বেদনার অনুক্ত ইতিহাস,—সমস্ত একসঙ্গে মিশিয়া ক্ষণকালের জন্য সাহেবকে অভিভূত করিয়া ফেলিল।

এই আচ্ছন্ন ভাবটা তাঁহার কাটিয়া গেল ফকিরের একটা কথার ধাক্কায়। এবং সঙ্গে সঙ্গেই নিজের দুর্ব্বলতায় তিনি অকারণে লজ্জিত হইয়া তাঁহার কথার জবাবে খামকা রূঢ় হইয়া উঠিলেন। ফকির নিজেদের প্রথামত অভিবাদন করিয়া যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবু সাহেব, আপনি

কি ডেকে পাঠিয়েছিলেন ? বাবু সাহেব তখন উত্তর দিলেন, তোমাকে ডেকে পাঠাইনি, তুমি যেতে পারো।

ফকির রাগ করিলেননা। একটু হাসিয়া ষোড়শীকে দেখাইয়া শান্তস্বরে বলিলেন, আসামীকে কিন্তু আমিই হাজির করেছি বাবু সাহেব। উনি ত আস্‌তেই চান্‌নি। নেহাৎ দোষ দেওয়াও যায়না, কারণ, সবাই মিলে হট্টগোল করে যে বিচার তাতে বিচারের চেয়ে অবিচারই বেশি হয়। আর সেও ত সকালবেলাই একদফা সাঙ্গ হয়েছিল। কিন্তু আপনার নাম শুনে আমি বল্লুম, চল মা, আমরা যাই। তিনি আইনজ্ঞ মানুষ, তাতে বাইরের লোক,—যদি সম্ভব হয় তিনি সুমীমাংসাই করে দেবেন।

ব্যারিষ্টার সাহেব মনে মনে বুঝিলেন এই ফকিরের সম্বন্ধে তিনি ভুল ধারণা করেন নাই। ইনি যেই হোন্‌, অশিক্ষিত সাধারণ ভিক্ষুক শ্রেণীর নয়। সুতরাং প্রত্যুত্তরে তাঁহাকেও কতকটা ভদ্র হইতে হইল ; কহিলেন, এঁরা ত তালাভাঙা এবং অনধিকার প্রবেশের জন্য পুলিশের হাতে দিয়ে ওঁকে প্রথমটা জেল খাটিয়ে নিতে চান্‌। আর শুনলাম তালাভাঙা না কি আপনার হুকুমেই হয়েছে।

ফকির হাসিয়া কহিলেন, ওরে বাপ রে, একা কেবল অপরাধী নয়, তার সঙ্গে আবার তার সাহায্যকারী ! কিন্তু বাবু সাহেব, আমি শুধু তালা ভাঙবারই মৎলব দিয়েচি, কিন্তু, আইন ভাঙবার পরামর্শ দিইনি। বাড়ীটা দেবোত্তর সম্পত্তি, এবং মা ভৈরবীই তার অভিভাবিকা। তারাদাস খামকা যদি তালা বন্ধ না করতে যেতেন ত ভাল-ভাল তালাগুলো এমন ভেঙ্গে নষ্ট করতে হোতোনা। তারাদাসের প্রতি চাহিয়া কহিলেন, তারাদাস, ও বুদ্ধি তোমাকে কে দিয়েছিলেন বাবা ? কিন্তু যেই দিন সুবুদ্ধি দেননি।

তারাদাস ইহার উত্তর দিতে পারিলনা, এবং অন্য কেহও যখন কোন কথা খুঁজিয়া পাইলনা, নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল, তখন শিরোমণি সাড়ম্বরে গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন, ওকে ভৈরবী কে করেছিল জানেন ফকির সাহেব? সে ওই তারাদাস। এখন ও যদি তাকে না রাখ্‌তে চায় ত সে তার ইচ্ছা। এই আমার মত।

ফকির কহিলেন, শিরোমণি মশাই, মতটাও আপনার বটে, ইচ্ছাটাও তারাদাসের সত্য, কিন্তু সম্পত্তিটা অন্যের। এই অন্য লোকটি এ দুটোর কোনটাতেই সম্মত নয়। কি করবেন বলুন!

তাঁহার উত্তর এবং সেটা বলিবার ভঙ্গীতে ব্যারিষ্টার সাহেব হাসিয়া ফেলিয়া কহিলেন, এঁদের নালিশ এই যে বর্ত্তমান ভৈরবী যে অপরাধ করেছেন তাতে দেবীর সেবায়েৎ হবার সম্পূর্ণ অনধিকারী। উনি তার কিছু সাফাই দিতে পারেন কি? এই বলিয়া তিনি ষোড়শীর আনত মুখের প্রতি একবার কটাক্ষে চাহিয়া লইলেন

ফকির কহিলেন, ওঁকে আসামী করেই আপনাদের সুমুখে দাঁড় করিয়েচি, আবার অপরাধ অপ্রমাণ করবার বোঝাটাও ওঁকেই বইতে অনুরোধ কোরব এতবড় জুলুম ত আমি পেরে উঠবনা বাবু সাহেব।

ব্যারিষ্টার সাহেব মনে মনে লজ্জিত হইয়া নীরব হইলেন, কিন্তু শিরোমণি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, জমিদার জীবানন্দ চৌধুরি যে ভৈরবীকে পেয়াদা দিয়ে ধরে নিয়ে গিয়ে সারারাত আটক রেখেছিল, সে আমরা সবাই জানি, তবে কেন সে সকালে ম্যাজিষ্টার সাহেবের কাছে মিছে কথা বল্‌লে যে সে স্বইচ্ছায় গিয়েছিল, আর জমিদারের অসুখ হ'ল বলেই সমস্ত রাত্রি নিজের ইচ্ছেয় সেখানে ছিল! ও যদি নিষ্পাপ ত এ কথার জবাব দিক!

ফকির জবাব দিলেন কহিলেন, জমিদারের অত্যাচার ও অনাচারে উনি

যে রাগের মাথায় নিজেই গিয়েছিলেন এ কথা ত মিথ্যে নয় শিরোমণি মশায় ? এবং তিনি যে হঠাৎ ভয়ানক অসুস্থ হয়েছিলেন এ ঘটনাও ত সত্য ?

জনার্দ্দন রায় এতক্ষণ নীরবেই সমস্ত বাদানুবাদ শুনিতেছিলেন, আর সহিতে পারিলেননা, বলিয়া উঠিলেন, এই যদি সত্য হয় ফকির সাহেব, ত নিজের বাপের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে অত্যাচারীকে বাঁচাবার কি প্রয়োজন হয়েছিল ? তার অসুখ ত ওঁর কি ? অসুখে সেবা করার জন্যে ত বীজ-গাঁয়ের জমিদার পাল্‌কি পাঠিয়ে নিয়ে যায়নি ? মোট কথা আমরা ওকে রাখব না—আমরা ভেতরের ব্যাপার জানি। তা ছাড়া, ওর যদি কিছু বলবার থাকে ওকেই বল্‌তে দিন ! আপনি মুসলমান, বিদেশী, আপনার ত হিন্দুধর্ম্মের মাঝখানে পড়ে মধ্যস্থ হবার দরকার নেই !

তাঁহার কথার ঝাঁজ এবং তীক্ষ্ণতা কিছুক্ষণ অবধি যেন ঘর ভরিয়া রি-রি করিয়া বাজিতে লাগিল। ব্যারিষ্টার সাহেব নিজেও কেমন এক-প্রকার অস্বচ্ছন্দ এবং অপ্রতিভ হইয়া উঠিলেন, এবং বাক্যহীনা ভৈরবীর নিস্তব্ধ বক্ষঃকুহরেও কি একটা উত্তর বাহিরে আসিবার জন্য বারবার উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে লাগিল। ইহারই চিহ্ন ফকির সাহেব ষোড়শীর মুখের উপরে চক্ষের পলকে অনুভব করিয়া শুধু একটুখানি হাসিলেন, তার পরে জনার্দ্দন রায়কে লক্ষ্য করিয়া হাসিমুখে বলিলেন, রায় মশায়, অনেক দিনের কথা হ'ল, আপনার হয় ত মনে নেই ;—মন্দিরের দক্ষিণে ওই যে বুড়ো নিম গাছটা, তারই তলায় তখন থাকি। ষোড়শী তখন এতটুকু মেয়ে, তখন থেকেই মা বলে ডাকি,—মুসলমান হয়েও যে ভুলটা করে ফেলেচি সেটা আজ আমাকে মাপ করতে হবে। সেই মায়ের এত বড় বিপদে কি না এসে থাকতে পারি ? মা জিনিসটা ত তুচ্ছ নয় ?

তা' না হলে আজই সকালে যখন ওঁরই মুখ থেকে ওঁর মায়ের লজ্জার কাহিনী টেনে বার করতে চেয়েছিলেন, তখন আপনার নিজের ওই মা'টির কাছে ধমক্ খেয়ে অমন বিহ্বল ব্যাকুল হতে আপনাকে হোতোনা। এই বলিয়া ফকির দ্বারসংলগ্ন মূর্ত্তিবৎ স্থির হৈমবতীকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া দিলেন।

হতবুদ্ধি জনার্দ্দন হঠাৎ উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া কহিলেন, ও সব বাজে কথা।

ফকির তেম্নি হাসিমুখে বলিলেন, পাকা বীজও পাথরের ওপরে পড়ে বাজে হয়ে যায়, আমার এতটা বয়সে সে আমি জানতুম। আমি কাজের কথাও বল্‌চি। ওই মহাপাপিষ্ঠ জমিদারটাকে কেন যে মা আমার বাঁচাতে গেলেন সে আমিও জানিনে,—জিজ্ঞেসা করেও জবাব পাইনি। আমার বিশ্বাস, কারণ ছিল,—আপনাদের বিশ্বাস সেই হেতুটা মন্দ। এখানে মাতঙ্গিনী ভৈরবীর কথাটা তুলতে পারতুম, কিন্তু একজনের ভাল করবার জন্যেও অন্যের গ্লানি করা আমাদের ধর্ম্মে নিষেধ, তাই আমি সে নজির দেবনা। কিন্তু আপনাকে আমার অনেক কথা বলবার আছে রায় মশায়। এ যদি কেবল তারাদাসের সঙ্গেই হোতো, হয় ত আমি মাঝে পড়তে যেতামনা,—ও বেচারা তার বুদ্ধি এবং সাধ্যমত কর্ত্তব্য করবার চেষ্টা করেচে,—কিন্তু আপনারা, বিশেষ করে আপনি নিজে কোমর বেঁধে দাঁড়িয়েছেন কিসের জন্যে শুনি? ষোড়শী ত একা নয়, আরও অনেক মেয়ে আছে। গ্রামের বুকের মধ্যে বসে লোকটা যখন রাত্রির পর রাত্রি মানুষের মান ইজ্জৎ অপহরণ করছিল, তখন কোথায় ছিলেন শিরোমণি, কোথায় ছিলেন জনার্দ্দন রায়? সে যখন গরীবের সর্ব্বস্ব শোষণ করে পাঁচ হাজার টাকা আদায় করে নিয়ে গেল, তার কতখানি বুকের রক্ত আপনি তাদের জমি-জমা, বাড়ী ঘর-দ্বার বাঁধা রেখে যুগিয়েছিলেন শুনি? কিন্তু

থাক্ রায়মশায়, আপনার মেয়ে-জামাই দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁদের চোখের সমুখে আর আপনার মহা পাপের ভরা উন্মুক্ত করে ধরবনা।

এই বলিয়া সেই মুসলমান ফকির নীরব হইলেন, কিন্তু তাঁহার নিদারুণ অভিযোগের শেষ বাক্যটা যেন শেষ হইয়াও নিঃশেষ হইলনা। কাহারও মুখে কথা নাই, সমস্ত ঘরটা স্তব্ধ হইয়া রহিল, কেবল একটা তীব্র কণ্ঠের রেস যেন চারিদিকের প্রাচীর হইতে বারংবার প্রতিহত হইয়া কেবল ধিক! ধিক! করিতে লাগিল।

হৈম কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাত মাত্র করিলনা ; নীরবে, নতমুখে ধীরে ধীরে অন্যত্র সরিয়া গেল, এবং ব্যারিষ্টার সাহেব সেইখানে তাঁহার চৌকির উপর স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

ফকির ভৈরবীকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, মা, চল আমরা যাই। এই বলিয়া তিনি আর দ্বিতীয় কথা না বলিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন। প্রাঙ্গণের বাহিরে আসিয়া দেখিলেন সদর দরজার এক-পাশে দাঁড়াইয়া হৈম। তাহার দুই চক্ষু ছল্‌ছল্ করিতেছে ; সেই অশ্রুসজল দৃষ্টি ফকিরের মুখের প্রতি তুলিয়া কহিল, বাবা, আমার স্বামীকে আপনি মাপ করুন।

ফকির বিস্মিত হইয়া কহিলেন, কেন মা ?

হৈম তাহার উত্তর না দিয়া কহিল, আমার স্বামীকে নিয়ে যদি আপনার আশ্রমে যাই আপনি কি দেখা করবেন ?

এবার ফকির হাসিলেন ; তার পরে স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, কোরব নই কি মা ! তোমাদের দুজনের নিমন্ত্রণ রইল, সময় পেলে যেয়ো।

৯

মন্দির সংক্রান্ত গোলযোগটা যে ওখানেই মিটিয়া শেষ হইয়া গেলনা ষোড়শী তাহা ভাল করিয়াই জানিত ; কিন্তু, বিপত্তি যে দিক দিয়া তাহাকে পুনশ্চ আক্রমণ করিল তাহা সম্পূর্ণ অভাবনীয়। এখানে থাকিলে ফকির সাহেব মাঝে মাঝে এমন আসিতেন বটে, কিন্তু মাত্র কাল সন্ধ্যাকালে তিনি গিয়াছেন, মাঝে একটি দিন কেবল গিয়াছে, আবার আজই প্রত্যূষে আসিয়া উপস্থিত হইবেন এরূপ তাঁহার কোনদিন নিয়ম নয়। ষোড়শী সেইমাত্র স্নান করিয়া আসিয়া নিত্যক্রিয়াগুলা সারিয়া লইতে ঘরে ঢুকিতেছিল, অসময়ে হঠাৎ তাঁহাকে দেখিয়া চিন্তিত হইল। তাড়াতাড়ি প্রণাম করিয়া একটা আসন পাতিয়া দিয়া উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, এত সকালে যে ?

তিনি উপবেশন করিয়া একটু হাসির চেষ্টা করিয়া কহিলেন, ফকির মানুষ, সংসারে সুখ-দুঃখের ধার বড় ধারিনে মা, তবুও কাল রাত্রিটায় ভাল করে ঘুমোতে পারিনি ষোড়শী, দেহ ধারণের এম্নি বিড়ম্বনা। কবে যে এটা মাটির তলায় যাবে !

ষোড়শী শারীরিক পীড়ার কথাই মনে করিয়া কহিল, আপনার কি কোন অসুখ করেচে ?

ফকির ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, না, শরীর আমার ভালই আছে। কাল বিকালে এঁরা সকলেই আমার কুটীরে পায়ের ধুলো দিয়েছিলেন, তুমি জামাই বাবু-সাহেবও ছিলেন, এককড়িও ছিল। তাকে চিনি এই যা,— নইলে সে অনেক কথাই বল্‌লে। তবুও দু-একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেস না করেও থাক্‌তে পারলাম না, মা !

ষোড়শী কহিল, বলুন ?

ফকির বলিলেন, দেখ মা, আমি মুসলমান, তোমাদের দেব-দেবীর সম্বন্ধে আমার কৌতূহল থাকা উচিতও নয়, নেইও—কিন্তু, তোমাকে আমি মা বলে ডাকি ; তুমি কি জানিয়েচ স্বহস্তে আর কখনো চণ্ডীর পূজা করতে পারবেনা ?

ষোড়শী ঘাড় নাড়িয়া জানাইল এ কথা সত্য।

ফকির বলিলেন, কিন্তু এতকাল ত তোমার সে বাধা ছিলনা। ইহার উত্তরে ষোড়শী যখন মৌন হইয়াই রহিল, তখন তিনি কহিলেন, যাঁরা তোমাকে চান্‌না, তাঁরা যদি তোমার এই নূতন আচরণটা মন্দ বলেই গ্রহণ করেন তার ত কোন জবাব দেওয়া যায়না ষোড়শী ?

ইহারও কোনরূপ সদুত্তর দিবার চেষ্টা না করিয়া ষোড়শী যখন তেম্‌নি নীরব হইয়াই রহিল, তখন ফকিরের মুখও অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া উঠিল ; তিনি নিজেও কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া কহিলেন, এর কারণ বল্‌বার হলে তুমি আমাকে নিশ্চয়ই বল্‌তে। এ ছাড়া এককড়ি আরও একটা কথা বল্‌লে। সে বল্‌লে, জমিদার বাবু ভারি আশা করেছিলেন, তুমি তাঁর সঙ্গে যাবে। এমন কি আর একটা পাল্‌কি আনিয়ে যাই-যাই করেও তাঁর শেষ পর্য্যন্ত ভরসা ছিল হয় ত তুমি ফিরে আস্‌বে।

এবার ষোড়শী কথা কহিল, বলিল, তাঁরা আশা-ভরসার জন্যেও কি আমাকে দায়ী হতে হবে ?

ফকির তৎক্ষণাৎ মাথা নাড়িয়া কহিলেন, নিশ্চয় না, নিশ্চয় না। কিন্তু কথাটা শুন্‌তেও না কি বিশ্রী তাই উল্লেখ কোরলাম। আচ্ছা মা, যে ব্যাপারটায় সকল কুৎসিত কথার সৃষ্টি তার যথার্থ হেতুটা কি তুমি

আমাকেও বল্‌তে পারোনা? ও লোকটাকে যে তুমি কেন এমন কোরে বাঁচিয়ে দিলে এর কোন মীমাংসাই ত খুঁজে পাইনে ষোড়শী?

ষোড়শীর প্রথমে মনে হইল এ প্রশ্নেরও সে কোন উত্তর দিবেনা, কিন্তু বৃদ্ধের উদ্বিগ্ন মুখের স্নেহ-করুণ চোখ দুটির প্রতি চাহিয়া সে চুপ করিয়া থাকিতে পারিলনা, কহিল, ফকির সাহেব, ওই পীড়িত লোকটিকে জেলে পাঠানোই কি উচিত হোতো?

ফকির বিস্মিত হইলেন, মনে মনে বোধ করি বা একটু বিরক্তও হইলেন, বলিলেন, সে বিবেচনার ভার ত তোমার নয় মা, সে রাজার। তাই তাঁর জেলেও হাঁসপাতাল আছে, পীড়িত অপরাধীরও তিনি চিকিৎসা করান। কিন্তু এই যদি হয়ে থাকে তুমি অন্যায় করেছ বল্‌তে হবে।

ষোড়শী তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল, ফকির বলিলেন, যা' হবার হয়ে গেছে, কিন্তু ভবিষ্যতে এ ত্রুটি শুধরে নিতে হবে।

ষোড়শী তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, তার অর্থ?

ফকির বলিলেন, ওই লোকটার অপরাধ ও অত্যাচারের অন্ত নেই, এ তো তুমি জানো। তার শাস্তি হওয়া উচিত।

এবার ষোড়শী বহুক্ষণ পর্য্যন্ত নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, তারপরে মাথা নাড়িয়া আস্তে আস্তে বলিল, আমি সমস্ত জানি। তাঁকে শাস্তি দেওয়াই হয় ত আপনাদের উচিত, কিন্তু আমার কথা কাউকে বল্‌বার নয়,—তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে আমি কোনদিন পারবনা।

ফকির কহিলেন, ব্যাপার কি ষোড়শী?

ষোড়শী অধোমুখে স্তব্ধ হইয়া রহিল, এবং বহুক্ষণ পর্য্যন্ত কাহারও মুখ দিয়া কোন বাক্যই বাহির হইলনা। দাসী সংসারের কাজ করিতে

আসিতেছিল, দ্বারের কাছে তাহাকে দেখিতে পাইয়া ফকির আপনাকে সম্বরণ করিয়া লইয়া মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, এখন তা হলে আমি চল্‌লাম।

ষোড়শী কেবল হেঁট হইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিল, তিনি ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন।

তাঁহার প্রশান্ত মুখের গম্ভীর বিষণ্ণতাই শুধু যে কেবল ষোড়শীর সমস্ত দিন সকল কাজ-কর্ম্মের মধ্যেই যখন-তখন মনে হইতে লাগিল তাই নয়, যে অনুচ্চারিত বাক্য তিনি সহসা দমন করিয়া লইয়া নীরবে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন, তাহাও নানা আকারে নানা ছন্দে তাহার কানে বাজিতে লাগিল। সে যেন স্পষ্ট দেখিতে লাগিল এই সাধু ব্যক্তি যে শ্রদ্ধা, যে স্নেহ এতদিন তাহার প্রতি ন্যস্ত রাখিয়াছিলেন ঠিক কিছু না জানিয়াও আজ যেন তাহাকে খর্ব্ব করিয়া লইয়া গেলেন। এই ক্ষতি যে কত বড় তাহার পরিমাণ সে নিজে ছাড়া আর কেহই অধিক জানিতনা। কিন্তু তথাপি ইহাকে ফিরিয়া পাইবারও কোন পন্থা তাহার চোখে পড়িলনা। তাহার বাল্য ইতিহাস কাহারও কাছে ব্যক্ত করা চলেনা ;— এমন কি এই ফকিরের কাছেও না। কারণ ইহাতে যে সকল পুরাতন কাহিনী উঠিয়া পড়িবে তাহা মেয়ের পক্ষে যত বড় লজ্জার কথাই হোক, তাহার যে মা আজ পরলোকে তাঁহাকেই সমস্ত পৃথিবীর সম্মুখে একেবারে পথের ধূলায় টানিয়া আনা হইবে। এবং এইখানেই ইহার শেষ নয়। স্বামীস্পর্শ ভৈরবীর একান্ত নিষিদ্ধ। কত যুগ হইতে এই নিষ্ঠুর অনুশাসন ইহাদিগকে অঙ্গীকার করিয়া আসিতে হইয়াছে। সুতরাং ভালমন্দ যাই হোক, জীবানন্দের শয্যাপ্রান্তে বসিয়া একটা রাত্রির জন্যও তাহাকে যে-হাত দিয়া তাঁহার সেবা করিতে হইয়াছে সেই হাত দিয়া আর যে দেবীর সেবা করা চলিবেনা তাহা নিশ্চিত, অথচ,

এইখানে এই দেবীর প্রাঙ্গণতলেই তারাদাস যখন তাহাকে অজ্ঞাত-কুলশীল একজনের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিল তখন সে কোন কথা, কোন আপত্তিই করে নাই ; এবং, সমস্ত জানিয়াও যে সে নিঃসঙ্কোচে এতকাল ভৈরবীর কার্য্য করিয়া আসিয়াছে, ইহার জবাবদিহী আজ যদি সমস্ত ক্রুদ্ধ হিন্দু সমাজের কাছে করিতে হয়, ত সে যে কি হইবে সে তাহার চিন্তাতীত। আবার এ সকল ত গেল কেবল একটা দিকের কথা, কিন্তু যে দিকটা একেবারেই তাহার আয়ত্তাতীত তথায় কি যে হইবে সে তাহার কি জানে? যে জীবানন্দ একদিন তাহাদের বিবাহটাকে কেবল পরিহাস করিয়া গিয়াছিল, সে যদি আজ সমস্ত ইতিহাসটাকে নিছক গল্প বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দেয়, ত তাহাকে সত্য বলিয়া সপ্রমাণ করিতে সে নিজে ছাড়া আর দ্বিতীয় ব্যক্তি জীবিত নাই।

গৃহস্থালী সম্বন্ধে রাণীর মায়ের কি দুই-একটা কথার উত্তরে ষোড়শী কি যে জবাব দিল তাহার ঠিকানা নাই। মন্দিরের পুরোহিত কি একটা বিশেষ আদেশ গ্রহণ করিতে আসিয়া অন্যমনস্ক ভৈরবীর কাছে কি যে হুকুম পাইল তাহা ভাল বুঝিতেই পারিলনা। নিত্য নিয়মিত পূজা আহ্নিকে বসিয়া আজ ষোড়শী কোন মতেই মনস্থির করিতে পারিলনা, অথচ, যে জন্য তাহার সমস্ত চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত এবং চঞ্চল হইয়া রহিল তাহার যথার্থ রূপটাও তাহাকে ধরা দিলনা,—কেবল মাত্র কতকগুলা অস্ফুট অনুচ্চারিত বাক্যই সমস্ত সকালটা একটা অর্থহীন প্রলাপে তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিল। রান্নার উদ্যোগ আয়োজন পড়িয়া রহিল, সে রান্নাঘরে প্রবেশ করিলনা,—এ সকল তাহার ভালই লাগিলনা। এমনি করিয়া সমস্ত দিনটা যখন কোথা দিয়া কি ভাবে কাটিয়া গেল, এক

এঁকার ঘোলাটে মেঘলায় শীতের দিনের অপরাহ্ন যখন অসময়েই গাঢ়তর হইয়া আসিতে লাগিল, তখন সে একাকী ঘরের মধ্যে আর থাকিতে না পারিয়া হঠাৎ বাহির হইয়া আসিল, এবং ফকির সাহেবকে স্মরণ করিয়া বারুইয়ের পরপারে তাঁহারই আশ্রমের উদ্দেশে যাত্রা করিল। এমন অনেকদিন হইয়াছে সে একটুখানি ঘুরিয়া তাহার অনুগত বিপিন কিম্বা দিগম্বরকে তাহাদের বাটির সম্মুখ হইতে ডাক দিয়া সঙ্গে লইয়া গিয়াছে; কিন্তু, আজ পাড়ার পথ দিয়া তাহাদিগকে ডাকিতে যাইতে তাহার সাহসও হইলনা প্রবৃত্তিও হইলনা,—একাকীই মাঠের পথ ধরিয়া নদীর অভিমুখে দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া গেল। তাহার মনেও পড়িলনা যে ঘরগুলা খোলাই পড়িয়া রহিল।

এই পথটা বেশী নহে, বোধ করি অর্দ্ধক্রোশের মধ্যেই, এবং নদীতেও এমন জল এ সময়ে ছিলনা যাহা স্বচ্ছন্দে হাঁটিয়া পার হওয়া না যায়, সুতরাং অভ্যাস বশতঃ এদিকে চিন্তিত হইবার কিছুই ছিলনা। কেবল ফিরিয়া আসার কথাটাই একবার মনে হইল, অথচ, ভিতরে ভিতরে বোধ হয় তাহার ভরসা ছিল যদি সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া অন্ধকার হইয়াই আসে ত, ফকির সাহেব কিছুতেই তাহাকে নিঃসঙ্গ ছাড়িয়া দিবেন-না, কিছু একটা উপায় করিবেনই। মনের এই অবস্থাই তাহাকে জনহীন পথ ও ততোধিক নির্জ্জন বালুময় নদীর উপকূলে আসন্ন সন্ধ্যা জানিয়াও দ্বিধামাত্র করিতে দিলনা, বারুইয়ের পরপারে সোজা সেই বিপুল বটবৃক্ষতলে সাধুর আশ্রমে আসিয়া উপনীত করিল। এবং প্রথমেই যাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়া একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল, তিনি ফকির সাহেব নহেন, রায় মহাশয়ের জামাতা ব্যারিষ্টার সাহেব। আজ তাঁহার পরিধানে কোট প্যাণ্টের পরিবর্ত্তে সাধারণ ভদ্রবাঙালীর

ধুতি চাদর প্রভৃতি ছিল, তিনিও ঠিক ইহার জন্য প্রস্তুত ছিলেননা; কি করিবেন সহসা ভাবিয়া না পাইয়া বোধ হয় কেবলমাত্র অভ্যাসবশতঃই উঠিয়া দাঁড়াইয়া কোনমতে একটা নমস্কার করিলেন।

ভৈরবী চারিদিকে একবার চাহিয়া লইয়া মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, ইনি কোথায়?

বসু সাহেব কহিলেন, আমারও জিজ্ঞাস্য তাই। হয় ত কাছাকাছি কোথাও গেছেন মনে করে আমিও প্রায় ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করে আছি।

ভৈরবী মাথা নাড়িয়া আস্তে আস্তে বলিল, তিনি সন্ধ্যার সময় কোথাও থাকেননা. বোধ হয় এখুনি এসে পড়্বেন।

বসু সাহেব কহিলেন, এখানে থাক্‌লে তাই তাঁর নিয়ম বটে, আমিও শুনে এসেছি। কিন্তু সন্ধ্যা ত হ'ল। আকাশের গতিকও তেমন ভাল নয়, বলিয়া তিনি সম্মুখে মাঠের প্রান্তে দৃষ্টিপাত করিলেন। ষোড়শীও তাঁহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া সেইদিকে চাহিয়া নীরব হইল। পশ্চিমদিগন্তে তখন কালো কালো খণ্ড মেঘ ধীরে ধীরে জমা হইয়া উঠিতেছিল। এই নিস্তব্ধ জনহীন প্রান্তরে ছায়াচ্ছন্ন বৃক্ষতলের ঘনায়মান অন্ধকারে দাঁড়াইয়া উভয়ের কেহই কিছুক্ষণের জন্য কথা খুঁজিয়া পাইলেননা, অথচ এই বিসদৃশ অবস্থায় দুজনেই কেমন যেন সঙ্কুচিত হইয়া উঠিলেন। এবং বোধ হয় এই মৌনতার সঙ্কট হইতে অব্যাহতি লাভের জন্যই যেন বসু সাহেব হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, কাল আমি চলে যাচ্চি, শীঘ্র আর আসা হবে কি না জানিনে, কিন্তু ফকিরের সঙ্গে আর একবার দেখা না করে চলে যেতে হৈম আমাকে কিছুতেই দিলেনা,—তাই,—কিন্তু তিনি ত কোথাও চলে যান্‌নি? এই বলিয়া তিনি দুই একপদ অগ্রসর হইয়া গেলেন, এবং অনতিদূরবর্ত্তী কুটীরের সম্মুখে

আসিয়া গলা বাড়াইয়া ক্ষণকাল ঘরের মধ্যে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, ভাল দেখা যায়না, কিন্তু কোথাও কিছু আছে বলেও মনে হয়না। মুসলমান ফকিরেরা ধুনি জ্বালে কি না জানিনে, কিন্তু এই রকম কি একটা জল দিয়ে কে যেন নিবিয়ে দিয়ে গেছে বলে মনে হচ্চে। আপনি দেখুন দেখি, আমি আর ভেতরে যাবোনা। তা'হলে নিরর্থক অপেক্ষা করে কোন লাভ নেই। এই বলিয়া তিনি ষোড়শীর প্রতি চাহিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

কথাটা শুনিয়াই ষোড়শীর বুকের মধ্যে ধড়াস্ করিরা উঠিল, এবং তাঁহার থাকা না-থাকার পরীক্ষা না করিয়াই তাহার নিশ্চয় মনে হইল সংসারে তাহার একমাত্র শুভাকাঙ্ক্ষী আজ নিঃশব্দে চলিয়া গেছেন, এবং এই নীরব প্রস্থানের হেতু জগতে সে ছাড়া আর কেহ জানেনা। ষোড়শী যন্ত্রচালিতের ন্যায় সন্ন্যাসীর কুটীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মাঝখানে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কোথাও যে কিছু নাই, এই ছোট ঘরখানি আজ যে একেবারে একান্ত শূন্য, সে তাহার প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই চোখে পড়িয়াছিল, কিন্তু তবুও সে তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া আসিতে পারিলনা। তাহার বুকের মধ্যে কেবল এই কথাটাই অঙ্গারের ন্যায় জ্বলিতে লাগিল, তিনি যথার্থই দোষী জ্ঞানে তাহাকে ত্যাগ করিয়া গেছেন, এবং তাহার আভাস মাত্র দিবারও প্রয়োজন বোধ করেন নাই। সেইখানে পাষাণমূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চল দাঁড়াইয়া তাহার অনেক কথাই মনে হইতে লাগিল। ফকির যে তাহাকে কত ভালবাসিতেন, তাহা তাহার চেয়ে বেশি আর কে জানে? তথাপি, না জানিয়া যে তিনি অপরাধীর পক্ষ লইয়া বিবাদ করিয়াছেন, এই লজ্জা ও গ্লানি সেই সত্যাশ্রয়ী সন্ন্যাসীকে এমন করিয়া আজ স্থানত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছে, ইহা সে নিঃসংশয়ে অনুভব

করিল, এবং যে বেদনা লইয়া তিনি নীরবে বিদায় লইয়াছেন, ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতেও তাহার বিলম্ব হইলনা। অথচ, এ কথা জানাইবার অবকাশ যে তাহার কবে মিলিবে, কিম্বা কোন দিন মিলিবে কি না, তাহাও ভবিষ্যতের গর্ভে আজ সম্পূর্ণ লুক্কায়িত। এম্‌নি একই ভাবে তাহার অনেকক্ষণ কাটিল, এবং বোধ হয় আরও কিছুক্ষণ কাটিত, সহসা মুক্তদ্বার দিয়া ঘরের মধ্যে একটা দম্‌কা বাতাস অনুভব করিয়া তাহার চৈতন্য হইল, বাহিরে আর একজন হয়ত এখনও তাহার অপেক্ষা করিয়া আছেন। কিন্তু ইতিমধ্যে যে আকাশ এমন মেঘাচ্ছন্ন, অন্ধকার এত প্রগাঢ় হইয়া উঠিতে পারে এবং বাতাস প্রবল হইয়া ঝড় ও জলের সম্ভাবনা অবসন্ন হইয়া উঠিতে পারে, ইহা তাহার মনেও আসে নাই। বাহিরে আসিয়া দেখিল অনতিদূরে একটা শুষ্ক বৃক্ষকাণ্ডের উপর বসু সাহেব বসিয়া আছেন, তাঁহার শুভ্র পরিচ্ছদ ভিন্ন আর কিছুই প্রায় দেখা যায়না। তাঁহাকে এইভাবে বাস্তবিকই অপেক্ষা করিতে দেখিয়া ষোড়শী মনে মনে অতিশয় সঙ্কোচ বোধ করিল। সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, কৈ ফকির ত এখনো এলেননা, আর আস্‌বেন বলে কি আপনার আশা হয়?

ষোড়শী অতি মৃদুস্বরে উত্তর দিল, কি জানি,—বোধ হয় না-ও আস্‌তে পারেন।

বসু কহিলেন, ফকির সাহেবের জিনিষপত্র কি ছিল আমি জানিনে, কিন্তু তাঁর ঘরটি ত একেবারে খালি,—এমন হঠাৎ চলে যাওয়া কি আপনার সম্ভব মনে হয়?

ষোড়শী তেম্‌নি আস্তে আস্তে বলিল, একেবারে অসম্ভবও নয়। এম্‌নি সহসা তিনি মাঝে মাঝে কোথায় চলে যান।

আবার কতদিনে ফিরে আসেন ?

কিছুই ঠিক নেই। এবার ত প্রায় বছর তিনেক পরে ফিরে এসেছিলেন।

বসু কহিলেন, তা'হলে চলুন আমরা বাড়ী ফিরে যাই।

চলুন, বলিয়া ষোড়শী অগ্রসর হইতেই বসু কহিলেন, কিন্তু যাবার সুযোগ ত দেখ্‌চি ষোল আনাই হয়েছে। একে ত বালির ওপর পথের চিহ্ন-মাত্র নেই, তাতে অন্ধকার এম্‌নি যে নিজের হাত-পা পর্য্যন্ত দেখা যায়না।

ষোড়শী নীরবে ধীরে ধীরে চলিতে সুরু করিয়াছিল, কিছুই বলিলনা। বসু কহিলেন, হাওয়ার শব্দে বোঝা যাচ্ছেনা, কিন্তু বৃষ্টি পড়চে। গাছতলা পার হলেই ভিজ্‌তে হবে। এ কথাতেও ষোড়শী যখন কথা কহিলনা, তখন বসু কহিলেন, দেখুন, পথ-ঘাট আমি কিছুই চিনিনে, তা ছাড়া শুনেছি এ অঞ্চলে সাপ খোপের ভয়টাও খুব বেশি। এই ভয়ানক অন্ধকারে কি—

ষোড়শী থামিলনা, চলিতে চলিতেই কহিল, পথ আমি চিনি। আপনি আমার ঠিক পিছনে পিছনে আসুন।

বসু সাহেব হাসিলেন, কহিলেন, অর্থাৎ সর্পাঘাতের দুর্ঘটনা ঘটে ত আপনার উপর দিয়েই যাক্। তা' বটে। আপনি সন্ন্যাসিনী, এ প্রস্তাব আপনি করতেও পারেন, কিন্তু আমার মুস্কিল এই যে আমিও পুরুষমানুষ। অবশ্য, এ কথা আপনি কাউকে বল্‌বেননা জানি, এমন কি হৈমকেও না,—কিন্তু তবুও ওটা ঠিক পেরে উঠ্‌বনা।

এবার ষোড়শী থমকিয়া দাঁড়াইল। অন্ধকারে দেখা গেলনা বটে, কিন্তু সাহেবের কথা শুনিয়া তাহারও মুখে হাসি ফুটিল। মুহূর্ত্তকাল মৌন থাকিয়া কহিল, আপনি তা হলে কি রকম করতে বলেন ?

সাহেব কহিলেন, বলা শক্ত। কিন্তু পরামর্শ স্থির হবার পূর্ব্বেই ভিজে উঠ্‌তে হবে। বটপত্রে আর বৃষ্টি মান্‌চেনা।

কথাটা সত্য। কারণ উপরের জলধারা ফোঁটায় ফোঁটায় নীচে নামিতে সুরু করিয়াছিল। ষোড়শী কহিল, আপনি বরঞ্চ ওই ঘরটার মধ্যে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, আমি হৈমকে খবর দিয়ে আলো এবং লোক পাঠানোর ব্যবস্থা করে দিইগে। আমার অভ্যাস আছে, এ জলে বিশেষ ক্ষতি হবেনা।

সাহেব কহিলেন, অত্যন্ত মনোরম প্রস্তাব। কারণ, বাঙালী সাহেব হয়ে উঠ্‌লে যা' হন সে আপনি বেশ জানেন দেখ্‌চি। কিন্তু, আমার সম্বন্ধে আজও একটুখানি ত্রুটি রয়ে গেছে। হৈম মাঝে থাকায় আমার ভেতরের সঙ্গে বাইরের এখনো সম্পূর্ণ একাকার হয়ে উঠ্‌তে পারেনি। এ প্রস্তাবও অচল,—সুতরাং চলাই স্থির। চলুন।

বৃক্ষতল ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া দুজনেই বুঝিলেন অগ্রসর হওয়া প্রায় অসম্ভব। কারণ বায়ুবেগে বৃষ্টিধারাই যে কেবল গায়ে সূচের মত বিঁধিতেছে তাই নয়, ইতিপূর্ব্বে যে শুষ্ক বালুকারাশি আকাশ ব্যাপ্ত করিয়া শূন্যে উড়িয়াছে জলধারায় ধুইয়া মাটিতে না পড়া পর্য্যন্ত চোখ চাহিয়া পথ চলা দুঃসাধ্য। নিঃশব্দে চলিতে চলিতে ষোড়শী হঠাৎ পিছনে শব্দ শুনিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আপনার লাগ্‌ল না কি?

বসু সাহেব কোনমতে সাম্‌লাইয়া লইয়া সোজা হইয়া কহিলেন, হাঁ, কিন্তু প্রত্যাশার অতিরিক্ত কিছু নয়। চস্‌মা শুদ্ধ চোখ আমার চারটে বটে কিন্তু দৃষ্টিশক্তিটা চারভাগের একভাগ থাকলেও বাঁচ্‌তাম। চলুন।

ষোড়শী চলিলনা, একমুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি সত্যই কি ভাল দেখ্‌তে পাচ্চেননা?

বসু কহিলেন, সত্যি। তারপরে ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, বিস্তর ইংরাজী বই মুখস্থ করে সাহেব হতে হয়েছে,—তার দক্ষিণাটাও তারা বেশ বড়

করেই নিয়েছে। কিন্তু তাই বলে আর দাঁড়িয়ে ভেজাবেননা—এগোন্। হু'চক্ষু বুজে চল্‌লে যতটা দেখতে পাওয়া যায়, আমি ততটা দেখ্‌তে পাবই, এ আমি আপনাকে নিশ্চয় ভরসা দিচ্চি!

ষোড়শীর কণ্ঠস্বর করুণায় কোমল হইয়া উঠিল, কহিল, তা'হলে নদীটা পার হ'তে ত আপনার ভারি কষ্ট হবে।

বসু বলিলেন, তা' ঠিক জানিনে! তবে নদী পার হবার পূর্ব্বেও বিশেষ আরাম পাচ্চিনে। কিন্তু তাই বলে এই মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাক্‌লেও সমস্যার মীমাংসা হবেনা।

ষোড়শী এক পা অগ্রসর হইয়া আসিয়া কহিল, আপনি আমার হাত ধরে আস্তে আস্তে আসুন, এই বলিয়া সে তাহার হাতখানি বাড়াইয়া দিল।

এই অপরিচিতা নারীর আচরণ ও সাহস দেখিয়া বাক্‌পটু ব্যারিষ্টার ক্ষণকালের জন্য বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া গেলেন। কিন্তু সে ওই ক্ষণকাল মাত্রই। তারপরে সেই প্রসারিত হাতখানি নিঃশব্দ ব্যগ্রতায় আশ্রয় করিয়া আস্তে আস্তে কহিলেন, চলুন। এইবার আমি সত্যি সত্যিই হু-চক্ষু বুজে চল্‌তে পার্‌ব।

ষোড়শী ইহার কোন উত্তর দিলনা। উভয়ে ধীরে ধীরে কিছুদূর অগ্রসর হইলে—বসু-সাহেব অকস্মাৎ বলিয়া উঠিলেন, আপনার প্রতি আমি সেদিন ভদ্র ব্যবহার করিনি। তার জন্যে ক্ষমা চাইচি, আপনি আমাকে মাপ কর্‌বেন।

ষোড়শী এ কথার উত্তরেও কিছুই বলিলনা, তেমনি নিঃশব্দে ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। বসু কাহলেন, আপনি হৈমর ছেলে-বেলার বন্ধু। আমার সেদিনের আচরণ যাই হোক্, আমাকেও ঠিক শত্রু বলেই মনে রাখ্‌বেননা। বলিয়া তাহার হাতের উপর একটুখানি চাপ দিলেন।

ষোড়শী একেবারেই নির্ব্বাক্। বসু সাহেব নিজেও কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, এঁরা যে আপনাকে সহজে ছাড়বেন তা মনে হয়না। খুব সম্ভব মাম্‌লা-মকদ্দমাও হবে। ফকির-সাহেব হয় ত সত্যিই চলে গেছেন, আমিও বোধ হয় থাক্‌বনা—

ষোড়শী কিছুই বলিলনা। তিনি নিজেও একটু মৌন থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, আপনি নিজে আর দেবীর পূজো করবেননা বলেছেন, এ কি রাগ করে?

ষোড়শী এবার জবাব দিল, কহিল, না।

তা'হলে এর কি সত্যিই কোন কারণ আছে?

ষোড়শী এ প্রশ্নের উত্তর দিলনা, কিন্তু কথা কহিল, বলিল, আমরা এবার নদীতে এসেচি, আপনাকে একটু সাবধানে নাম্‌তে হবে।

ইহার পরে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কোন কথাই হইলনা। ষোড়শী সযত্নে সাবধানে তাঁহাকে জল পার করিয়া লইয়া গেল। আসিবার সময় সাহেব জুতা খুলিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু এই দুর্ভেদ্য অন্ধকারে আর সাহস করিলেননা,যেমন ছিলেন,তেম্‌নিই গিয়া পরপারে উঠিলেন। একটা তৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, একটা মস্ত ফাঁড়া কেটে গেল, বাঁচ্‌লাম।

এই মস্ত ফাঁড়া কাটাইয়া দিয়া সাহেব অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত হইয়া কহিলেন, পূজারী একজন আছেন বটে, কিন্তু পূজাটা আঁপনারও একটা কাজের মধ্যেই। অথচ, সে প্রশ্নটা আপনি চাপা দিলেন। এদিকে যে ভীষণ দুর্দ্দান্ত শয়তান জমিদারটাকে বাঁচানো আপনার কর্ত্তব্যের অঙ্গ ছিলনা, তাঁকে যে উপায়ে বাঁচালেন তা কেবল আশ্চর্য্য নয় অদ্ভুত। এই দুটো ব্যাপারই এমন দুর্বোধ্য যে গ্রামের লোক বুঝলে না বলে অভিমান করা চলেনা।

ষোড়শী তেম্‌নি মৃদু-স্বরেই এ অনুযোগের জবাব দিয়া কহিল, অভিমান আমি করিনি।

বসু বলিলেন, করেন নি? সেও অদ্ভুত। আপনার বাবার আচরণ আবার আরও অদ্ভুত। হৈম বলে—কিন্তু হৈমর কথা এখন থাক্। কিন্তু আমি বলি, এদের সমস্ত অপরাধটা কেন বুঝিয়েই বলুননা? তাতে কতটা কাজ হবে আমি জানিনে,—কিন্তু, সে যাই হোক্, নারীর সুনামটা ত অবহেলার বস্তু নয়! এই বলিয়া তিনি কিছুক্ষণ উত্তরের প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন; কিন্তু ষোড়শী কোন প্রত্যুত্তরই যখন দিলনা, তখন একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, বুঝা গেল এই সুনাম দুর্নাম সম্বন্ধে সাধারণ রমণীর মত আপনার বিশেষ কোন মাথাব্যথা নেই। আর সাধারণও ত আপনি ন'ন! তা' ছাড়া চুপ করে থাকার এই জিদ—এও অদ্ভুত। বাস্তবিক, আপনার সকলই অদ্ভুত। এই বলিয়া নিজে একটুখানি চুপ করিয়া কহিলেন, সেদিন একটিবার মাত্র আপনাকে দেখেচি, আর আজ হাত ধরে এগিয়ে চলেচি। যাকে আশ্রয় করেচি, তিনিও আমার কাছে যেমন অন্ধকার, যার মধ্যে দিয়ে চলেচি সেও তেমনি অন্ধকার। তবুও নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে যাত্রা করার কোন বাধা হয়নি। আপনাকে ভক্তি না করে থাক্‌বার যো নেই।

এই বলিয়া আবার কিছুক্ষণ কোন একটা কথার প্রত্যাশায় থাকিয়া, হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, আচ্ছা, আপনি ত সন্ন্যাসিনী। শ্বশুরমশাই আমার যাই কেন করুননা, বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে এই সব মামলা-মকদ্দমা করায় আপনার গরজ কি?

ষোড়শী এতক্ষণে কথা কহিল, বলিল, কোন গরজই নেই।

তা'হলে?

ষোড়শী কহিল, আপনি কোন আশঙ্কা করবেননা ; নিরুপায় দুর্ব্বল নারীর ভাগ্যে চিরদিন যা' হয়ে আস্‌চে এ ক্ষেত্রেও তার কোন ব্যতিক্রম হবেনা।

কথার খোঁচাটা বসু-সাহেবের বিঁধিল, কিন্তু তিনি প্রতিবাদও করিলেননা, প্রতিঘাতও করিলেননা। তার পরে উভয়েই নিঃশব্দে চলিতে লাগিলেন। ঝড় এবং জল কোনটাই থামে নাই বটে, কিন্তু গ্রামের মধ্যে ঢুকিয়া তাহার প্রকোপ মন্দীভূত হইল, এবং পথের বাঁকটা ঘুরিতেই অদূরে সনাতন মাইতির কুটীরের আলোক দু-জনেরই চোখে পড়িল। আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া ষোড়শী থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, তেমন অন্ধকার আর নেই, আপনি এই পথ ধরে সোজা গেলেই রায়মশায়ের দোর-গোড়ায় গিয়ে পৌঁছুবেন।

আর আপনি ?

আমার পথ এই বাঁ দিকের বাগানের ভেতর দিয়ে।

বসু হাত ছাড়িলেননা, কহিলেন, পরের মুখে শুনেচি আপনি অতিশয় শিক্ষিতা, আমি নিজে কতটুকু জেনেচি সে উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন ; কিন্তু এর বেশি জান্‌বার অবকাশ আর যদি কখনো ভাগ্যে নাও ঘটে, আজকের এই অভিযানের স্মৃতিটা আমার চিরদিন বড় শ্রদ্ধার সঙ্গেই মনে থাক্‌বে।

ষোড়শী মৃদু হাসিয়া কহিল, কিন্তু, কেবলমাত্র এইটুকুই যদি কেউ বাহিরে থেকে দেখে থাকে, তার সঙ্গে আপনার মতের মিল হবেনা।

সাহেব মনে মনে চমকিয়া গেলেন। তারপরে সেই ধরা-হাতটির উপর আর একটুখানি চাপ দিয়া ছাড়িয়া দিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, না। বানিয়ে-বলা গল্পের মত শোনাবে। তাই একে ঘুলিয়ে নোঙ্‌রা করে না তুলে বরঞ্চ চুপ করে থাকাই ভাল। এই না ?

ষোড়শী ইহার জবাব না দিয়া কহিল, আমার জন্যে অপেক্ষা করে অনেক ভিজেছেন, অনেক দুঃখ পেয়েছেন,—আর না। আমিও চল্‌লুম।

বসু কহিলেন, এই কথাটাই হয় ত আমাকে অনেক দিন ধরে ভাবতে হবে। কাল আমরা যাচ্চি,—হৈমকে কি কিছু বলে পাঠাবেননা?

ষোড়শী এক-মুহূর্ত্ত কি ভাবিয়া কহিল, না। কেবল তার ছেলেকে আশীর্ব্বাদ করেচি, যদি ইচ্ছে হয় এইটুকু জানাবেন। এই বলিয়াই সে আর কোন প্রশ্নোত্তরের অপেক্ষা না করিয়া অন্ধকার বন-পথ ধরিয়া নিমিষে অদৃশ্য হইয়া গেল।

সাহেব সেইখানে বিমূঢ়ের মত কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। একটা নমস্কার পর্য্যন্ত করা হইলনা,—যে ফকিরের জন্য এই, তাঁহার উদ্দেশে একটা নমস্কার পর্য্যন্ত জানানো হইলনা। তাহার পরে নির্দ্দিষ্ট পথ ধরিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন।

১০

বসু সাহেব যখন শ্বশুরবাটীতে আসিয়া প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহারই জন্য বাড়ীময় একটা উৎকণ্ঠার সাড়া পড়িয়া গেছে। ঘরে এবং বাহিরে যেখানে যত আস্ত এবং ভাঙ্গা লণ্ঠন ছিল সংগ্রহ হইয়াছে, এবং এই দুর্য্যোগের রাত্রে এগুলিকে কার্য্যোপযোগী করিয়া তুলিবার প্রচেষ্টায় বাড়ীসুদ্ধ সকলে গলদঘর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছে। চাকর-বাকর ও আত্মীয়-অনুগত লইয়া একটা অভিযানের দল তৈরি হইয়াছে এবং রায় মহাশয় নিজে সমস্ত তত্ত্বাবধান করিতেছেন। কাহারা কোন্ দিকে যাইবে, কোন্ পথ, কোন্ মাঠ, কোন্ বন-জঙ্গল অনুসন্ধান করিবে, বারংবার উপদেশ দিতেছেন; তাঁহার আচরণে ও কণ্ঠস্বরে কেবল উদ্বেগ নয়, আতঙ্ক প্রকাশ পাইয়াছে। এখনও প্রকাশ করিয়া কিছু বলেন নাই সত্য, কিন্তু যে ভয়টা তাঁহার মনের মধ্যে উকি মারিতেছে তাহা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। তিনি জানিতেন ষোড়শীর কয়েকজন একান্ত অনুগত ভূমিজ ও বাগ্দী প্রজা আছে। তাহারা যেমন উদ্ধত তেম্নি নিষ্ঠুর। ডাকাতি করে বলিয়া পুলিশের খাতায় নাম-ধাম পর্য্যন্ত লেখা আছে,—ইহারা এই অন্ধকার রাত্রে কোথাও একাকী পাইয়া যদি তাহাদের ভৈরবী-মায়ের প্রতি অবিচার স্মরণ করিয়া সহসা প্রতিহিংসায় উত্তেজিত হইয়া উঠে ত সেখানেও বিচারের আশা করা বৃথা। হৈম একপাশে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া সমস্তই দেখিতেছিল, পিতার আশঙ্কাও তাহার দৃষ্টি এড়ায় নাই কিন্তু, তখন পর্য্যন্ত সে ভিতরের আসল কথাটা জানিতনা। এইটাই আত্মপ্রকাশ করিল তাহার জননীর কথায়। তিনি হঠাৎ বাহিরে আসিয়া স্বামীকে কঠোর অনুযোগ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, সে জামাই মানুষ,

তাকে কেন তোমাদের ঝগড়ায় মধ্যস্থ মানা? যার পিছনে ডাকাতের দল রয়েছে তাকে করবে তোমরা জব্দ? যেখানে পাও আমার নির্ম্মলকে খুঁজে এনে দাও, নইলে যেখানে দুচক্ষু যায় এই অন্ধকারে আমি বেরিয়ে যাবো। এই বলিয়া তিনি কাঁদ কাঁদ হইয়া অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন, এবং কিছু-ক্ষণের জন্য কন্যা ও পিতা উভয়েই নির্বাক বিবর্ণ মুখে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

জনার্দ্দন রায় আত্মসম্বরণ করিয়া সান্ত্বনা ও সাহসসূচক কি একটা কথা হৈমকে বলিতে যাইতেছিলেন, ঠিক এমনি সময়ে জামাতা প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বাহিয়া জল ঝরিতেছে, জামা কাপড়-জুতা কাদামাখা;—শ্বশুরের মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল,—কিন্তু, পরক্ষণেই যে সাহেব-জামাইকে তিনি যথেষ্ট খাতির এবং ভয় করিতেন তাহাকেই আনন্দের উৎকট প্রাবল্যে যা মুখে আসিল তাই বলিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন।

সাহেব নিঃশব্দে উঠিয়া আসিয়া হাতের ভাঙ্গা ছড়িটা রাখিয়া দিলেন, এবং পায়ের জুতা হাত দিয়া টানিয়া ফেলিয়া গায়ের ভিজা জামাটা খুলিয়া ফেলার মধ্যে ছোট-বড়, উচ্চ-নীচ আত্মীয়-পর সকলে একযোগে ও নির্বি-শেষে প্রশ্ন করিতে লাগিল কি করিয়া এ দুরবস্থা ঘটিল এবং কোথায় ঘটিল?

রায় মহাশয় প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিলেন, আচ্ছা, সে সব পরে হবে, তুমি বাড়ীর ভেতরে যাও। মা হৈম, আর দাঁড়িয়ে থেকোনা একটু শুক্‌নো কাপড়-চোপড় দাওগে।

বাটীর মধ্যে শ্বশুর-শাশুড়ী ও সমবেত কুটুম্বিনীগণের প্রশ্নের উত্তরে নির্ম্মল জানাইল, সে ওপারে ফকির সাহেবের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিল, কিন্তু সাক্ষাৎ হয় নাই, তিনি আশ্রমে নাই।

ওপারের নামে একপ্রকার আতঙ্কসূচক অস্ফুট ধ্বনি উঠিল; রায় মহাশয় আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, তার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া! আমাকে বল্‌লে ত তাকে ডেকে পাঠাতে পারতাম। কিন্তু এই অন্ধকারে পথ চিন্‌লে কি করে?

নির্ম্মল কহিল, পথ চেনবার আমার দরকার হয়নি, হলে পারতাম না।

কিন্তু এলে কি করে?

একজন আমাকে হাত ধরে এনে বাড়ীর সাম্‌নে দিয়ে গেছেন।

চতুর্দ্দিকে প্রশ্ন উঠিল, কে? কে? কি নাম তার? নির্ম্মল একটুখানি স্থির থাকিয়া কহিল, কি জানি, নামটা জানাতে হয়ত তাঁর আপত্তি আছে।

রায় মহাশয় প্রতিবাদ করিয়া কহিলেন, আপত্তি? কখ্‌খনো না, আমাদের দেশের লোককে তুমি চেনোনা। কিন্তু যেই হোক্ তাকে খুসি করে দেওয়া চাই ত? এই বলিয়া চাকরটাকে তৎক্ষণাৎ ডাকিয়া হুকুম করিয়া দিলেন, অধর, চাটুর্য্যে যদি বাইরে থাকে, এখনি বলে দে কাল সকালেই খবর নিয়ে যেন বক্‌শিস দেওয়া হয়। পূরো টাকাই যেন তার হাতে পড়ে—কেটে যেন কিছু না রাখে। চাটুর্য্যেটা আবার যে কৃপণ! এই বলিয়া তিনি ঔদার্য্যের আবেগে প্রথমে গৃহিণী ও পরে কন্যা-জামাতার মুখের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিলেন।

রাত্রে আহারাদির পরে নিরালা ঘরের মধ্যে স্বামীকে একাকী পাইয়া হৈম কহিল, বাবা ত পুরস্কার ঘোষণা করে দিলেন, পূরো টাকাটা দেবার চেষ্টাও হয়ত কিছু হবে, কিন্তু ফল হবেনা।

নির্ম্মল কহিল, না, আসামী পাওয়া যাবেনা।

হৈম একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু তুমি সেই দয়ালু লোকটিকে কি পুরস্কার দিলে?

নির্ম্মল কহিল, দেওয়া জিনিসটা কি তুমি এতই সহজ মনে কর? ও কি কেবলমাত্র দাতার মর্জ্জির উপরেই নির্ভর করে?

তা'হলে দিতে পারোনি?

না, দেবার চেষ্টাও করিনি।

হৈম স্বামীর মুখের প্রতি একমুহূর্ত্ত চাহিয়া থাকিয়া কহিল, কিন্তু আমার উচিত। বাবা তাঁকে বার করতে পারবেননা, কিন্তু আমি পারব।

নির্ম্মল সন্দেহ প্রকাশ করিয়া কহিল, আমার মনে হয় তোমার বাবার মত তুমিও তাঁকে খুঁজে পাবেনা।

হৈম বলিল, যদি পাই ত আমাকেও কিছু পুরস্কার দিয়ো। কিন্তু আমি তাকে চিনেছি। কারণ তোমার মত অন্ধ মানুষকেও যে এই ভয়ানক অন্ধকারে নির্ব্বিঘ্নে নদী পার করে ঘরের সাম্‌নে রেখে যেতে পারে, অথচ, আত্মপ্রকাশ করেনা, তাকে চিন্‌তে পারা শক্ত নয়। তা'ছাড়া সন্ধ্যার আঁধারে গা ঢেকে আমিও একবার তাঁকে দেখ্‌তে গিয়েছিলাম! গিয়ে দেখি ঘর-দোর খোলা; তিনি নেই বটে, কিন্তু তারাদাস ঠাকুর সমস্ত দখল করে বসে আছেন। লুকিয়ে পালিয়ে এলাম। পথে একজন চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হল, সে বলে দিলে যোড়শীকে সে সোজা নদীর পথে যেতে দেখেচে। এখন বুঝ্‌লে, যে দয়ালু লোকটি তোমাকে দিয়ে গেছেন তাঁকে আমি চিনি। কিন্তু সত্যিসত্যিই কি একেবারে হাত ধরে রেখে গেছেন?

নির্ম্মল ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া মাথা নাড়িয়া কহিল, সত্যই তাই। যে মুহূর্ত্তে তিনি নিশ্চয় বুঝলেন আমি অন্ধের সমান, সেই মুহূর্ত্তেই নিঃসঙ্কোচে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বল্‌লেন, আমার হাত ধরে আসুন। কিন্তু পরের জন্যে এ কাজ তুমি পারতেনা।

হৈম অত্যন্ত সহজে স্বীকার করিয়া কহিল, না।

তাহার স্বামী কহিল, তা জানি। ইহার পরে কি করিয়া কি হইল সমস্ত ঘটনা একে একে বিবৃত করিয়া কহিল, অথচ, এ ছাড়া আমার পক্ষে যে কি উপায় ছিল, আমি জানিনে। আবার ওদিকে তাঁর বিপদের গুরুত্বটা একবার ভেবে দেখ। আমাকে তিনি সামান্যই জান্‌তেন এবং তাও বোধহয় ভাল বলে জানতেননা। তবুও আমাকেই এই যে নির্জ্জন অন্ধকার পথ দিয়ে নিয়ে এলেন, এর দায়িত্বটা কত বিশ্রী; কত ভয়ঙ্কর! বস্তুতঃ, পথে চল্‌তে চল্‌তে আমার অনেক বার ভয় হয়েছে যদি কারও সুমুখে পড়ি, তার চোখে এটা কি রকম দেখাবে? দেখ, হৈম, তোমাদের দেবীর এই ভৈরবী-টিকে আমি চিন্‌তে পারিনি সত্যি, কিন্তু এটুকু আজ নিশ্চয় বুঝেছি এঁর সম্বন্ধে বিচার করায় ঠিক সাধারণ নিয়ম খাটেনা। হয়, সতীত্ব জিনিসটা এঁর কাছে নিতান্তই একটা বাহুল্য বস্তু,—তোমাদের মত তার যথার্থ রূপটা ইনি চেনেননা, না হয় এর সুনাম দুর্নাম এঁকে স্পর্শ পর্য্যন্ত করতে পারেনা।

হৈম ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, তুমি কি জমীদারের ঘটনা মনে করেই এ সব বলছ?

নির্ম্মল বলিল, আশ্চর্য্য নয়। এই স্ত্রীলোকটি ভাল কি মন্দ আমি জানিনে, কিন্তু এ কথা হলফ করে বল্‌তে পারি ইনি যেমন গভীর, তেম্‌নি শিক্ষিত, তেম্‌নি নিঃশঙ্ক। শাস্ত্রে বলে সাত পা একসঙ্গে চল্‌লে বন্ধুত্ব হয়। এতবড় পথটায় এই দুর্ভেদ্য আঁধারে নিতান্ত তাঁকেই নির্ভর করে অনেক পা আমরা একসঙ্গে চলে এসেছি, একটি একটি করে অনেক প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করেচি, কিন্তু কালও তিনি যেমন রহস্যে ঢাকা ছিলেন, আজও তেমনি রয়ে গেলেন।

হৈম কহিল, তোমার জেরাও মানলেনা, বন্ধুত্বও স্বীকার করলেনা?

নির্ম্মল কহিল, না, কোনটাই হলনা।

হৈম এবার হাসিয়াফেলিয়া বলিল, একটুও না? তোমার দিক থেকেও না?

নির্ম্মল কহিল, এত বড় কথাটা কেবল ফাঁকি দিয়ে বার করে নিতে চাও? কিন্তু নিজেকে জান্‌তেও যে দেরি লাগে হৈম। কিন্তু কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই সে থমকিয়া গেল। চাহিয়া দেখিল হৈমও তাহার প্রতি দুই চক্ষের স্থির দৃষ্টি পাতিয়া আছে। তাহার মুখে কি ভাব প্রকাশ পাইল, প্রদীপের স্বল্প আলোকে ঠিক বুঝা গেলনা, এবং সে নিজেও যে নিজের পূর্ব্ব কথার যোগ রাখিয়া হঠাৎ কি বলিবে, ভাবিয়া স্থির করিবার পূর্ব্বেই হৈম ধীরে ধীরে কহিল, সে ঠিক। তবু, পুরুষ মানুষদের বুঝতে হয়ত একটু দেরিই হয়, কিন্তু মেয়েমানুষের এম্‌নি অভিশাপ যে আমরণ নিজের অদৃষ্টকে বুঝতেই তার কেটে যায়। আচ্ছা, তুমি ঘুমোও, আমি এখনি আসচি, এই বলিয়া সে আর কোন কথার পূর্ব্বেই উঠিয়া সাবধানে দ্বার রুদ্ধ করিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

নির্ম্মল তাহার হাত ধরিলনা,—রহস্যের অন্তরালে স্ত্রীর এই অর্থহীন সংশয় ও অবিচারের বেদনা তাহাকে যেন অকস্মাৎ ক্রোধে চঞ্চল করিয়া তুলিল। সুমুখের বড় ঘড়িটায় অত্যন্ত ক্লেশকর মিনিটের কাঁটাটা নড়িতে নড়িতে নীচে ঝুলিয়া পড়িল, কিন্তু তখন পর্য্যন্তও যখন সে ফিরিয়া আসিল না, তখন আর সে একাকী শয্যায় থাকিতে না পারিয়া ধীরে দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, অন্ধকার বারান্দায় একটা থামের পাশে হৈম চুপ করিয়া বসিয়া আছে। কাছে আসিয়া মাথায় গায়ে হাত দিয়া দেখিল, বৃষ্টির ছাটে সমস্ত ভিজিয়া গেছে। হাত ধরিয়া ঘরে আনিয়া কহিল, তুমি কি পাগল হয়েছ হৈম?

ইহার অধিক আর তাহার মুখেও আসিলনা, আসার প্রয়োজনও বোধ করিলনা। প্রদীপের আলোকে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া দেখিল অশ্রুর আভাস চোখের কোণ হইতে তখন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয় নাই।

১১

সকালে উঠিয়া হৈম নিজের গত রাত্রির ব্যবহার স্মরণ করিয়া লজ্জায় মরিয়া গেল। নির্দ্দোষ ও চরিত্রবান্ স্বামীর প্রতি এই অহেতুক অভিমানের উৎপাতটাকে সে ঝড় জল ও দুর্য্যোগের মধ্যে তাঁহার আকস্মিক নিরুদ্দেশের আতঙ্কটার ঘাড়েই চাপাইয়া দিয়া মনে মনে হাসিতে চাহিল, কিন্তু, সমস্ত প্রাণটাকে খুলিয়া দিয়া যে হাসি তাহার চিরদিনের অভ্যাস, কিছুতেই আজ তাহার আর নাগাল পাইলনা। চোখের বালি বাহির হইয়া গিয়াছে বুঝিয়াও অবোধ চোখদুটা যেন তাহার কোনমতে নিঃশঙ্ক হইতে চাহিলনা। শিরোমণি মহাশয় নিজে আসিয়া শুভক্ষণ স্থির করিয়া দিয়াছেন,—সাড়ে দশটা না কিছুতে উত্তীর্ণ হয়। মা ভাঁড়ার ঘরে যাত্রার আয়োজন ও রান্নাঘরে খাবার ব্যবস্থা করিতে অতিশয় ব্যস্ত, তাঁহার মুহূর্ত্তের অবকাশ নাই, এম্নি সময়ে সদর হইতে ডাক আসিল, রায় মহাশয় কন্যাকে আহ্বান করিয়াছেন। হৈম বাহিরে আসিয়া দেখিল কিসের যেন একটা উৎসব চলিয়াছে। পিতা ফরাসের উপর বাঁধা-হুঁকা হাতে বার দিয়া বসিয়াছেন, শিরোমণি মহাশয় আছেন, জমিদারের গোমস্তা এককড়ি নন্দী আছে, তারাদাস আছে, আরও কয়েকজন গণ্য-মান্য ব্যক্তি আছেন, তাহার স্বামীও একধারে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। উৎসাহ ও আনন্দের প্রাবল্যে সবাই একযোগে সংবাদটা হৈমর গোচর করিতে গিয়া প্রথমটা কিছু বুঝাই গেলনা। শিরোমণির দাঁত নাই, কিন্তু, আওয়াজ আছে,—তাহার বিপুল শক্তি মুহূর্ত্তেই আর সমস্ত থামাইয়া দিয়া যাহা প্রকাশ করিল তাহা এইরূপ; —কাল ভয়ানক দুর্য্যোগের রাত্রে মহৎ কার্য্য সাধিত হইয়াছে—নির্ব্বিঘ্নে

শত্রুপুরী হস্তগত হইয়াছে। ভৈরবী বাড়ী ছিলনা, চরের মুখে খবর পাইয়া তারাদাস সেই মেয়েটাকে লইয়া এই অবকাশে গিয়া সমস্ত দখল করিয়া লইয়াছে। বিবাদ করা দূরে থাক্ ভয়ে সে কথাটি পর্য্যন্ত বলে নাই, সামান্য কিছু কিছু জিনিসপত্র লইয়া রাত্রেই বাহির হইয়া গেছে। প্রাচীরের বাহিরে মন্দির-সংলগ্ন যে চালাটার মধ্যে দূরের যাত্রীরা কেহ কেহ রান্না বাড়া করিয়া খায়, তাহাতেই আশ্রয় লইয়াছে। এ সমস্ত মা চণ্ডীর কৃপা এবং এই কৃপাটা আর একটুখানি বৃদ্ধি পাইলেই তাহাকে গ্রাম হইতে দূর করিয়া দেওয়াও কঠিন কাজ হইবেনা।

উৎফুল্ল তারাদাস উপরের দিকে একটা কটাক্ষপাত করিয়া সবিনয় হাস্যে কহিল, সমস্তই মায়ের কাজ,—যা' করবার তিনিই করেছেন, নইলে অতবড় রাই-বাঘিনী একেবারে ভেড়া হইয়া গেল! তামাকটি ধরিয়ে সবে ফুঁ দিচ্চি, মেয়েটা পাশে বসে চা সিদ্ধটুকু ছেঁকে দিচ্চে,—এমনি সময়ে কোথা থেকে ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে এসে হাজির। আমাদের দেখে ভয়ে যেন একেবারে কাঠ হয়ে গেল; খানিকপরে আস্তে-আস্তে বল্‌লে, বাবা, আমি ত কখনো বলিনি তুমি যাও, কিম্বা এখানে থেকোনা। নিজে রাগ করে চলে গিয়ে কত কষ্ট না পেলে!

আমি বল্‌লাম, হঃ—

দোরের উপরে উঠে বল্‌লে, এ ঘরে তুমি কি তালা দিয়েছ বাবা?

বোল্‌লাম, হঃ—দিইচি। কি কর্‌বি কর্।

চুপ করে থেকে বল্‌লে, তোমার সঙ্গে আমি কিছুই কোরব না বাবা, তোমরা থাকো। কেবল ঘরটা একবার খুলে দাও, আমার কাপড় দু'খানা নিই।

দিলাম খুলে। মা চণ্ডীর দয়ায় আর কোন দাঙ্গা করলেনা; পরবার

খানদুই কাপড়, একটা কম্বল, আর একটা ঘাট নিয়ে অন্ধকারেই ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে দূর হয়ে গেল। মা'কে গড় হয়ে নমস্কার করে বোল্‌লাম, মা, এম্‌নি দয়া যেন ছেলের ওপর থাকে। তোর নাম না কোরে কখনো জলগ্রহণ করিনে!

শিরোমণি হাত নাড়িয়া কহিলেন, থাক্‌বে! থাক্‌বে! আমি বল্‌চি তারাদাস, মা মুখ তুলে চাইবেন! নইলে তাঁর জগদম্বা নামই যে বৃথা!

এককড়ি কহিল, কিন্তু ঠাকুর, যাই বল, মায়ের গদী কখনো খালি থাক্‌তে পারবেনা, তোমার মেয়েটিকে নতুন ভৈরবী করতে বিলম্ব করলেও চল্‌বেনা বলে রাখ্‌চি!

রায় মহাশয় পোড়া হুঁকাটা পাশের লোকটির হাতে দিয়া পরম গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিলেন, হবে, হবে, সব হবে, আমি সমস্ত ঠিক করে দেব, তোমরা ব্যস্ত হোয়োনা। জামাতার প্রতি চাহিয়া কহিলেন, কি বাবা, ছুঁড়ির কাছ থেকে এক ছত্র লিখিয়ে নেওয়া ত চাই? চাই বই কি! তাও হবে,—ডেকে আনিয়ে দুটো ধমক্ দিয়ে এও আমি করিয়ে নেব। কিন্তু, তাও বলে রাখ্‌চি তারাদাস, কদমতলার ওই জমিটে নিয়ে হাঙ্গামা করলে চল্‌বেনা। ধানের আড়ত্‌টা আমার সাম্‌নে সরিয়ে না আনলে চারদিকে আর চোখ্ রাখ্‌তে পারচিনে! মেলার নাম করে যোড়শীর মত ঝগড়া করলে কিন্তু—

কথাটা সমাপ্ত করিতেও হইলনা। অনেকেই তারাদাসের হইয়া রাজী হইয়া গেল, এবং সে নিজে জিভ্ কাটিয়া প্রায় গদ্‌গদ কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, অমন কথা মুখেও আন্‌বেন না রায় মশায়, আপনারই ত সব! হাতীর সঙ্গে মশার বিবাদ! কি বল মা? এই বলিয়া সে একটা ভাল কথা কিম্বা একটুখানি ঘাড়-নাড়া কিম্বা এম্‌নি কিছু একটা শুনিবার প্রত্যাশায়

হৈমর মুখের প্রতি চাহিল, এবং সেই সঙ্গে অনেকেরই দৃষ্টি তাহার উপরে গিয়া পড়িল। হৈম কিছুই কহিল না ; পরন্তু তাহার মুখের চেহারায় ষোড়শীর সেই প্রথম বিচারের দিনটাই সকলের দপ্ করিয়া মনে পড়িয়া অপ্রত্যাশিত একটা নিরুৎসাহের মেঘ যেন কোথা হইতে আসিয়া পলকের নিমিত্ত ঘরের মধ্যে ছায়াপাত করিল,—কিন্তু পলক মাত্রই। রায় মহাশয় সোজা হইয়া বসিয়া তামাকের জন্য একটা উচ্চ হাঁক দিয়া কহিলেন, বাবা নির্ম্মল, যাত্রার সময়টা শিরোমণি মহাশয় দশটার মধ্যেই দেখে দিয়েছেন ;—মেয়েদের কাণ্ড,—একটু সকাল সকাল তৈরি না হতে পারলে বার হওয়াই যাবে না।

নির্ম্মল ঘাড় নাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং আর কিছু বলিবার পূর্ব্বেই হৈম নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

মুখ হাত ধোয়া হইতে স্নান পর্য্যন্ত সমাধা করিতে বোস্ সাহেবের বেশি বিলম্ব হইলনা। বাটীর মধ্যে পা দিয়াই শাশুড়ীর উচ্চ কণ্ঠ রান্নাঘর হইতে শুনা গেল, তিনি মেয়েকে লইয়া পড়িয়াছেন। সে যে ঘরের মধ্যে কি করিতেছে তাহা ভাবিয়া পাইতেছেন না। নির্ম্মল ঘরে ঢুকিয়া দেখিতে পাইল হৈম মেজের উপর স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে ; আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপার কি, তোমার মা যে ভারি বকাবকি করছেন ? তা'ছাড়া সময় ত বেশি নেই।

হৈম কহিল, ঢের সময় আছে,—আজ ত আমাদের যাওয়া হতে পারে না।

কেন ?

হৈম কহিল, কেন কি ? ষোড়শীর এতবড় বিপদে তার সঙ্গে একবার দেখা না করেই যাবো ?

নির্ম্মল কহিল, বেশ ত, দেখা করেই এসোনা। তারও ত সময় আছে।

হৈম বলিল, আর তুমিই বা একবার দেখা না করে কি কোরে যেতে পারবে?

এ যে সেই গত রাত্রির প্রতিক্রিয়া তাহা মনে মনে বুঝিয়া নির্ম্মল কহিল, চেষ্টা করলে তাও বোধ হয় পারা যাবে। অসম্ভব রকমের শক্ত কাজ নয়, কিন্তু আমি একবার দেখা করে গেলেই যে এ বিপদে তার সুবিধে হবে মনে হয়না।

হৈম প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া শুধু কহিল, না সে কোন মতেই হবেনা।

হবে না কেন? তা'ছাড়া আমার যে সেই সৈদাবাদের চাম্‌ড়ার মাম্‌লা আছে—

থাক্ তোমার চাম্‌ড়ার মাম্‌লা, একটা তার করে দাও। আজ তোমার কিছুতেই যাওয়া হবেনা।

বেশ ত, চলনা না হয় দুজনে একবার দেখা করেই আসি? সে সময় ত আছে।

হৈম মুখ তুলিয়া একটু হাসিয়া বলিল, না, সে তোমার সেখানে হয়, কিন্তু, এখানে হয়না। আর এত লোকের সাম্‌নে বাবা-ই বা কি মনে করবেন? রাত্রে আমরা লুকিয়ে যাবো।

নির্ম্মলের যথার্থই অত্যন্ত জরুরি মোকদ্দমা ছিল, তা'ছাড়া কোন্ ছুতায় যে যাওয়া এমন হঠাৎ স্থগিত করা যাইতে পারে, সে ভাবিয়া পাইলনা, বিশেষতঃ, শ্বশুরের সঙ্গে ইহাতে নিদারুণ বিচ্ছেদ ঘটিবার সম্ভাবনা। চিন্তা করিয়া কহিল, সে হয়না, হৈম, যেতে আমাদের আজ হবেই। আর মনে হয় আমরা মাঝে পড়ে বিপদটা হয়ত তাঁর আরও বাড়িয়ে তুল্‌ব। আমার

কথা শোন, চল, অযাচিত মধ্যস্থতায় কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই বেশি হয়।

হৈম স্বামীর মুখের প্রতি চোখ তুলিয়া কিছুক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া থাকিয়া বলিল, আমাকে ত তুমি জানো, আজ আমি কিছুতেই যেতে পারবনা। আর, কালকের অপরাধে যদি আমাকে তুমি শাস্তি দিতেই চাও, ত ফেলে রেখে যাও। আমি আর তোমাকে আটকাবোনা।

নির্ম্মল আর কিছু না বলিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। শরীর ভাল নয়, আজ যাওয়া হইলনা শুনিয়া শ্বাশুড়ী-ঠাকুরাণী আশ্চর্য্য হইলেন, উদ্বিগ্ন হইলেন এবং ততোধিক খুসী হইয়া উঠিলেন, কিন্তু বাহিরের ঘরে বসিয়া শ্বশুর মহাশয় শুধু একটা হুঁ বলিয়াই তামাক টানিতে লাগিলেন। তিনি আশ্চর্য্যও হইলেননা, উদ্বিগ্নও হইলেননা, এবং যাহার কিছুমাত্র কাণ্ড-জ্ঞান আছে, সে তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া খুসির কথা মুখে আনিবেনা।

মকদ্দমার ব্যবস্থা করিতে নির্ম্মল তার করিয়া দিল এবং কাজটা যে কেবল নিরর্থক নয় মন্দ, তাহাও সে মনে মনে বুঝিল, তবুও সেই মনটাই তাহার সারাদিন একান্ত সংগোপনে সেই দিনান্তের জন্যই উন্মুক্ত হইয়া রহিল। বিগত রাত্রির হৈমর কান্নাটা যে কত হাস্যাস্পদ, কত অসম্ভব অপেক্ষাও অসম্ভব, সমস্ত দিন ধরিয়া এ কথা তাহার বহুবার মনে হইয়াছে, তবুও সেই একফোঁটা চোখের জল যেন কোন মতেই আর শুকাইতে চাহিলনা এবং প্রতি মুহূর্ত্তেই সে এমনই একটা অজ্ঞাত ও অচিন্ত্যপূর্ব্ব রহস্যের সৃষ্টি করিয়া চলিল, যাহা একই কালে মাধুর্য্য ও তিক্ততায় মিশিয়া একাকার হইয়া উঠিতে লাগিল।

রাত্রির অন্ধকারেও পিতার চক্ষুকে ফাঁকি দিবার প্রয়াস নিষ্ফল বুঝিয়া হৈম স্বামী ও তাহার পশ্চিমে চাকরটাকে সঙ্গে করিয়া যখন ষোড়শীর নূতন

বাসার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখনও সন্ধ্যা হয় নাই। ষোড়শী একখানি কম্বলের উপর বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে কি একখানা বই পড়িতেছিল, সম্মুখে জুতার শব্দ শুনিয়া মুখ তুলিয়া চাহিল এবং উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আসুন। এস, দিদি এস। এই বলিয়া সে গুটানো কম্বলখানি প্রসারিত করিয়া পাতিয়া দিল।

আসন গ্রহণ করিয়া স্বামী-স্ত্রী উভয়েই নিঃশব্দে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া হৈম কহিল, দিদির এই নতুন ঘরখানির আর যা দোষ থাক্ অপব্যয়ের অপবাদ শিরোমণি মশায় এমন কি আমার বাবা পর্য্যন্ত দিতে পারবেন-না। এই আশ্চর্য্য বস্তুটি দেখাবার লোভ দিয়েই আজ এঁকে ধরে রেখেচি, নইলে আমাকে শুদ্ধ নিয়ে দুপুরের গাড়ীতে চলে গিয়েছিলেন আর কি! স্বামীকে কহিল, কেমন, এ না দেখে গেলে অনুতাপ করতে হোতো?

নির্ম্মল কহিল, দেখেও ত কিছু কম করতে হবে মনে হয়না।

হৈম স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, সে ঠিক। হয়ত চোখে না দেখ্‌লেই ছিল ভাল। তাহার পরে ষোড়শীর শান্ত মলিন মুখখানির উপর নিজের স্নিগ্ধ চোখ দুটি রাখিয়া বলিল, আমরা সমস্তই শুনেচি। কিন্তু এ পাগ্‌লামি কেন করতে গেলে দিদি, এ ঘরে তুমি ত থাক্‌তে পারবেনা? আবেগ ও করুণায় শেষ দিকটায় তাহার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া গেল। কিন্তু ষোড়শীর গলায় ইহার প্রতিধ্বনি বাজিলনা। সে অত্যন্ত সহজ ভাবে কহিল, অভ্যাস হয়ে যাবে। এর চেয়েও কত খারাপ ঘরে কত মানুষকে ত থাক্‌তে হয় ভাই। তা'ছাড়া, বাবার বড় কষ্ট হচ্ছিল।

হৈম প্রশ্ন করিল, তা'হলে সমস্তই তুমি ছেড়ে দিলে?

ইহার উত্তর তাহার স্বামীর নিকট হইতে আসিল, সে কহিল, এ ছাড়া আর কি উপায় আছে বল্‌তে পারো? সমস্ত গ্রামের সঙ্গে ত একজন

অসহায় স্ত্রীলোক দিবারাত্রি বিবাদ করে টিকৃতে পারেনা। ষোড়শীকে কহিল, এই ভাল। যদি স্বেচ্ছায় এইস্থানে থাকাই সঙ্কল্প করে থাকেন, এবং এ কুটীরও অভ্যাস হয়ে যাবে বিশ্বাস করে থাকেন—সংসারে কিছুই ত্যাগ করা আপনার শক্ত হবেনা।

ষোড়শী মৌন হইয়া রহিল, এবং তাহার মুখ দেখিয়াও তাহার মনের কথা কিছুই বুঝা গেলনা। হৈম বলিল, তুমি সন্ন্যাসিনী, বিষয়-আশয় ছাড়া তোমার কঠিন নয়, কুঁড়েও তোমার সইবে আমি জানি, কিন্তু এর সঙ্গে যে মিথ্যে দুর্নাম লেগে রইল সেও কি সইবে দিদি?

ষোড়শী হাসিমুখে ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া বলিল, দুর্নাম যদি মিথ্যেই হয় সইবেনা কেন? হৈম, সংসারে মিথ্যে কথার অভাব নেই, কিন্তু তার প্রতিবাদ করতে গিয়ে যে আবার মিথ্যে কাজের সৃষ্টি হয় তার গুরু-ভারটাই সওয়া যায় না।

হৈম কহিল, কিন্তু এককড়ি নন্দী যে কথা এবং কাজ দুই-ই মিথ্যে রটিয়ে বেড়াচ্ছে? মেয়েমানুষের জীবনে সে যে অসহ্য।

ষোড়শী লেশমাত্র উত্তেজিত হইলনা, আস্তে-আস্তে কহিল, আমি যতদূর শুনেচি, এককড়ি মিথ্যে ত বিশেষ বলেনি। জমিদার বাবু হঠাৎ অত্যন্ত পীড়িত হয়ে পড়েছিলেন, ঘরে আর কেহ ছিলনা,—আমি তাঁর সেবা করেচি। এ তো অসত্য নয়।

হৈম উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। আর একজনের ধীরতার তুলনায় তাহার কণ্ঠস্বর কিছু অনাবশ্যক তীক্ষ্ণ শুনাইল, কহিল, কিন্তু সকলেই ত সব কাজ পারেনা দিদি। আর্ত্তের সেবা করারও ত একটা ধারা আছে?

ষোড়শী তেম্‌নি মৃদুকণ্ঠে বলিল, আছে বই কি! কিন্তু স্থান কাল না বুঝে কেবল বাইরে থেকে এই ধারাটা স্থির করে দেওয়া যায়না হৈম।

আপনি কি বলেন? এই বলিয়া সে নির্ম্মলের প্রতি চাহিয়া একটু হাসিল।

নির্ম্মল এ ইঙ্গিত সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিয়া কহিল, অন্ততঃ আমি ত কোনমতেই অস্বীকার করতে পারিনে। তা'ছাড়া কাজের ধারা সকলের একও নয়,—এই যেমন সন্ন্যাসিনীর।

স্বামীর এই উক্তিটাকে হৈম তলাইয়া দেখিলনা, কহিল, হোক্ সন্ন্যাসিনী, কিন্তু তাঁর কি ধর্ম্ম নেই? তিনি কি নারী নয়? আপনাকে সে ঘর থেকে ধরিয়ে নিয়ে গেল, অথচ বল্‌লেন নিজে গিয়েছিলেন। এই মিথ্যের কি আবশ্যক ছিল? তার অসুখ ত কেবল নিজের দোষে। তবুও এত বড় ঘোর পাপিষ্ঠকে বাঁচাবার আপনার কি দরকার ছিল? এর পরেও মানুষে যদি সন্দেহ করে সে কি তাদের দোষ?

স্ত্রীর কথা শুনিয়া নির্ম্মল ক্ষুব্ধ এবং লজ্জিত হইয়া উঠিল। সে জানিত অভিযোগ করিতে হৈম ঘর হইতে বাহির হয় নাই,—বাড়ী চড়িয়া অপমান করিবার মত ক্ষুদ্র এবং হীন সে নয়,—বস্তুতঃ, কৃতজ্ঞতা জানাইয়া একটা বড় রকমের ভরসা দিতেই সে উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু কথায় কথায় এ সকল কি তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল! কিন্তু পাছে আত্মবিস্মৃত হইয়া আরও বেশি কিছু বলিয়া বসে, এই ভয়ে সে ব্যস্ত হইয়া কি একটা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু আবশ্যক হইলনা। ষোড়শী হাসিয়া বলিল, তোমার স্বামী বল্‌ছিলেন সন্ন্যাসিনীর ধর্ম্ম অসন্ন্যাসিনীর সঙ্গে নাও মিল্‌তে পারে, এই যেমন এই কুঁড়ের মধ্যে নিরাশ্রয়, ধূলো বালির ওপর একাকী বাস করা তোমার সহ্য হবেনা। এই বলিয়া সে পুনরায় হাসিয়া কহিল, সত্যিই আমাকে ঘর থেকে টেনে-হিঁচড়ে কেউ ধরে নিয়ে যায়নি, আমি রাগের মাথায় আপনিই বেরিয়ে পড়েছিলাম।

নির্ম্মল কহিল, কিন্তু আপনার রাগ আছে বলে ত মনে হয়না ?

ষোড়শী হাসি চাপিয়া শুধু বলিল, আছে বই কি। হৈমকে কহিল, কিন্তু সে তর্ক আমি করবচিনে, সত্যিই আমি মিথ্যে বলেছিলাম। কিন্তু ঘোর পাপিষ্ঠ বলে কি তাকে বাঁচাবার অধিকারও কারও নেই ? তোমার স্বামী উকিল, তাঁকে বরঞ্চ সময় মত জিজ্ঞেসা করে দেখো।

নির্ম্মল বলিল, সময় মত সাধারণ বুদ্ধিতে একটা জবাব দিতেও পারি, কিন্তু ওকালতী বুদ্ধিতে ত কিছুই খুঁজে পাচ্ছিনে।

ষোড়শী কহিল, তা ছাড়া এমন ত হতে পারে সজ্ঞানে অনেক কর্ম্মই তিনি করেন না—

হৈম বাধা দিয়া কহিল, তাই বলে কি নিজের বাপের বিরুদ্ধেও যেতে হবে ? এও কি সন্ন্যাসিনীর ধর্ম্ম ?

ষোড়শী রাগ করিলনা, হাসি মুখে কহিল, সন্ন্যাসিনীর হোক্ না হোক্, মেয়েমানুষের অন্ততঃ এমন জিনিষ সংসারে থাকৃতে পারে যা বাপেরও বড়। তাই যদি না হোতো হৈম, এই ভাঙা কুঁড়ের মধ্যে তোমার পায়ের ধূলোই বা পড়্‌ত কি কোরে ?

হৈম শশব্যস্তে হেঁট হইয়া তাহার পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া কহিল, অমন কথা তুমি মুখেও এনোনা দিদি। আমার শ্বশুরকে কোন্ এক রাজা একখানি তলোয়ার খিলাত দিয়েছিলেন, ছেলেবেলা আমি প্রায় সেখানি খুলে খুলে দেখতাম। খাপখানা তার ধূলো-বালিতে মলিন হয়ে গেছে, কিন্তু আসল জিনিসে কোথাও এতটুকু ময়লা ধরেনি। সে যেমন সোজা, তেম্‌নি কঠিন, তেম্‌নি খাঁটি,—তার কথা আমার তোমার পানে চাইলেই মনে পড়ে। মনে হয়, দেশ শুদ্ধ লোক সবাই ভুল করেচে, কেউ কিছুই

জানেনা,—তুমি ইচ্ছে করলে চোখের পলকে সেই খাপখানা ছুড়ে ফেলে দিতে পারো। কেন দিচ্চ না দিদি?

ষোড়শী তাহার ডান হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া থাকিয়া কহিল, অদ্য তোমাদের যাবার কথা ছিল, হলনা কেন? বোধ হয় কাল যাওয়া হবে?

হৈম তাহার স্বামীকে দেখাইয়া কহিল, কাল রাত্রে কে এঁকে হাত ধরে নদী মাঠ প্রান্তর নির্ব্বিঘ্নে পার করে এনে বাড়ীতে দিয়ে গেছেন, আমার বাবা তাঁকে পূরো এক টাকা বক্‌সিস্ দিতে চেয়েছেন। কিন্তু টাকাটা তাঁর হাতে পড়বেনা, কারণ, তিনি তাঁকে খুজে পাবেননা; এই অন্ধ মানুষটিকে অমন করে দিয়ে না গেলে যে কি হোতো সে কেবল আমিই জানি, আর আমিই কেবল তাঁর নাম জানি। কিন্তু টাকা-কড়ি ত তাঁকে দেবার যো নেই,—তাই কেবল একটু পায়ের ধূলো নিতে—এই বলিয়া সে তাহার হাতখানি টানিয়া লইবার চেষ্টা করিতেই ষোড়শী নিজের মুঠাটা শক্ত করিয়া রাখিয়া কেবল একটু হাসিল।

হৈম বাঁ হাত দিয়া তাহার চোখের কোন্‌টা মুছিয়া লইয়া হাসিয়া কহিল, পায়ের ধূলো দিতে হবেনা, দিদি, মুঠোটা একটু আল্‌গা কর—আমার হাত ভেঙে গেল। শক্ত কেবল মনই নয়, হাতটাও কম নয়। ইস্পাতের তলওয়ারটা কি সাধে মনে পড়ে! কিন্তু এই কথাটি আজ দাও দিদি, আপনার লোকের যদি কখনো দরকার হয় এই প্রবাসী বোন্‌টিকে তখন স্মরণ করবে?

ষোড়শী তাহার হাতের উপর ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে লাগিল, কিছুই বলিলনা।

হৈম কহিল, তা'হলে কথা দিতে চাওনা?

ষোড়শী বলিল, আমার জন্যে তোমার বাবার সঙ্গে ঝগড়া হয় এই কি আমি চাইতে পারি ভাই ?

নির্ম্মল কহিল, ঝগড়া না করেও ত অনেক জিনিস করা যায় ?

ষোড়শী বলিল, আমি বলি তা-ও আপনাদের চেষ্টা করে কাজ নেই। কিন্তু তাই বলে প্রবাসী বোন্‌টিকেও আমি ভুলে যাবোনা। আমার খবর আপনারা পাবেন।

চাকরটা এতক্ষণ চুপ করিয়া বাহিরে বসিয়া ছিল, সে কহিল, মা কালকের মত আজও ঝড়-জল হতে পারে,—মেঘ উঠেচে।

হৈম বাহিরে উঁকি মারিয়া দেখিয়া প্রণাম করিয়া এবার পায়ের ধূলা লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, নির্ম্মল হাত তুলিয়া একটা নমস্কার করিয়া কহিল, আমি চিরদিন ঋণীই রয়ে গেলাম, শোধ দেবার আর কোন পথ রইলনা। আদালতের মানুষ, বিষয়-সম্পত্তি-ওয়ালা ভৈরবীর কাজে লাগলেও লাগ্‌তে পারতাম, কিন্তু, কুঁড়ে ঘরের সন্ন্যাসিনীরা আমাদের হাতের বাইরে। সমস্ত না ছেড়েও উপায় ছিলনা সত্যি, কিন্তু ছেড়েও যে উপায় হবে তা ভরসা হয়না।

ষোড়শী উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, কে বল্‌লে আমি সমস্ত ছেড়ে দিয়েচি ? আমি ত কিছুই ছাড়িনি।

নির্ম্মল ও হৈম উভয়েই অবাক্ হইয়া, একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, ছাড়েননি ? কোন স্বত্বই ত্যাগ করেননি ?

ষোড়শী তেম্‌নি শান্ত সহজ কণ্ঠে কহিল, না, কিছুই না। আমি স্ত্রীলোক, আমি নিরুপায়, কিন্তু আমার ভৈরবীর অধিকার একতিল শিথিল হয়নি। তাঁরা পুরুষ মানুষ, তাঁদের জোর আছে,—কিন্তু সেই জোরটা তাঁদের ষোল আনা সপ্রমাণ না কোরে আমার হাত থেকে কিছুই পাবার

যো' নেই—মাটীর একটা ঢেলা পর্য্যন্ত না। নির্ম্মলবাবু; আমি মেয়ে মানুষ, কিন্তু সংসারে সেইটাই আমার বড় অপরাধ যাঁরা স্থির করে রেখেছেন, তাঁরা ভুল করেছেন। এ ভ্রম তাঁদের সংশোধন করতে হবে।

কথা শুনিয়া দুজনেই স্তব্ধ হইয়া রহিল। ঘরে তখনও আলো জ্বলে নাই,—অন্ধকারে তাহার মুখ, তাহার চোখ, তাহার ক্ষীণ দেহের অস্পষ্ট ঋজুতা ভিন্ন আর কিছুই লক্ষ্য হইলনা,—কিন্তু ওই শান্ত অবিচলিত কণ্ঠস্বরও যে মিথ্যা আস্ফালন উদ্গীর্ণ করে নাই, তাহা মর্ম্মের মাঝখানে গিয়া উভয়েরই সবলে বিদ্ধ করিল।

অনতিদূরে পথের বাঁকটার কাছে একটা গোলমাল শুনা গেল। আগে এবং পিছনে কয়েকটা আলোর সঙ্গে গোটা দুই পাল্‌কি চলিয়াছে।

অন্ধকারে নজর করিয়া দেখিয়া নির্ম্মল কহিল, জমিদার বাবু তা'হলে আজই পদধূলি দিলেন দেখ্‌চি।

ষোড়শী ভিতর হইতে সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, জমিদার বাবু? তাঁর কি আস্‌বার কথা ছিল? এই বলিয়া সে দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

নির্ম্মল কহিল, হাঁ, তাঁর নদীর ধারের নরক-কুণ্ডর ঝাড়ামোছা চল্‌ছিল। এককড়ি বল্‌ছিল, শরীর সারবার জন্যে হুজুর আজকালের মধ্যেই স্বরাজ্যে পদার্পণ করবেন। করলেনও বটে।

ষোড়শী নির্ব্বাক হইয়া সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল। বিদায় লইয়া নির্ম্মল আস্তে আস্তে কহিল,—যত দূরেই থাকি আমরা বেঁচে থাকতে নিজেকে একেবারেই নিরুপায় এবং নিরাশ্রয় ভেবে রাখ্‌বেননা। এই বলিয়া সে হৈমর হাত ধরিয়া অন্ধকারে অগ্রসর হইল। ষোড়শী তেম্‌নি স্থির তেম্‌নি স্তব্ধ হইয়াই রহিল, এ কথারও কোন উত্তর দিলনা।

বিপুলকায় মন্দিরের প্রাচীরতলে জমিদার জীবানন্দ চৌধুরীর পাল্‌কি দুটা নিমিষে অন্তর্হিত হইল। এই অত্যন্ত আঁধারে মাত্র ওই গোটা কয়েক আলোর সাহায্যে মানুষের চক্ষে কিছুই দেখা যায়না, কিন্তু ষোড়শীর মনে হইল লোকটিকে সে যেন দিনের মত স্পষ্ট দেখিতে পাইল। এবং শুধু কেবল তিনিই নয়, তাঁহার পিছনে ঘেরা-টোপ ঢাকা যে পাল্কিটি গেল, তাহার অবরোধের মধ্যেও যে মানুষটি নিঃশব্দে বসিয়া আছে তাহারও শাড়ীর চওড়া কালা-পাড়ের একপ্রান্ত ঈষন্মুক্ত দ্বারের ফাঁক দিয়া ঝুলিয়া আছে, সেটুকুও যেন তাহার চোখে পড়িল। তাহার হাতের তির-কাটা চুড়ির স্বর্ণাভা লণ্ঠনের আলোকে পলকের জন্য যে খেলিয়া গেল এ বিষয়েও তাহার সংশয় রহিলনা। তাহার দুই কাণে হীরার দুল ঝল্‌মল্‌ করিতেছে, তাহার আঙুলে আঙটির পাথরে সবুজ রঙ ঠিকরিয়া পড়িতেছে,—সহসা কল্পনা তাহার বাধা পাইয়া থামিল। তাহার স্মরণ হইল এ সমস্তই সে এইমাত্র হৈমর গায়ে দেখিয়াছে। মনে পড়িয়া একাকী অন্ধকারেও সে লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। চণ্ডী! চণ্ডী! বলিয়া সে সম্মুখের মন্দিরের উদ্দেশে চৌকাটে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল, এবং সকল চিন্তা সবলে দূর করিয়া দিয়া দ্বার ছাড়িয়া ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইতে আর দুটি নর নারীর চিন্তায় তাহার বুক ভরিয়া উঠিল। ক্ষণেক পূর্ব্বেও সকল কথা-বার্ত্তার মধ্যেও ঝড় ও বৃষ্টির আশু সম্ভাবনা তাহার মনের মধ্যে নাড়া দিয়া গেছে। উপরে কালো ছেঁড়া মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন হইতেছে, হয়ত, দুর্য্যোগের মাতামাতি অচিরেই আরম্ভ হইয়া যাইবে। বিগত রাত্রির

অর্দ্ধেক দুঃখ ত তাহার মাথার উপর দিয়া বহিয়া গেছে, বাকী রাতটুকুও মন্দিরের রুদ্ধ দ্বারে দাঁড়াইয়া কোন মতে কাটিয়াছে, এই প্রকার শারীরিক ক্লেশ সহ্য করা তাহার অভ্যাস নয়,—দেবীর ভৈরবীকে এ সকল ভোগ করিতেও হয়না,—তবুও কাল তাহার বিশেষ দুঃখ ছিলনা। যে বাড়ী, যে ঘর-দ্বার স্বেচ্ছায় সে তাহার হতভাগ্য পিতাকে দান করিয়া আসিয়াছে, সে সম্বন্ধে সারাদিন আজ কোন চিন্তাই সে করে নাই ; কিন্তু, এখন হঠাৎ সমস্ত মন যেন তাহার একেবারে বিকল হইয়া গেল। এই নির্জ্জন পল্লীপ্রান্তে একাকিনী এই ভাঙা স্যাঁত-সেঁতে গৃহের মধ্যে কি করিয়া তাহার রাত্রি কাটিবে ? নিজের আশে পাশে চাহিয়া দেখিল। স্তিমিত দীপালোকে ঘরের ওদিকের কোণ দুইটা আবছায়া হইয়া আছে, তাহারই মাঝে মাঝে ইন্দুরের গর্ত্তগুলা যেন কালো কালো চোখ মেলিয়া রহিয়াছে ; তাহাদের বুজাইতে হইবে ; মাথার উপরে চালে অসংখ্য ছিদ্র, ক্ষণেক পরে বৃষ্টি সুরু হইলে সহস্রধারে জল ঝরিবে, দাঁড়াইবার স্থানটুকু কোথাও রহিবেনা, এই সব লোক ডাকাইয়া মেরামত করিতে হইবে ; কবাটের অর্গল নিরতিশয় জীর্ণ ; ইহার সংস্কার সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক, অথচ, দিন থাকিতে লক্ষ্য করে নাই ভাবিয়া বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। এই অরক্ষিত, পরিত্যক্ত পর্ণ-কুটীরে—কেবল আজ নয়—দিনের পর দিন বাস করিবে সে কেমন করিয়া ? তাহার মনে পড়িল এইমাত্র বিদায়ক্ষণে নির্ম্মলের কথার উত্তরে কিছুই বলা হয় নাই, অথচ শীঘ্র আর হয়ত দেখা হইবেনা। সে ভরসা দিয়া বলিয়া গেছে নিজেকে একেবারে নিরুপায় না ভাবিতে। হয়ত, সহস্র কাজের মধ্যে এ কথা তাহার মনেও থাকিবেনা। থাকিলেও, পশ্চিমের কোন্ একটা সুদূর সহরে বসিয়া সে সাহায্য করিবেই বা কি করিয়া, এবং তাহা গ্রহণ করিবেই বা সে কোন্ অধিকারে ? আবার

হৈমকে মনে পড়িল। যাবার সময় সে একটি কথাও বলে নাই, কিন্তু স্বামীর আহ্বানে যখন তাঁহার হাত ধরিয়া সে অগ্রসর হইল, তখন তাঁহার প্রত্যেক কথাটিকে সে যেন নীরবে অনুমোদন করিয়া গেল। সুতরাং, স্বামী ভুলিলেও ভুলিতে পারেন, কিন্তু স্ত্রী যে তাহার অনুচ্চারিত বাক্য সহজে বিস্মৃত হইবেনা ষোড়শী তাহা মনে মনে বিশ্বাস করিল।

হৈমর সহিত পরিচয় তাহার বহুদিনব্যাপীও নয়, ঘনিষ্টও নয়। অথচ, কোন মতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া সে যখন তাহার কম্বলের শয্যাটি বিস্তৃত করিয়া ভূমিতলে উপবেশন করিল, তখন এই মেয়েটিকেই তাহার বারবার মনে হইতে লাগিল। সেই যে সে প্রথম দিনটিতেই অযাচিত তাহার দুঃখের অংশ লইয়া গ্রামের সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে, পিতার বিরুদ্ধে, বোধ করি বা আরও একজনের বিরুদ্ধে গোপনে যুদ্ধ করিয়াছিল, সে চলিয়া গেলে কাল তাহার পাশে দাঁড়াইতে এখানে আর কেহ থাকিবেনা; প্রতিকূলতা উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিতেই থাকিবে, কিন্তু আপনার বলিতে, একটা সান্ত্বনার বাক্য উচ্চারণ করিতেও লোক মিলিবেনা, অথচ, এই ঝঞ্ঝা যে কোথায় গিয়া কি করিয়া নিবৃত্ত হইবে, তাহারও কোন নির্দ্দেশ নাই। এমনি করিয়া এই নির্ব্বান্ধব জনহীন আলয়ে চারিদিকের ঘনীভূত অন্ধকারে একাকিনী বসিয়া সে অদূর ভবিষ্যতের সুনিশ্চিত বিপদের ছবিটাকে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতেছিল, কিন্তু কখন অজ্ঞাতসারে যে এই পরিপূর্ণ উপদ্রবের আশঙ্কাকে সরাইয়া দিয়া ক্ষণকালের নিমিত্ত এক অভিনব অপরিজ্ঞাত ভাবের তরঙ্গ তাহার বিক্ষুব্ধ চিত্তের মাঝে উত্তাল হইয়া উঠিল, সে জানিতে পারিলনা। এতদিন জীবনটাকে সে যে ভাবে পাইয়াছে, সেই ভাবেই গ্রহণ করিয়াছে। সে চণ্ডীর ভৈরবী; ইহার দায়িত্ব আছে, কর্ত্তৃত্ব আছে, সম্পদ আছে, বিপদ আছে,—স্মরণাতীত

কাল হইতে ইহার অধিকারিণীগণের পায়ে পায়ে যে পথ পড়িয়াছে, তাহা কোথাও সঙ্কীর্ণ কোথাও প্রশস্ত, পথ চলিতে কেহ বা সোজা হাঁটিয়াছেন, কাহারও বা বাঁকা পদচিহ্ন পরম্পরাগত ইতিহাসের অঙ্কে বিদ্যমান। ইহার অলিখিত পাতাগুলা লোকের মুখে মুখে কোথাও বা সদাচারের পুণ্য কাহিনীতে উদ্ভাসিত, কোথাও বা ব্যভিচারের গ্লানিতে কালো হইয়া আছে, তথাপি ভৈরবীজীবনের সুনির্দ্দিষ্ট ধারা কোথাও এতটুকু বিলুপ্ত হয় নাই। যাত্রা করিয়া সহজ ও সুগম, দুর্জ্ঞেয় ও জটিল অনেক গলি-ঘুঁজি অনেককেই পার হইতে হইয়াছে, তাহার সুখ ও দুঃখভোগ কম নয়; কিন্তু কেন, কিসের জন্য, এ প্রশ্নও বোধ করি কেহ কখনো করে নাই, কিম্বা ইহাকে অস্বীকার করিয়া আর কোন একটা পথ খুঁজিতেও কাহারো প্রবৃত্তি হয় নাই। ভাগ্য-নির্দ্দিষ্ট সেই পরিচিত খাদের মধ্যে দিয়াই ষোড়শীর জীবনের এই কুড়িটা বছর প্রবাহিত হইয়া গেছে, ইহাকে ভৈরবীর জীবন বলিয়াই সে অসংশয়ে গ্রহণ করিয়াছে; একটা দিনের তরেও আপনার জীবন নারীর জীবন বলিয়া ভাবে নাই। চণ্ডীর সেবাইত বলিয়া সে নিকটে ও দূরের বহু গ্রাম ও জনপদের গণনাতীত নর-নারীর সহিত সুপরিচিত। কত সংখ্যাতীত রমণী,—কেহ ছোট,কেহ বড়, কেহবা সমবয়সী—তাহাদের কত প্রকারের সুখ দুঃখ,কত প্রকারের আশা ভরসা, কত ব্যর্থতা, কত অপরূপ আকাশ-কুসুমের সে নির্বাক ও নির্বিকার সাক্ষী হইয়া আছে;—দেবীর অনুগ্রহ লাভের জন্য কত কাল ধরিয়া কত কথাই না ইহারা গোপনে মৃদুকণ্ঠে তাহাকে ব্যক্ত করিয়াছে, দুঃখী জীবনের নিভৃততম অধ্যায়গুলি অকপটে তাহার চোখের উপর মেলিয়া ধরিয়া প্রসাদ ভিক্ষা চাহিয়াছে;—এ সমস্তই তাহার চোখে পড়িয়াছে, পড়ে নাই কেবল রমণী-হৃদয়ের কোন্ অন্তস্তল ভেদিয়া এই সকল সকরুণ অভাব ও

অনুযোগের স্বর উত্থিত হইয়া এতকাল ধরিয়া তাহার কানে আসিয়া পশিয়াছে। ইহাদের গঠন ও প্রবৃত্তি এম্‌নিই কোন্ এক বিভিন্ন জগতের বস্তু, যাহাকে জানিবার ও চিনিবার কোন হেতু, কোন প্রয়োজন তাহার হয় নাই। সেই প্রয়োজনের প্রথম আঘাত এইখানে এই পরিত্যক্ত অন্ধকার আলয়ে এই প্রথম তাহার গায়ে লাগিল। কাল দুর্য্যোগের রাত্রে নির্ম্মলের হাত ধরিয়া নদী পার করিয়া আনিয়া সে তাহাকে গৃহে পৌঁছাইয়া দিয়াছিল, হয়ত, দুটি লোক ছাড়া এ কথা আর কেহ জানেনা, এবং এখন এইমাত্র সেই স্বল্প-দৃষ্টি লোকটির আহ্বানে হৈম যে তাঁহার হাত ধরিয়া নিঃশব্দে অগ্রসর হইল, এ কথাও বোধ করি কয়েকটি লোক ছাড়া আর কেহ জানিবেনা, কিন্তু কাল এবং আজিকার এই একই কর্ত্তব্যের কত বড়ই না পার্থক্য!

আর একবার তাহার চোখের উপর হৈমর কাপড়ের পাড়টুকু হইতে তাহার আঙুলের সবুজরঙের আঙটি হইতে তাহার কানের হীরার দুল পর্য্যন্ত সমস্ত খেলিয়া গেল, এবং সর্ব্বপ্রকার দুর্ভেদ্য আবরণ ও অন্ধকার অতিক্রম করিয়া তাহার অভ্রান্ত অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি, দৃষ্টির বাহিরে ওই মেয়েটির প্রত্যেক পদক্ষেপ যেন অনুসরণ করিয়া চলিল। সে দেখিতে পাইলে, স্বামীর হাত ছাড়িয়া এইবার তাহাকে লুকাইয়া বাড়ী ঢুকিতে হইবে, সেখানে তাহার চিন্তিত ও ব্যাকুল পিতামাতার শতসহস্র তিরস্কার ও কৈফিয়ৎ নিরুত্তরে মাথায় করিয়া লজ্জিত দ্রুতপদে নিজের ঘরে গিয়া আশ্রয় লইতে হইবে, সেখানে হয়ত তাহার নিদ্রিত পুত্র ঘুম ভাঙিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিয়া কাঁদিতেছে,—তাহাকে শান্ত করিয়া আবার ঘুম পাড়াইতে হইবে;—কিন্তু ইহাতেই কি অবসর মিলিবে? তখনও কত কাজ বাকী থাকিয়া যাইবে। অন্তরাল হইতে স্বামীর খাওয়াটুকু পর্য্যবেক্ষণ করা চাই,—ত্রুটি না হয়; ছেলেকে তুলিয়া দুধ খাওয়াইতে হইবে,—সে অভুক্ত না থাকে; পরে

নিজেও খাইয়া লইয়া যেমন-তেমন করিয়া বাকী রাতটুকু কাটাইয়া আবার প্রত্যূষে উঠিয়া যাত্রার জন্য প্রস্তত হওয়া চাই। তাহার কত রকমের প্রয়োজন, কত রকমের গুছান-গাছান। তাহার স্বামী, তাহার পুত্র, তাহার লোকজন-দাসী-চাকর তাহাকে আশ্রয় করিয়াই যাত্রা করিবে। দীর্ঘ পথে কাহার কি চাই, তাহাকেই যোগাইতে হইবে, তাহাকেই সমস্ত ভাবিয়া সঙ্গে লইতে হইবে। নিজের জীবনটাকে ষোড়শী কোনদিন পরের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখে নাই, আলোচনা করিবার কথাও কখনো মনে হয় নাই, তবুও সেই মনের মাঝখানে গৃহিণী-পনার সকল দায়িত্ব, সকল ভার, জননীর সকল কর্ত্তব্য, সকল চিন্তাকে কে যেন কবে সুনিপুণ হাতে সম্পূর্ণ করিয়া সাজাইয়া দিয়া গেছে। তাই কিছু না জানিয়াও সে সব জানে, কখনও কিছু না শিখিয়াও হৈমর সকল কাজ তাহারি মত নিখুঁত করিয়া করিতে পারে এই কথাই তাহার মনে হইল।

অনতিদূরে একখণ্ড কাঠের উপর সংস্থাপিত মাটির প্রদীপটা নিব-নিব হইয়া আসিতেছিল, অন্যমনে ইহাকে উজ্জ্বল করিয়া দিতেই তাহার চমক ভাঙিয়া মনে পড়িল সে চণ্ডীগড়ের ভৈরবী। এত বড় সম্মানিতা গরীয়সী নারী এ প্রদেশে আর কেহ নাই। সে সামান্য একজন রমণীর অত্যন্ত সাধারণ গৃহস্থালীর অতি তুচ্ছ আলোচনায় মুহূর্ত্তের জন্যও আপনাকে বিহ্বল করিয়াছে মনে করিয়া লজ্জায় মরিয়া গেল। ঘরে আর কেহ নাই, ক্ষণকালের এতটুকু দুর্ব্বলতা জগতে কেহ কখনো জানিবেও না, শুধু কেবল যে দেবীর সেবিকা সে, সেই চণ্ডীর উদ্দেশে আর একবার যুক্ত-করে নতশিরে কহিল, মা, বৃথা চিন্তায় সময় বয়ে গেল, তুমি ক্ষমা কোরো।

রাত্রি কত হইয়াছে ঠিক জানিবার যো নাই, কিন্তু অনুমান করিল অনেক হইয়াছে। তাই শয্যাটুকু আরও একটু বিস্তৃত করিয়া, এবং

প্রদীপে আরও খানিকটা তেল ঢালিয়া দিয়া সে শুইয়া পড়িল। শ্রান্ত চক্ষে ঘুম আসিতেও বোধ করি বিলম্ব ঘটিত না, কিন্তু বাহিরে দ্বারের কাছেই একটা শব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিয়া বসিল। বাতাসেও একটু জোর ধরিয়াছিল, শিয়াল-কুকুর হওয়াও অসম্ভব নয়, তবুও ক্ষণকাল কান পাতিয়া থাকিয়া সভয়ে কহিল, কে ?

বাহির হইতে সাড়া আসিল, ভয় নেই মা তুমি ঘুমোও,—আমি সাগর।

কিন্তু, এত রাত্তিরে তুই কেন রে ?

সাগর কহিল, হর খুড়ো বলে দিলে, জমিদার এয়েচে, রাতটাও বড় ভাল নয়,—মা একলা রয়েচে, যা সাগর, লাঠিটা হাতে নিয়ে একবার বস্‌গে। তুমি শুয়ে পড় মা, ভোর না দেখে আমি নড়্‌বনা।

ষোড়শী বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, তাই যদি হয় সাগর, একা তুই কি করবি বাবা ?

বাহিরের লোকটি একটু হাসিয়া কহিল, একা কেন মা, খুড়োকে একটা হাঁক্ দেব। খুড়ো ভাইপোয় লাঠি ধরলে জানত মা সব। সে-দিনকার লজ্জাতেই মরে আছি, একটি-বার যদি হুকুম দিয়ে পাঠাতে মা।

এই দুটি খুড়া ও ভাইপো হরিহর ও সাগর ডাকাতি অপবাদে একবার বছর দুই করিয়া জেল খাটিয়াছিল। জেলের মধ্যে বরঞ্চ ছিল ভাল, কিন্তু অব্যাহতি পাইয়া ইহাদের প্রতি বহুকাল যাবৎ একদিকে জমিদার ও অন্যদিকে পুলিশ কর্ম্মচারীর দৌরাত্ম্যের অবধি ছিলনা। কোথাও কিছু একটা ঘটিলে দুইদিকের টানাটানিতে ইহাদের প্রাণান্ত হইত। স্ত্রী পুত্র লইয়া না পাইত ইহারা নির্ব্বিঘ্নে বাস করিতে, না পাইত দেশ ছাড়িয়া কোথাও উঠিয়া যাইতে। এই অযথা পীড়ন ও অহেতুক যন্ত্রণা হইতে ষোড়শী ইহা-

দের যৎকিঞ্চিৎ উদ্ধার করিয়াছিল। বীজগাঁর জমিদারী হইতে বাস উঠাইয়া আনিয়া নিজের মধ্যে স্থান দিয়া, এবং নানা উপায়ে পুলিশকে প্রসন্ন করিয়া জীবনযাত্রার ব্যাপারটা ইহাদের অনেকখানি সুসহ্ করিয়া দিয়াছিল। সেই অবধি দস্যু-অপবাদগ্রস্ত এই দুইটি পরম ভক্ত ষোড়শীর সকল সম্পদে বিপদে একান্ত সহায়। শুধু কেবল নীচ জাতীয় ও অস্পৃশ্য বলিয়াই সঙ্কোচে তাহারা দূরে দূরে থাকিত, এবং, ষোড়শী নিজেও কখনো কোনদিন তাহাদের কাছে ডাকিয়া ঘনিষ্টতা করিবার চেষ্টা করে নাই। অনুগ্রহ কেবল দিয়াই আসিয়াছে, ফিরিয়া কখনো গ্রহণ করে নাই, বোধকরি প্রয়োজনও হয় নাই। আজ এই নির্জ্জন নিশীথে সংশয় ও সঙ্কটের মাঝে তাহাদের আড়ম্বরহীন এই স্নেহ ও নিঃশব্দ-সেবার চেষ্টায় ষোড়শীর দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। মুছিয়া ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা সাগর, তোদের জাতের মধ্যেও বোধ হয় আমার সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হয়, না রে? কে কি বলে?

বাহির হইতে সাগর আস্ফালন করিয়া জবাব দিল, ইস্! আমাদের সামনে! দুই তাড়ায় কে কোথা পালাবে ঠিক পায়না মা।

ষোড়শী তৎক্ষণাৎ সলজ্জে অনুভব করিল, ইহার কাছে এরূপ প্রশ্ন করাই তাহার উচিত হয় নাই। অতএব কথাটাকে আর না বাড়াইয়া মৌন হইয়া রহিল। অথচ, চোখেও তাহার ঘুম ছিলনা। বাহিরে আসন্ন ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করিয়া তাহারি খবরদারীতে একজন জাগিয়া বসিয়া আছে জানিলেই যে নিদ্রার সুবিধা হয় তাহা নয়, তাই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার সে এই কথাই পাড়িল, কহিল, যদি জল আসে তোর যে ভারি কষ্ট হবে সাগর, এখানে ত কোথাও দাঁড়াবার য়্যায়গা নেই।

সাগর কহিল, নাই থাক্‌ল মা। রাত বেশী নেই, পহর দুই জলে ভিজ্‌লে আমাদের অসুখ করেনা।

বাস্তবিক, ইহার কোন প্রতিকারও ছিলনা, তাই, আবার কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া ষোড়শী অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিল। কহিল, আচ্ছা, তোরা কি সব সত্যিই মনে করেছিস্ জমিদারের পিয়াদারা আমাকে সেদিন বাড়ী থেকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছিল?

সাগর অনুতপ্ত স্বরে কহিল, কি করবে মা, তুমি যে একলা মেয়ে-মানুষ। এ পাড়ায় মানুষ বল্‌তেও কেউ নেই, আমরা খুড়ো ভাইপোও সেদিন হাটে গিয়ে তখনও ফির্‌তে পারিনি। নইলে সাধ্য কি মা, তোমার গায়ে কেউ হাত দেয়।

ষোড়শী মনে মনে বুঝিল এ আলোচনাও ঠিক হইতেছেনা, কথায় কথায় হয়ত কি একটা শুনিতে হইবে; কিন্তু থামিতেও পারিলনা, কহিল, তাদের কত লোকজন, তোরা দুটিতে থাক্‌লেই কি আট্‌কাতে পারতিস্?

বাহিরে হইতে সাগর মুখে একটা অস্ফুট ধ্বনি করিয়া বলিল, কি হবে মা আর মনের দুঃখ বাড়িয়ে। হুজুরও এয়েছেন, আমরাও জানি সব। মায়ের কৃপায় আবার যদি কখন দিন আসে, তখন তার জবাব দেব। তুমি মনে কোরোনা মা, হর খুড়ো বুড়ো হয়েচে বলে মরে গেছে। তাকে জানতো মাতু ভৈরবী, তাকে জানে শিরোমণি ঠাকুর। জমিদারের পাইক-পিয়াদা বহুত আছে তাও জানি, গরীব বলে আমাদের দুঃখও তারা কম দেয়নি সেও মনে আছে,—ছোটলোক আমরা নিজেদের জন্যে ভাবিনে—কিন্তু তোমার হুকুম হলে মা ভৈরবীর গায়ে হাত দেবার শোধ দিতে পারি। গলায় দড়ি বেঁধে টেনে এনে ওই

হুজুরকেই রাতারাতি মায়ের স্থানে বলি দিতে পারি মা, কোন শালা আট্‌কাবেনা!

ষোড়শী মনে মনে শিহরিয়া কহিল, বলিস্ কি সাগর, তোরা এমন নিষ্ঠুর, এমন ভয়ঙ্কর হতে পারিস্? এইটুকুর জন্যে একটা মানুষ খুন করবার ইচ্ছে হয় তোদের!

সাগর কহিল, এইটুকু! কেবল এইটুকুর জন্যেই কি আজ তোমার এই দশা! জমিদার এসেছে শুনে খুড়ো যেন জল্‌তে লাগ্‌ল। তুমি ভেবোনা মা, আবার যদি কিছু একটা হয়, তখন সেও কেবল এইটুকুতেই থেমে থাক্‌বে!

ষোড়শী কহিল, হাঁরে সাগর, তুই কখনো গুরুমশায়ের পাঠশালে পড়েছিলি? বাহিরে বসিয়া সাগর যেন লজ্জিত হইয়া উঠিল, বলিল, তোমার আশীর্ব্বাদে অম্‌নি একটু রামায়ণ মহাভারত নাড়তে-চাড়তে পারি। কিন্তু এ কথা কেন জিজ্ঞেসা করলে মা?

ষোড়শী বলিল, তোর কথা শুন্‌লে মনে হয় খুড়ো তোর না বুঝতেও পারে, কিন্তু তুই বুঝতে পারবি। সেদিন আমাকে কেউ ধরে নিয়ে যায়নি সাগর, কেউ আমার গায়ে হাত দেয়নি, আমি কেবল রাগের মাথায় আপনি চলে গিয়েছিলাম।

সাগর কহিল, সে আমরাও শুনেছি, কিন্তু সারারাত যে ঘরে ফিরতে পারলেনা মা, সেও কি রাগ করে?

ষোড়শী এ প্রশ্নের ঠিক উত্তরটা এড়াইয়া গিয়া কহিল, কিন্তু যে জন্যে তোদের এত রাগ, সে দশা আমার ত আমি নিজেই করেচি। আমি ত নিজের ইচ্ছেতেই বাবাকে বাড়ী ছেড়ে দিয়ে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েচি।

সাগর কহিল, কিন্তু এতকাল ত এ আশ্রয় নেবার ইচ্ছে হয়নি মা। একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া অকস্মাৎ তাহার কণ্ঠস্বর যেন উগ্র ও উত্তপ্ত হইয়া উঠিল; কহিল, তারাদাস ঠাকুরের ওপরও আমাদের রাগ নেই, রায় মশায়কেও আমরা কেউ কিছু বল্‌বনা, কিন্তু জমিদারকে আমরা সুবিধে পেলে সহজে ছাড়্‌বনা। জান মা আমাদের বিপিনের সে কি করেছে? সে বাড়ী ছিলনা,—তার লোকজন তার ঘরে ঢুকে—

ষোড়শী তাড়াতাড়ি তাহাকে থামাইয়া দিয়া কহিল, থাক্ সাগর, ও সব খবর আর তোরা আমাকে শোনাস্‌নে।

সাগর চুপ করিল, ষোড়শী নিজেও বহুক্ষণ পর্য্যন্ত আর কোন প্রশ্ন করিলনা। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সাগর পুনরায় যখন কথা কহিল, তাহার কণ্ঠস্বরে গূঢ় বিস্ময়ের আভাস ষোড়শী স্পষ্ট অনুভব করিল। সাগর কহিল, মা, আমরা তোমার প্রজা, আমাদের দুঃখ তুমি না শুন্‌লে শুন্‌বে কে?

ষোড়শী কহিল, কিন্তু শুনেও ত অতবড় জমিদারের বিরুদ্ধে আমি প্রতিকার কর্‌তে পারবনা বাছা।

সাগর কহিল, একবার ত করেছিলে। আবার যদি দরকার হয়, তুমিই পারবে। তুমি না পারলে আমাদের রক্ষে করতে কেউ নেই মা।

ষোড়শী বলিল, নতুন ভৈরবী যদি কেউ হয় তাকেই তোদের দুঃখ জানাস্।

সাগর চমকিয়া কহিল, তা'হলে তুমি কি আমাদের সত্যিই ছেড়ে যাবে মা? গ্রামশুদ্ধ সবাই যে বলাবলি করচে—সে সহসা থামিল, কিন্তু ষোড়শী নিজেও এ প্রশ্নের হঠাৎ উত্তর দিতে পারিলনা। কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল, দেখ্ সাগর, তোদের কাছে এ কথা তুলতে আমার লজ্জায় মাথা কাটা যায়। কিন্তু আমার সম্বন্ধে সব ত শুনেছিস্?

গ্রামের আরও দশজনের মত তোরা নিজেও দেখ্‌চি বিশ্বাস করেছিস্‌,—তার পরেও কি তোরা আমাকেই মায়ের ভৈরবী করে রাখতে চাস্‌ রে?

বাহিরে বসিয়া সাগর আস্তে আস্তে উত্তর দিল, অনেক কথাই শুনি মা, এবং আরও দশজনের মত আমরাও ভেবে পাইনে কেনই বা তুমি সে রাত্রে ঘরে ফিরলেনা, আর কেনই বা সকালবেলা সাহেবের হাত থেকে হুজুরকে বাঁচালে। কিন্তু সে যাই হোক্‌ মা, আমরা ক'ঘর ছোট-জাত ভূমিজ তোমাকেই মা বলে জেনেছি ; যেখানেই যাও, আমরাও সঙ্গে যাব। কিন্তু যাবার আগে একবার জানিয়ে দিয়ে যাব।

ষোড়শী কহিল, কিন্তু তোরা ত আমার প্রজা নয়, মা চণ্ডীর প্রজা। আমার মত মায়ের দাসী কত হয়ে গেছে, কত হবে। তার জন্যে তোরা কেনই বা ঘর-দোর ছেড়ে যাবি, কেনই বা উপদ্রব অশান্তি ঘটাবি? এমন ত হতে পারে, আমার নিজেরই আর এ সমস্ত ভাল লাগ্‌চেনা!

সাগর সবিস্ময়ে কহিল, ভাল লাগ্‌চেনা?

ষোড়শী বলিল, আশ্চর্য্য কি সাগর? মানুষের মন কি বদলায়না?

এবার প্রত্যুত্তরে লোকটি কেবল একটা হুঁ, বলিয়াই খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, কিন্তু রাত আর বেশী বাকী নেই মা, আকাশে মেঘও কেটে যাচ্ছে. এইবার তুমি একটু ঘুমোও।

ষোড়শীর নিজেরও এ সকল আলোচনা ভাল লাগিতেছিলনা, তাহাতে সে অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সাগরের কথায় আর দ্বিরুক্তি মাত্র না করিয়া চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িল। কিন্তু সে চক্ষে ঘুম যতক্ষণ না আসিল, কেবল ঘুরিয়া ফিরিয়া উহারই কথাগুলা তাহার মনে হইতে লাগিল। এই যে লোকটি বিনিদ্র চক্ষে বাহিরে বসিয়া রহিল, তাহাকে সে ছেলেবেলা হইতেই দেখিয়া আসিয়াছে ; ইতর ও অন্ত্যজ বলিয়া এতদিন শুধু তুচ্ছ

ও ছোট কাজেই লাগিয়াছে, কোন দিন কোন সম্মানের স্থান পায় নাই, আলাপ করিবার কল্পনা ত কাহারও স্বপ্নেও উঠে নাই,—কিন্তু আজ এই দুঃখের রাত্রে জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে মুখ দিয়া তাহার অনেক কথাই বাহির হইয়া গেছে, এবং তাহার ভালমন্দ হিসাব করিবার দিন হয়ত একদিন আসিতেও পারে ; কিন্তু শ্রোতা হিসাবে এই ছোটলোকটিকে সে একান্ত ছোট বলিয়া আজ কিছুতেই ভাবিতে পারিলনা।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙ্গিলে দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া দেখিল সকাল আর নাই—ঢের বেলা হইয়াছে ; এবং অনতিদূরে অনেকগুলা লোক মিলিয়া তাহারই রুদ্ধ দরজার প্রতি চাহিয়া কি যেন একটা তামাসার প্রতীক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কোথাও এতটুকু পর্দ্দা, এতটুকু আব্রু নাই। সহসা মনে হইল তৎক্ষণাৎ দ্বার বন্ধ না করিয়া দিলে এই লোকগুলার উৎসুক দৃষ্টি হইতে বুঝি সে বাঁচিবেনা। এই ক্ষুদ্র গৃহটুকু যত জীর্ণ যত ভগ্নই হোক আত্মরক্ষা করিবার এ ছাড়া আর বুঝি সংসারে দ্বিতীয় স্থান নাই।

এবং ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই দেখিতে পাইল ভিড় ঠেলিয়া এককড়ি নন্দী তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সবিনয়ে কহিল, গ্রামে হুজুর পদার্পণ করেছেন, শুনেছেন বোধ হয়।

জমিদারের গোমস্তা এই এককড়ি ইতিপূর্ব্বে কোনদিন তাহাকে 'আপনি' বলিয়া সম্বোধন করে নাই। তাহার বিনয়, তাহার এই সম্ভাষণের পরিবর্ত্তন ষোড়শীকে যেন বিদ্ধ করিল, কিন্তু, কিছু একটা জবাব দিবার পূর্ব্বেই সে পুনশ্চ সসম্ভ্রমে কহিল, হুজুর একবার আপনাকে স্মরণ করেছেন।

কোথায়?

এই যে কাছারী-বাড়ীতে। সকাল থেকে এসেই প্রজার নালিশ শুন্‌চেন। যদি অনুমতি করেন ত পাল্‌কি আন্‌তে পাঠিয়ে দিই।

সকলে হাঁ করিয়া শুনিতেছিল; ষোড়শীর মনে হইল তাহারা যেন এই কথায় হাসি চাপিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহার ভিতরটা অগ্নি-কাণ্ডের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু মুহূর্ত্তে আত্মসম্বরণ করিয়া কহিল, এটা তাঁর প্রস্তাব, না তোমার সুবিবেচনা এককড়ি?

এককড়ি সসম্ভ্রমে বলিল, আজ্ঞে, আমি ত চাকর, এ হুজুরের স্বয়ং আদেশ।

ষোড়শী হাসিয়া কহিল, তোমার হুজুরের কপাল ভাল। জেলের ঘানি টানার বদলে পাল্‌কি চড়ে বেড়াচ্ছেন, তাও আবার শুধু স্বয়ং নয়, পরের জন্যেও ব্যবস্থা করচেন। কিন্তু বলগে এককড়ি, আমার পাল্‌কি চড়বার ফুরসৎ নেই,—আমার ঢের কাজ।

এককড়ি কহিল, ও-বেলায় কিম্বা কাল সকালেও কি একটু সময় পাবেননা?

ষোড়শী কহিল, না।

এককড়ি কহিল, কিন্তু হলে যে ভাল হোতো। আর দশজন প্রজার যে নালিশ আছে?

ষোড়শী কঠোর স্বরে উত্তর দিল, বিচার করবার মত বিদ্যে-বুদ্ধি থাকে ত তাঁর নিজের প্রজার করুনগে। কিন্তু আমি তোমার হুজুরের প্রজা নই, আমার বিচার করবার জন্যে রাজার আদালত আছে। এই বলিয়া সে হাতের গামছাটা কাঁধের উপর ফেলিয়া পুষ্করিণীর উদ্দেশে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

জমিদারের নিভৃত নিবাস সাজাইতে গুছাইতে দিনচারেক গিয়াছে ; জনশ্রুতি এইরূপ যে হুজুর এবার একাদিক্রমে মাস দুই চণ্ডীগড়ে বিশ্রাম করিয়া যাইবেন। আজ সকাল বেলাতেই উত্তরদিকের বড় হলটায় মজ্‌লিস বসিয়াছিল। ঘর-জোড়া কার্পেট পাতা, তাহার উপরে সাদা জাজিম বিছানো, এবং মাঝে মাঝে দুই-চারিটা মোটা তাকিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। গৃহের একধারে আজ গ্রামের মাতব্বরেরা বার দিয়া বসিয়াছিলেন,—জমিদারের কাছে তাঁহাদের মস্ত নালিশ ছিল। রায় মহাশয় ছিলেন, শিরোমণি ছিলেন, ঘোষজা ছিলেন, বোসজা ছিলেন, এমন কি তারাদাস ঠাকুরও ইঁহাদের আড়ালে মুখ নীচু করিয়া ও কাণ খাড়া করিয়া সতর্ক হইয়া বসিয়া ছিলেন। আরও যাঁহারা যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদের কেহই যদিচ অবহেলার বস্তু নহেন, তবুও ইঁহাদের নাম ধাম ও বিবরণ সবিস্তারে লিপিত না হইলেও পাঠকের জীবন দুর্ভর হইয়া উঠিবে না বিবেচনা করিয়াই তাহাতে নিরস্ত হইলাম। যাই হোক, ইঁহাদের সমবেত চেষ্টায় অভিযোগের ভূমিকাটা একপ্রকার শেষ হইয়া গেলেও আসল কথাটা উঠি-উঠি করিয়াও থামিয়া যাইতেছিল,—ঠিক যেন মুখে আসিয়াও কাহারও বাহির হইতে চাহিতেছিলনা। জীবানন্দ চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। সকলের সঙ্গে থাকিয়াও একটুখানি দূরে একটা তাকিয়ার উপর দুই কনুয়ের ভর দিয়া বসিয়া তিনি মন দিয়াই যেন সমস্ত শুনিতেছিলেন। মুখ প্রফুল্ল। একেবারে স্বাভাবিক না হইলেও সম্পূর্ণ কৃত্রিম বলিয়াও সন্দেহ হয়না। খুব সম্ভব মদের ফেনা তখনও তাঁহার মগজের সমস্ত অলি-গলি দখল করিয়া

বসে নাই। সুমুখের বড় বড় খোলা দরজা দিয়া বারুইয়ের শুক্না বালু ও ভিজা মাটির গন্ধ বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল, এবং পাশের ঘরটাতেই বোধ করি রান্না হইতেছিল বলিয়া তাহারই রুদ্ধ দ্বারের কোন্ একটা ফাঁক দিয়া একজাতীয় শব্দ ও গন্ধ মাঝে মাঝে এই বাতাসেই ভর দিয়া লোকের কানে ও নাকে আসিয়া পৌঁছিতেছিল, তাহা ব্যক্তিবিশেষের কাছে উপাদেয় ও রুচিকর হইলেও শিরোমণি মহাশয় চঞ্চল হইয়া উঠিতে-ছিলেন। হঠাৎ তিনি বার দুই কাসিয়া ও উত্তরীয়-প্রান্তে নাকের ডগাটা মার্জ্জনা করিয়া উঠিয়া গিয়া আর একধারে বসিতেই জীবানন্দ সহাস্যে কহিলেন, শিরোমণি মশায়ের কি অর্দ্ধভোজন হয়ে গেল না কি?

অনেকেই হাসিয়া উঠিল, শিরোমণির নাকের ডগার মত মুখখানাও রাঙা হইয়া উঠিল। জীবানন্দ তখন হাসিয়া বলিলেন, ভয় নেই ঠাকুর, জাত যাবেনা। ওটা আপনাদের মা চণ্ডীরই মহাপ্রসাদ। তবে, যিনি রাঁধচেন তাঁর গোত্রটা ঠিক জানিনে,—হয়ত এক না হতেও পারে।

শিরোমণি আপনাকে কতকটা সামলাইয়া লইয়া কহিলেন, তা হোক্ তা হোক্। ব্রাহ্মণ পাচক,—দরিদ্র হলেও গোত্র একটা আছে বই কি।

জীবানন্দ হাঃ হাঃ করিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া কহিল, জানিনে ঠাকুর, ও সব বালাই ওর কিছু আছে কি না। কিন্তু হাতা-বেড়ির সঙ্গে মিলে সোণার চুড়ির আওয়াজটাও আমার বড় মিঠে লাগে। আর সেই হাতে পরিবেশন করলে—তা নিমন্ত্রণ করলে ত আর—এই বলিয়া তিনি পুনশ্চ প্রবল হাসির শব্দে ঘর ভরিয়া দিলেন। শিরোমণি অধোবদন হইলেন, এবং ভিতরের কদর্য্য ব্যাপার যদিচ সকলেই জানিতেন, তথাপি এই অভাবনীয় প্রকাশ্য নির্ল্লজ্জতায় উপস্থিত কেহই লোকটার মুখের প্রতি সহসা চাহিতে পর্য্যন্ত পারিলনা।

হাসি থামিলে তিনি কহিলেন, সদালাপ ত হল। এবং দয়া করে মাঝে মাঝে এলে এমন আরও ঢের হতে পারবে, কিন্তু আপনাদের নালিশটা কি শুনি?

কিন্তু উত্তরে কাহারও মুখে কথা ফুটিলনা, সকলে যেমন নীরবে বসিয়াছিল, তেমনি নীরবে বসিয়া রহিল।

জীবানন্দ কহিলেন, বল্‌তে কি আপনাদের লজ্জা বোধ হচ্চে?

এবার রায় মহাশয় মুখ তুলিয়া চাহিলেন; বলিলেন, নন্দী মশায় ত সমস্ত জানেন, তিনি কি হুজুরের গোচর করেন নি?

জীবানন্দ কহিলেন, হয়ত করেচেন কিন্তু আমার মনে নেই। তা ছাড়া তার গোচর করার প্রতি খুব বেশী আস্থা না রেখে ব্যাপারটা আপনারাই বলুন। দ্বিরুক্তি দোষ ঘট্‌তে পারে, কিন্তু কি আর করা যাবে। জমিদারের গোমস্তা—একটু মোকাবিলে হয়ে থাকা ভাল। ঠিক না?

প্রভুর মুখে এককড়ির এই সুখ্যাতিটুকুতে রায় মহাশয় মনে মনে আনন্দ লাভ করিলেন। কিন্তু চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া পরম গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিলেন, হুজুর সর্ব্বজ্ঞ। ভৃত্যের সম্বন্ধে যথা ইচ্ছা আদেশ করতে পারেন, কিন্তু, আমাদের অভিযোগ—

কি অভিযোগ?

জনার্দ্দন রায় কহিলেন, আমরা গ্রামস্থ ষোলআনা ইতর ভদ্র একত্র হয়ে—

জীবানন্দ একটু হাসিয়া বলিলেন, তা দেখতে পাচ্ছি। ওইটি কি সেই ভৈরবীর বাপ তারাদাস ঠাকুর নয়? এই বলিয়া তিনি তাহার প্রতি অঙ্গুলি সঙ্কেত করিলেন। তারাদাস সাড়া দিলনা, জাজিমটার অংশবিশেষের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। এবং রায়

মহাশয়ের আনত মুখের পরেও একটা ফ্যাকাসে ছায়া পড়িল। কিন্তু মুখ রক্ষা করিলেন, শিরোমণি ঠাকুর। তিনি সবিনয়ে কহিলেন, রাজার কাছে প্রজা সন্তানতুল্য, তা সে দোষ করলেও সন্তান, না করলেও সন্তান। আর কথাটা একরকম ওরই। ওর কন্যা ষোড়শীর সম্বন্ধে আমরা নিশ্চয় স্থির করেছি, তাকে আর মহাদেবীর ভৈরবী রাখা যেতে পারেনা। আমাদের নিবেদন, হুজুর, তাকে সেবায়েতের কাজ থেকে অব্যাহতি দেবার আদেশ করুন।

জমিদার চকিত হইয়া উঠিলেন ; কহিলেন, কেন ? তার অপরাধ ?

দুই তিন জন প্রায় সমস্বরে জবাব দিয়া ফেলিল, অপরাধ অতিশয় গুরুতর।

জীবানন্দ একে একে তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া অবশেষে জনার্দ্দনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, তিনি হঠাৎ এমন কি ভয়ানক দোষ করেছেন রায়মশায়, যার জন্যে তাঁকে তাড়ানো আবশ্যক ?

জনার্দ্দন মুখ তুলিয়া শিরোমণিকে চোখের ইঙ্গিত করিতেই জীবানন্দ বাধা দিয়া কহিলেন, না না, উনি অনেক পরিশ্রম করেছেন, বুড়োমানুষকে আর কষ্ট দিয়ে কাজ নেই, ব্যাপারটা আপনিই ব্যক্ত করুন।

রায় মহাশয়ের চোখে ও মুখে দ্বিধা ও অত্যন্ত সঙ্কোচ প্রকাশ পাইল ; মৃদু কণ্ঠে কহিলেন, ব্রাহ্মণ-কন্যা,—এ আদেশ আমাকে করবেন না।

জীবানন্দ হাসিমুখে কহিলেন, দেব-দ্বিজে আপনার অচলা ভক্তির কথা এদিকে কারও অবিদিত নেই। কিন্তু এতগুলি ইতর-ভদ্রকে নিয়ে আপনি নিজে যখন উপস্থিত হয়েছেন, তখন ব্যাপার যে অতিশয় গুরুতর তা আমার বিশ্বাস হয়েছে। কিন্তু সেটা আপনার মুখ থেকেই শুন্‌তে চাই।

কিন্তু জনার্দ্দন রায় অত সহজে ভুল করিবার লোক নহেন ; প্রত্যুত্তরে

তিনি শিরোমণির প্রতি একটা ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, হুজুর যখন নিজে শুনতে চাচ্চেন তখন আর ভয় কি ঠাকুর? নির্ভয়ে জানিয়ে দিন্ না।

খোঁচা খাইয়া বৃদ্ধ শিরোমণি হঠাৎ ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, সত্যি কথায় ভয় কিসের জনার্দ্দন? তারাদাসের মেয়েকে আর আমরা কেউ ভৈরবী রাখ্‌বনা হুজুর!—তার স্বভাব-চরিত্র ভারি মন্দ হয়ে গেছে,—এই আপনাকে আমরা জানিয়ে দিচ্চি।

জীবানন্দের পরিহাস-দীপ্ত প্রফুল্ল মুখ অকস্মাৎ গম্ভীর ও কঠিন হইয়া উঠিল; একমুহূর্ত্ত নিঃশব্দে থাকিয়া ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিলেন, তাঁর স্বভাব-চরিত্র মন্দ হবার খবর আপনারা নিশ্চয় জেনেছেন?

তৎক্ষণাৎ অনেকেই একবাক্যে বলিয়া উঠিল যে ইহাতে কাহারও কোন সংশয় নাই—এ কথা গ্রামশুদ্ধ সবাই জানিয়াছে। জনার্দ্দন মুখে কিছু না কহিলেও চুপ করিয়া মাথা নাড়িতে লাগিলেন। জীবানন্দ আবার ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া তাঁহারই মুখের প্রতি চাহিয়া কহিলেন, তাই সুবিচারের আশায় বেছে-বেছে একেবারে ভীষ্মদেবের কাছে এসে পড়েছেন রায় মশায়? বিশেষ সুবিধে হবে বলে ভরসা হয়না।

এ কথার ইঙ্গিত সকলে বুঝিল কি না সন্দেহ, কিন্তু জনার্দ্দন এবং শিরোমণি বুঝিলেন। জনার্দ্দন মৌন হইয়া রহিলেন, কিন্তু শিরোমণি জবাব দিলেন; বলিলেন, আপনি দেশের রাজা,—সুবিচার বলুন অবিচার বলুন আপনাকেই করতে হবে। আমাদের তাই মাথা পেতে নিতে হবে। সমস্ত চণ্ডীগড় ত আপনারই।

কথা শুনিয়া জীবানন্দের মুখের ভাব একটু সহজ হইয়া আসিল; মুচকিয়া হাসিয়া করিলেন, দেখুন শিরোমণি মশায়, অতি-বিনয়ে আপনাদের

খুব হেঁট হয়ে কাজ নেই, অতি-গৌরবে আমাকেও আকাশে তোলবার আবশ্যক নাই। আমি শুধু জান্‌তে চাই এ অভিযোগ কি সত্য?

আগ্রহে রায় মহাশয়ের মুখ আশান্বিত হইয়া উঠিল, শিরোমণি ত একেবারে চঞ্চল হইয়া উঠিলেন; কহিলেন, অভিযোগ? সত্য কি না!—আচ্ছা, আমরা না হয় পর, কিন্তু, তারাদাস! তুমিই বল ত। রাজদ্বার! যথাধর্ম্ম বোলো—

তারাদাস একবার পাংশু, একবার রাঙা হইয়া উঠিতে লাগিল, কিন্তু উপস্থিত সকলের একাগ্র দৃষ্টি খোঁচা দিয়া যেন তাহাকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। সে একবার ঢোক গিলিয়া, একবার কণ্ঠের জড়িমা সাফ করিয়া অবশেষে মরিয়ার মত বলিয়া উঠিল, হুজুর—

জীবানন্দ চক্ষের নিমিষে হাত তুলিয়া তাহাকে থামাইয়া দিয়া কহিলেন, থাক্। ওর মুখ থেকে ওর নিজের মেয়ের কাহিনী আমি যথাধর্ম্ম বল্‌লেও শুন্‌বনা। বরঞ্চ আপনাদের কেউ পারেন ত যথাধর্ম্ম বলুন।

সভা পুনশ্চ নীরব হইল, কিন্তু এবার সেই নীরবতার মধ্যে হইতে অস্ফুট উদ্যম পরিস্ফুট হইবার লক্ষণ দেখা দিল। পাশের দরজা খুলিয়া বেহারা টম্‌ব্লার ভরিয়া হুইস্কি ও সোডা প্রভুর হাতে আনিয়া দিল: তিনি এক নিঃশ্বাসে তাহা নিঃশেষে পান করিয়া ভৃত্যের হাতে ফিরাইয়া দিয়া কহিলেন, আঃ—বাঁচলাম। একটু হাসিয়া কহিলেন, সকাল বেলাতেই আপনাদের বাক্য-সুধা পান করে তেষ্টায় বুক পর্য্যন্ত কাঠ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু চুপ্ চাপ্ যে! কি হল আপনাদের যথাধর্ম্মের?

শিরোমণি হতবুদ্ধি হইয়া বলিয়া উঠিলেন, এই যে বলি হুজুর। আমি যথাধর্ম্মই বল্‌ব।

জীবানন্দ ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, সম্ভব বটে। আপনি শাস্ত্রজ্ঞ প্রবীণ

ব্রাহ্মণ, কিন্তু, একজন স্ত্রীলোকের নষ্ট-চরিত্রের কাহিনী তার অসাক্ষাতে বলার মধ্যে আপনার যথাধর্ম্মের যথাটা যদি বা থাকে, ধর্ম্মটা থাকবে কি ? আমার নিজের বিশেষ কোন আপত্তি নেই,—ধর্ম্মাধর্ম্মের বালাই আমার বহুদিন ঘুচে গেছে,—তবু আমি বলি ওতে কাজ নেই ! বরঞ্চ আমি যা জিজ্ঞাসা করি তার জবাব দিন। বর্ত্তমান ভৈরবীকে আপনারা তাড়াতে চান,—এই না ?

সবাই একযোগে মাথা নাড়িয়া জানাইল ঠিক তাই।

এঁকে নিয়ে আর সুবিধে হচ্চেনা ?

জনার্দ্দন প্রতিবাদের ভঙ্গীতে মাথা তুলিয়া কহিলেন, সুবিধে অসুবিধে কি হুজুর, গ্রামের ভালোর জন্যেই প্রয়োজন।

জীবানন্দ হঠাৎ হাসিয়া ফেলিয়া বলিলেন, অর্থাৎ গ্রামের ভালমন্দের আলোচনা না তুলেও এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে আপনার নিজের ভালমন্দ কিছু একটা আছেই। তাড়াবার আমার ক্ষমতা আছে কি না জানিনে, কিন্তু আপত্তি বিশেষ নেই। কিন্তু আর কোন একটা অজুহাত তৈরি করা যায়না ? দেখুননা চেষ্টা করে। বরঞ্চ, আমাদের এককড়িটিকেও না হয় সঙ্গে নিন, এ বিষয়ে তার বেশ একটু সুনাম আছে।

কথা শুনিয়া সকলে অবাক্ হইয়া গেল। হুজুর একটু থামিয়া কহিলেন, এঁদের সতী-পনার কাহিনী অত্যন্ত প্রাচীন এবং প্রসিদ্ধ, সুতরাং তাকে আর নাড়া-চাড়া করে কাজ নেই। ভৈরবী থাক্‌লেই ভৈরব এসে জোটে এবং ভৈরবদেরও ভৈরবী নইলে চলেনা, এ অতি সনাতন প্রথা,—সহজে টলানো যাবেনা ! দেশশুদ্ধ ভক্তের দল চটে যাবে, হয়ত বা দেবী নিজেও খুসী হবেননা,—একটা হাঙ্গামা বেধে যাবে। মাতঙ্গী ভৈরবীর গোটা পাঁচেক ভৈরব ছিল, এবং তাঁর পূর্ব্বে যিনি ছিলেন তাঁর না কি হাতে

খুব হেঁট হয়ে কাজ নেই, অতি-গৌরবে আমাকেও আকাশে তোলবার আবশ্যক নাই। আমি শুধু জান্‌তে চাই এ অভিযোগ কি সত্য ?

আগ্রহে রায় মহাশয়ের মুখ আশান্বিত হইয়া উঠিল, শিরোমণি ত একেবারে চঞ্চল হইয়া উঠিলেন ; কহিলেন, অভিযোগ ? সত্য কি না !—আচ্ছা, আমরা না হয় পর, কিন্তু, তারাদাস ! তুমিই বল ত। রাজদ্বার ! যথাধর্ম্ম বোলো—

তারাদাস একবার পাংশু, একবার রাঙা হইয়া উঠিতে লাগিল, কিন্তু উপস্থিত সকলের একাগ্র দৃষ্টি খোঁচা দিয়া যেন তাহাকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। সে একবার ঢোক গিলিয়া, একবার কণ্ঠের জড়িমা সাফ করিয়া অবশেষে মরিয়ার মত বলিয়া উঠিল, হুজুর—

জীবানন্দ চক্ষের নিমিষে হাত তুলিয়া তাহাকে থামাইয়া দিয়া কহিলেন, থাক্‌। ওর মুখ থেকে ওর নিজের মেয়ের কাহিনী আমি যথাধর্ম্ম বল্‌লেও শুন্‌বনা। বরঞ্চ আপনাদের কেউ পারেন ত যথাধর্ম্ম বলুন।

সভা পুনশ্চ নীরব হইল, কিন্তু এবার সেই নীরবতার মধ্যে হইতে অস্ফুট উদ্যম পরিস্ফুট হইবার লক্ষণ দেখা দিল। পাশের দরজা খুলিয়া বেহারা টম্ব্লার ভরিয়া হুইস্কি ও সোডা প্রভুর হাতে আনিয়া দিল : তিনি এক নিঃশ্বাসে তাহা নিঃশেষে পান করিয়া ভৃত্যের হাতে ফিরাইয়া দিয়া কহিলেন, আঃ—বাঁচলাম। একটু হাসিয়া কহিলেন, সকাল বেলাতেই আপনাদের বাক্য-সুধা পান করে তেষ্টায় বুক পর্য্যন্ত কাঠ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু চুপ্‌ চাপ্‌ যে ! কি হল আপনাদের যথাধর্ম্মের ?

শিরোমণি হতবুদ্ধি হইয়া বলিয়া উঠিলেন, এই যে বলি হুজুর। আমি যথাধর্ম্মই বল্‌ব ;

জীবানন্দ ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, সম্ভব বটে। আপনি শাস্ত্রজ্ঞ প্রবীণ

ব্রাহ্মণ, কিন্তু, একজন স্ত্রীলোকের নষ্ট-চরিত্রের কাহিনী তার অসাক্ষাতে বলার মধ্যে আপনার যথাধর্ম্মের যথাটা যদি বা থাকে, ধর্ম্মটা থাকবে কি? আমার নিজের বিশেষ কোন আপত্তি নেই,—ধর্ম্মাধর্ম্মের বালাই আমার বহুদিন ঘুচে গেছে,—তবু আমি বলি ওতে কাজ নেই! বরঞ্চ আমি যা জিজ্ঞাসা করি তার জবাব দিন। বর্ত্তমান ভৈরবীকে আপনারা তাড়াতে চান,—এই না?

সবাই একযোগে মাথা নাড়িয়া জানাইল ঠিক তাই।

এঁকে নিয়ে আর সুবিধে হচ্চেনা?

জনার্দ্দন প্রতিবাদের ভঙ্গীতে মাথা তুলিয়া কহিলেন, সুবিধে অসুবিধে কি হুজুর, গ্রামের ভালোর জন্যেই প্রয়োজন।

জীবানন্দ হঠাৎ হাসিয়া ফেলিয়া বলিলেন, অর্থাৎ গ্রামের ভালমন্দের আলোচনা না তুলেও এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে আপনার নিজের ভালমন্দ কিছু একটা আছেই। তাড়াবার আমার ক্ষমতা আছে কি না জানিনে, কিন্তু আপত্তি বিশেষ নেই। কিন্তু আর কোন একটা অজুহাত তৈরি করা যায়না? দেখুননা চেষ্টা করে। বরঞ্চ, আমাদের এককড়িটিকেও না হয় সঙ্গে নিন, এ বিষয়ে তার বেশ একটু সুনাম আছে।

কথা শুনিয়া সকলে অবাক্ হইয়া গেল। হুজুর একটু থামিয়া কহিলেন, এঁদের সতী-পনার কাহিনী অত্যন্ত প্রাচীন এবং প্রসিদ্ধ, সুতরাং তাকে আর নাড়া-চাড়া করে কাজ নেই। ভৈরবী থাক্‌লেই ভৈরব এসে জোটে এবং ভৈরবদেরও ভৈরবী নইলে চলেনা, এ অতি সনাতন প্রথা,—সহজে টলানো যাবেনা! দেশশুদ্ধ ভক্তের দল চটে যাবে, হয়ত বা দেবী নিজেও খুসী হবেননা,—একটা হাঙ্গামা বেধে যাবে। মাতঙ্গী ভৈরবীর গোটা পাঁচেক ভৈরব ছিল, এবং তাঁর পূর্ব্বে যিনি ছিলেন তাঁর না কি হাতে

গোণা যেতোনা। কি বলেন শিরোমণি মশাই, আপনি ত এ অঞ্চলের প্রাচীন ব্যক্তি, জানেন ত সব? এই বলিয়া তিনি শিরোমণি অপেক্ষা রায় মহাশয়ের প্রতিই বিশেষ করিয়া কটাক্ষপাত করিলেন। এ প্রশ্নের কেহ উত্তর দিবে কি, সকলে যেন বুদ্ধি-বিহ্বল হইয়া গেল। জমিদারের কণ্ঠস্বর সোজা না বাঁকা, বক্তব্য সত্য না মিথ্যা, তাৎপর্য্য বিদ্রূপ না পরিহাস, তামাসা না তিরস্কার, কেহ ঠাহর করিতেই পারিল না।

সম্মুখের বারান্দা ঘুরিয়া একজন ভদ্রবেশধারী সৌখিন যুবক প্রবেশ করিল। হাতে তাঁর ইংরাজী বাঙ্গালা কয়েকখানা সংবাদপত্র এবং কতকগুলা খোলা চিঠিপত্র। জীবানন্দ দেখিয়া কহিলেন, কিহে প্রফুল্ল, এখানেও ডাকঘর আছে নাকি? আঃ—কবে এইগুলো সব উঠে যাবে।

প্রফুল্ল ঘাড় নাড়িয়া কহিল, সে ঠিক। গেলে আপনার সুবিধে হোতো। কিন্তু সে যখন হয়নি তখন এগুলো দেখবার কি এখন সময় হবে?

জীবানন্দ কিছুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ না করিয়া কহিলেন, না, এখনও হবেনা, অন্য সময়েও হবেনা। কিন্তু অনেকটা বাইরে থেকেই উপলব্ধি হচ্চে। ওই যে হীরালাল-মোহনলালের দোকানের ছাপ। পত্রখানি তাঁর উকিলের, না একেবারে আদালতের হে? ও খামখানা ত দেখ্চি সলোমন সাহেবের। বাবা, বিলিতি সুধার গন্ধ যেন কাগজ ফুঁড়ে বার হচ্চে। কি বলেন সাহেব, ডিক্রীজারি করবেন, না এই রাজবপুখানি নিয়ে টানা-হেঁচড়া করবেন—জানাচ্চেন? আঃ—সেকালের ব্রহ্মণ্য-তেজ কিছু বাকি থাক্তো, তো এই ইউদি ব্যাটাকে একেবারে ভস্ম করে দিতাম। মদের দেনা আর শুধ্‌তে হোতো না।

প্রফুল্ল ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, কি বল্চেন দাদা? থাক্ থাক্, আর এক সময়ে আলোচনা করা যাবে। এই বলিয়া সে ফিরিতে উদ্যত

হইতেই জীবানন্দ সহাস্যে কহিলেন, আরে লজ্জা কি ভায়া, এঁরা সব আপনার লোক, জ্ঞাত-গোষ্ঠী, এমন কি মণি-মানিক্যের এপিঠ ওপিঠ বল্‌লেও অত্যুক্তি হয়না। তা'ছাড়া তোমার দাদাটি যে কস্তুরি-মৃগ; সুগন্ধ আর কতকাল চেপে রাখ্‌বে ভাই। টাকা! টাকা! এর নালিশ আর তার নালিশ, অমুকের ডিক্রী আর তমুকের কিস্তিখেলাপ,—ও হে, ও তারাদাস, সে দিনটা নেহাৎ ফস্কে গিয়েছিল, কিন্তু হতাশ হয়োনা ঠাকুর, যা' করে তুলেচি, তাতে মনস্কামনা তোমার পূর্ণ হতে খুব বেশি বিলম্ব হবে বলে আশঙ্কা হয়না। প্রফুল্ল, রাগ কোরোনা ভায়া, আপনার বল্‌তে আর কাউকে বড় বাকি রাখিনি, কিন্তু এই চল্লিশটা বছরের অভ্যাস ছাড়তে পারবো বলেও ভরসা নেই, তার চেয়ে বরঞ্চ, নোট-টোট জাল কর্‌তে পারে এমন যদি কাউকে যোগাড় করে আন্‌তে পারতে হে—

প্রফুল্ল অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াও হাসিয়া ফেলিল, কহিল, দেখুন, সবাই আপনার কথা বুঝবেননা, সত্য ভেবে যদি কেউ—

জীবানন্দ গম্ভীর হইয়া কহিলেন, যদি কেউ সন্ধান করে আনেন? তা'হলে ত বেঁচে যাই প্রফুল্ল। রায় মশায়, আপনি ত শুনি অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি, আপনার জানাশুনা কি এমন কেউ—

রায় মহাশয় ম্লান মুখে অকস্মাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, বেলা হয়ে গেল, যদি অনুমতি করেন ত এখন আমরা আসি।

জীবানন্দ ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, বসুন, বসুন, নইলে প্রফুল্লের জাঁক বেড়ে যাবে। তাছাড়া ভৈরবীর কথাটাও শেষ হয়ে যাক্‌। কিন্তু, আমি যাও বল্‌লেই কি সে যাবে?

রায় মহাশয় না বসিয়াই সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, সে ভার আমাদের।

কিন্তু আর কাউকে ত বাহাল করা চাই। ও ত খালি থাকতে পারেনা।

এবার অনেকেই জবাব দিল, সে ভারও আমাদের।

জীবানন্দ নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, যাক্ বাঁচা গেল, এবার সে যাবেই। এতগুলো মানুষের নিঃশ্বাসের ভার একা ভৈরবী কেন, স্বয়ং মা চণ্ডীও সাম্‌লাতে পারবেননা, তা বোঝা গেল। আপনাদের লাভ লোকসান আপনারাই জানেন, কিন্তু আমার এমন অবস্থা যে টাকা পেলে আমার কিছুতেই আপত্তি নেই। নতুন বন্দোবস্তে আমার কিছু পাওয়া চাই। ভাল কথা, কেউ দেখ্‌ত রে, এককড়ি আছে না গেছে? কিন্তু গলাটা যে এদিকে শুকিয়ে একেবারে মরুভূমি হয়ে গেল।

বেহারা আসিয়া প্রভুর ব্যগ্র-ব্যাকুল শ্রীহস্তে পূর্ণ-পাত্র দিয়া খবর দিল, সে সদরে বসিয়া খাতা লিখিতেছে। হুজুরের আহ্বানে ক্ষণেক পরে এককড়ি আসিয়া যখন সসম্ভ্রমে এক পাশে দাঁড়াইল, জীবানন্দ শুষ্ক কণ্ঠ আর্দ্র করিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সে দিন ভৈরবীকে যে কাছারিতে তলব করেছিলাম, কেউ তাঁকে খবর দিয়েছিল?

এককড়ি কহিল, আমি নিজে দিয়েছিলাম।

তিনি এসেছিলেন?

আজ্ঞে না।

না কেন?

এককড়ি অধোমুখে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। জীবানন্দ উৎসুক হইয়া প্রশ্ন করিলেন, তিনি কখন আসবেন জানিয়েছিলেন?

এককড়ি তেমনি অধোমুখে থাকিয়াই অস্ফুট কণ্ঠে কহিল, এত লোকের সাম্‌নে আমি সে কথা হুজুরে পেশ করতে পারবনা।

জীবানন্দ হাতের শূন্য গ্লাসটা নামাইয়া রাখিয়া হঠাৎ কঠিন হইয়া বলিয়া উঠিলেন, এককড়ি, তোমার গোমস্তাগিরি কায়দাটা একটু ছাড়। তিনি আস্‌বেন, না, না?

না।

কেন?

এবার প্রত্যুত্তরে যদিচ এককড়ি তাহার জমিদারি কায়দাটা সম্পূর্ণ ছাড়িলনা, কিন্তু সবাই শুনিতে পায় এম্‌নি সুস্পষ্ট করিয়াই কহিল, তিনি আস্‌তে পারবেননা, এ কথা যত লোক দাঁড়িয়ে ছিল সবাই শুনেচে। বলেছিলেন, তোমার হুজুরকে বোলো এককড়ি, তাঁর বিচার করবার মত বিদ্যেবুদ্ধি থাকে ত নিজের প্রজাদের করুন গে। আমার বিচার কর্‌বার জন্যে আদালত খোলা আছে।

সহসা মনে হইল জমিদারের এতক্ষণের এত রহস্য এত সরল ঔদার্য্য, হাস্যোজ্জল মুখ ও তরল কণ্ঠস্বর চক্ষের পলকে নিবিয়া যেন অন্ধকার হইয়া গেল। ক্ষণকাল পরে শুধু আস্তে আস্তে কহিলেন, হুঁ। আচ্ছা তুমি যাও। প্রফুল্ল, সেই যে কি একটা চিনির কোম্পানি হাজার বিঘে জমি চেয়েছিল, তাদের কোন জবাব দিয়েছিলে?

আজ্ঞে, না।

তা'হলে লিখে দাও যে জমি তারা পাবে। দেরি কোরোনা।

না, দিচ্চি লিখে, এই বলিয়া সে এককড়িকে সঙ্গে লইয়া প্রস্থান করিল। আবার কিছুক্ষণের জন্য সমস্ত গৃহটা নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। শিরোমণি উঠিয়া দাঁড়াইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, আমরা আজ তা'হলে আসি?

আসুন।

কিন্তু আর কাউকে ত বাহাল করা চাই। ও ত খালি থাক্‌তে পারেনা।

এবার অনেকেই জবাব দিল, সে ভারও আমাদের।

জীবানন্দ নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, যাক্ বাঁচা গেল, এবার সে যাবেই। এতগুলো মানুষের নিঃশ্বাসের ভার একা ভৈরবী কেন, স্বয়ং মা চণ্ডীও সাম্‌লাতে পারবেননা, তা বোঝা গেল। আপনাদের লাভ লোকসান আপনারাই জানেন, কিন্তু আমার এমন অবস্থা যে টাকা পেলে আমার কিছুতেই আপত্তি নেই। নতুন বন্দোবস্তে আমার কিছু পাওয়া চাই। ভাল কথা, কেউ দেখ্‌ত রে, এককড়ি আছে না গেছে? কিন্তু গলাটা যে এদিকে শুকিয়ে একেবারে মরুভূমি হয়ে গেল।

বেহারা আসিয়া প্রভুর ব্যগ্র-ব্যাকুল শ্রীহস্তে পূর্ণ-পাত্র দিয়া খবর দিল, সে সদরে বসিয়া খাতা লিখিতেছে। হুজুরের আহ্বানে ক্ষণেক পরে এককড়ি আসিয়া যখন সসম্ভ্রমে এক পাশে দাঁড়াইল, জীবানন্দ শুষ্ক কণ্ঠ আর্দ্র করিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সে দিন ভৈরবীকে যে কাছারিতে তলব করেছিলাম, কেউ তাঁকে খবর দিয়েছিল?

এককড়ি কহিল, আমি নিজে দিয়েছিলাম।

তিনি এসেছিলেন?

আজ্ঞে না।

না কেন?

এককড়ি অধোমুখে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। জীবানন্দ উৎসুক হইয়া প্রশ্ন করিলেন, তিনি কখন আসবেন জানিয়েছিলেন?

এককড়ি তেমনি অধোমুখে থাকিয়াই অস্ফুট কণ্ঠে কহিল, এত লোকের সাম্‌নে আমি সে কথা হুজুরে পেশ করতে পারবনা।

জীবানন্দ হাতের শূন্য গ্লাসটা নামাইয়া রাখিয়া হঠাৎ কঠিন হইয়া বলিয়া উঠিলেন, এককড়ি, তোমার গোমস্তাগিরি কায়দাটা একটু ছাড়। তিনি আস্‌বেন, না, না ?

না।

কেন ?

এবার প্রত্যুত্তরে যদিচ এককড়ি তাহার জমিদারি কায়দাটা সম্পূর্ণ ছাড়িলনা, কিন্তু সবাই শুনিতে পায় এম্‌নি সুস্পষ্ট করিয়াই কহিল, তিনি আস্‌তে পারবেননা, এ কথা যত লোক দাঁড়িয়ে ছিল সবাই শুনেচে। বলেছিলেন, তোমার হুজুরকে বোলো এককড়ি, তাঁর বিচার করবার মত বিদ্যেবুদ্ধি থাকে ত নিজের প্রজাদের করুন গে। আমার বিচার কর্‌বার জন্যে আদালত খোলা আছে।

সহসা মনে হইল জমিদারের এতক্ষণের এত রহস্য এত সরল ঔদার্য্য, হাস্যোজ্জ্বল মুখ ও তরল কণ্ঠস্বর চক্ষের পলকে নিবিয়া যেন অন্ধকার হইয়া গেল। ক্ষণকাল পরে শুধু আস্তে আস্তে কহিলেন, হুঁ। আচ্ছা তুমি যাও। প্রফুল্ল, সেই যে কি একটা চিনির কোম্পানি হাজার বিঘে জমি চেয়েছিল, তাদের কোন জবাব দিয়েছিলে ?

আজ্ঞে, না।

তা'হলে লিখে দাও যে জমি তারা পাবে। দেরি কোরোনা।

না, দিচ্চি লিখে, এই বলিয়া সে এককড়িকে সঙ্গে লইয়া প্রস্থান করিল। আবার কিছুক্ষণের জন্য সমস্ত গৃহটা নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। শিরোমণি উঠিয়া দাঁড়াইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, আমরা আজ তা'হলে আসি ?

আসুন।

রায় মহাশয় হেঁট হইয়া প্রণাম করিয়া কহিলেন, অনুমতি হয়ত আর একদিন চরণ দর্শন করতে আস্‌ব।

বেশ, আস্‌বেন।

সকলেই ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন। বাহিরে আসিয়া তাঁহারা জমিদারের হাঁক শুনিতে পাইলেন, বেয়ারা—

অনেকখানি পথ কেহই কাহারো সহিত বাক্যালাপ করিলনা। অবশেষে শিরোমণি আর কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া রায় মহাশয়কে একপাশে একটু টানিয়া লইয়া ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়া কহিলেন, জনার্দ্দন, জমিদারকে তোমার কিরূপ মনে হয় ভায়া ?

জনার্দ্দন সংক্ষেপে বলিলেন, মনে ত অনেক রকমই হল।

মহা পাপিষ্ঠ,—লজ্জা সরম আদৌ নেই।

না।

কিন্তু দিব্য সরল। মাতাল কি না! দেখ্‌লে, দেনার দায়ে চুল পর্য্যন্ত বাঁধা, তাও বলে ফেল্‌লে।

জনার্দ্দন বলিলেন, হুঁ।

শিরোমণি বলিলেন, কিন্তু কিছুই থাক্‌বেনা, সব ছারখার হয়ে যাবে, তুমি দেখে নিয়ো।

জনার্দ্দন বলিলেন, খুব সম্ভব।

হয়ত বেশি দিন বাঁচবেও না।

হতেও পারে।

কিছুক্ষণ নীরবে পথ চলিয়া শিরোমণি পুনশ্চ বলিলেন, যা ভাবা গিয়েছিল, বোধ হয় ঠিক তা' নয়,—নেহাৎ হাবাবোকা বলে মনে হয়না। কি বল ?

জনার্দ্দন শুধু জবাব দিলেন, না।

কিন্তু বড় দুর্ম্মুখ। মানীর মান-মর্য্যাদার জ্ঞান নেই।

জনার্দ্দন চুপ করিয়া রহিলেন। উত্তর না পাইয়াও শিরোমণি কহিলেন, কিন্তু দেখেচ ভায়া কথার ভঙ্গী,—অর্দ্ধেক মানে বোঝাই যায়-না। সত্য বল্‌চে, না আমাদের বাঁদর নাচাচ্চে ঠাওর করাই শক্ত। জানে সব, কি বল?

রায় মহাশয় তথাপি কোন মন্তব্য প্রকাশ করিলেননা, তেমনি নীরবে পথ চলিতে লাগিলেন। কিন্তু বাটীর কাছাকাছি আসিয়া শিরোমণি আর কৌতূহল সম্বরণ করিতে পারিলেননা, আস্তে আস্তে বলিলেন, ভায়াকে বড় বিমর্ষ দেখাচ্চে,—বিশেষ সুবিধে হবেনা বলেই যেন ভয় হচ্চে, না?

রায় মহাশয় যেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটু দাঁড়াইয়া কহিলেন, মায়ের অভিরুচি।

শিরোমণি ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, তার আর কথা কি! কিন্তু ব্যাপারটা যেন খিচুড়ি পাকিয়ে গেল,—না গেল একে ধরা, না গেল তাকে মারা। তোমার কি ভায়া, পয়সার জোর আছে,—কিন্তু বাঘের গর্ত্তের মুখে ফাঁদ পাততে গিয়ে না শেষে আমি মারা পড়ি।

জনার্দ্দন একটু রুক্ষকণ্ঠে কহিলেন, আপনি কি ভয় পেয়ে এলেন না কি?

শিরোমণি বলিলেন, না না ভয় নয়, ভয় নয়,—কিন্তু তুমিও যে খুব ভরসা পেয়ে এলে, তা ত তোমার মুখ দেখেও অনুভব হচ্চেনা। হুজুরটি ত কানকাটা সেপাই,—কথাও যেমন হেঁয়ালি, কাজও তেমনি অদ্ভুত। ও যে ধরে গলাটিপে মদ খাইয়ে দেয়নি এই আশ্চর্য্য। এককড়ির মুখে ঠাকুরুণটির হুম্‌কিও ত শুনলে? আমিই মেলা কথা কয়ে এসেচি—ভাল

করিনি। কি জানি, এককোড়ে ব্যাটা ভেতরে ভেতরে সব বলে দেয় না কি। দুয়ের মাঝে পড়ে শেষকালে না বেড়াজালে ধরা পড়ি!

জনার্দ্দন উদাস কণ্ঠে কহিলেন, সকলই চণ্ডীর ইচ্ছা। বেলা হয়ে গেল,—ও-বেলায় একবার আস্‌বেন।

তা' আস্‌বো।

গলির মোড় ফিরিতে বাঁ দিকে গাছের ফাঁকে মন্দিরের অগ্রভাগ দেখা দিতেই বৃদ্ধ শিরোমণি হাত তুলিয়া যুক্তকরে প্রণাম করিলেন, কানে এবং নাকে হাত দিলেন, কিন্তু অস্ফুটে কি প্রার্থনা যে করিলেন তাহা শোনা গেলনা। তার পর ধীরে ধীরে বাড়ী চলিয়া গেলেন।

অন্যান্য স্থানের মত চণ্ডীগড়েও দিন আসে যায়, বাহির হইতে কোন বিশেষত্ব নাই। দেবীর সেবা সমভাবে চলিতেছে, গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে যাত্রীরা দল বাঁধিয়া তেম্নি আসিতেছে যাইতেছে, মানস করিতেছে, পূজা দিতেছে, পাঁটা কাটিতেছে, প্রসাদের ভাগ লইয়া পূজারীর সহিত তেম্নি বিবাদ করিতেছে, এবং ঠিক তেম্নি মুক্তকণ্ঠে আপনার খ্যাতি ও প্রতিবেশীর অখ্যাতি প্রচার করিয়া দেহ ও মনের স্বাস্থ্য ও স্বাভাবিকতার প্রমাণ দিতেছে। বস্তুতঃ, কোথাও কোন ব্যতিক্রম নাই; বিদেশীর বুঝিবার যো নাই যে ইতিমধ্যে হাওয়ার বদল হইয়াছে, এবং ঝঞ্ঝার পূর্ব্বক্ষণের ন্যায় চণ্ডীগড়ের মাথার আকাশ গোপনে ভারে থম্ থম্ করিতেছে। এ গ্রামের সাধারণ চাষা-ভূষারাও যে ঠিক নিশ্চয় করিয়া কিছু বুঝিয়া লইয়াছে তাহা নহে, কিন্তু ষোড়শীর সম্বন্ধে মোড়ল পদ-বাচ্যদের মনোভাব যা-ই হোক, এই দীন দুঃখীরা তাহাকে যেমন ভক্তি করিত, তেমনি ভালবাসিত। এককড়ি নন্দীর উৎপাত হইতে বাঁচিবার সেই কেবল একমাত্র পথ ছিল। ছোট খাটো ঋণ যখন আর কোথাও মিলিতনা, তখন ভৈরবীর কাছে গিয়া হাত পাতিতে তাহাদের বাধিতনা। তাহার বাড়ী ছাড়িয়া আসার জন্য ইহাদের সত্যসত্যই বিশেষ কোন দুশ্চিন্তা ছিলনা, তাহারা জানিত পিতা ও কন্যার মনোমালিন্য একদিন-না একদিন মিটিবেই। ষোড়শীর দুর্নামের কথাটাও অপ্রকাশ ছিলনা। কেবল সে-ই বলিয়া ইহা না রটিলেই ভাল হইত; না হইলে দেবীর ভৈরবীদের স্বভাব-চরিত্র লইয়া মাথা গরম করার আবশ্যকতা কেহ

লেশমাত্র অনুভব করিতনা—দীর্ঘকালের অভ্যাসবশতঃ ইহা এতই তুচ্ছ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ইহাকেই উপলক্ষ্য সৃষ্টি করিয়া মায়ের মন্দির লইয়া যে তুমুল কাণ্ড বাধিবে, কর্ত্তারা তারাদাস ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া সকাল নাই সন্ধ্যা নাই হুজুরের কাছে আনাগোনা করিয়া কি-যেন-কি একটা ওলট-পালট ঘটাইবার মতলব করিবেন, এবং ওই যে অচেনা ছোট মেয়েটাকে কোথা হইতে কিসের জন্য আনিয়া রাখা হইয়াছে—এম্নি সব সংশয়ের বিদ্যুৎ কথায় কথায় ক্ষণে ক্ষণে যখন চমকিতে লাগিল, তখন চোখের আড়ালে কোথায় আকাশের গায়ে যে অকালের মেঘ জমিয়া উঠিতেছে এবং তাহাতে দেশের ভাল হইবেনা, এই ভাবটাই সকলের মধ্যে ক্রোধ ও ক্ষোভের মত আবর্ত্তিত হইতে লাগিল।

সেদিন অষ্টমী তিথির জন্য মন্দির-প্রাঙ্গণে লোক সমাগম কিছু অধিক হইয়াছিল। প্রতিমার অনতিদূরে বারান্দার একধারে বসিয়া ষোড়শী আরতির উপকরণ সজ্জিত করিতেছিল, তারাদাস ও সেই মেয়েটিকে সঙ্গে করিয়া এককড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল। ষোড়শী কাজ করিতে লাগিল, মুখ তুলিয়া চাহিলনা। এককড়ি কহিল, মা মঙ্গলা, তোমার চণ্ডী-মাকে প্রণাম কর।

পূজারী কি একটা করিতেছিল, সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। ষোড়শী চোখ না তুলিয়াও ইহা লক্ষ্য করিল। মেয়েটি প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে পূজারী কহিল, মায়ের সন্ধ্যাআরতি কি তুমি দেখ্‌বে মা ? তা'-হলে দেবীর দক্ষিণে ওই যে আসন পাতা আছে ওর ওপরে গিয়ে বোসো।

এককড়ি ষোড়শীর প্রতি একটা বাঁকা কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া সহাস্যে কহিল, ওঁর নিজের স্থান উনি নিজেই চিনে নেবেন, ঠাকুর, তোমাকে চেনাতে হবেনা, কিন্তু মায়ের জিনিস-পত্র যা-যা আছে দেখিয়ে দাও দিকি।

পূজারী একটু লজ্জিত হইয়া কহিল, দেখিয়ে দিতে হবে বই কি, সমস্তই একটি একটি করে দেখাতে হবে। লিষ্টির সঙ্গে মিলিয়ে সব ঠিক আছে, কোন চিন্তা নেই। মা, ওই যে ও-দিকে বড় সিন্দুক দেখা যাচ্চে, ওতে পূজার পাত্র এবং সমস্ত পিতল কাঁসার তৈজসাদি তালা বন্ধ আছে, বড় বড় কাজ কর্ম্মে শুধু বার করা হয়। আর এই যে গুলো-বসানো ছোট কাঠের সিন্দুকটি, এতে মখমলের চাঁদোয়া, ঝালর প্রভৃতি আছে, আর এই কুঠারিটির মধ্যে সতরঞ্চি, গাল্‌চে, কানাত,—বসবার আসন এই সব—

এককড়ি কহিল, আর—

পূজারী বলিলেন, আর ওই যে পূবের দেয়ালের গায়ে বড় বড় তালা ঝুল্‌চে, ওটা লোহার সিন্দুক, মন্দিরের সঙ্গে একেবারে গাঁথা। ওর মধ্যে মায়ের সোনার মুকুট, রামপুরের মহারাণীর দেওয়া মতির মালা, বীজ-গাঁর জমিদার বাবুদের দেওয়া সোনার বাউটি, হার, আরও কতশত ভক্তের দেওয়া কত-কি সোনারূপার অলঙ্কার, তা'ছাড়া টাকাকড়ি, দলিলপত্র, সোনারূপার বাসন,—অর্থাৎ মূল্যবান যা কিছু সমস্তই ওই সিন্দুকটিতে।

এককড়ি কহিল, আমি আজকের নয় ঠাকুর, সব জানি। কিন্তু ও সব কেবল তোমার মুখেই আছে, না সিন্দুকটা হাতড়ালে কিছু কিছু পাওয়া যাবে? ওই ত উনি বসে আছেন, চাবিটা চেয়ে এনে একবার খুলে দেখাওনা। গ্রামের ষোল-আনার প্রার্থনা মঞ্জুর করে হুজুর কি হুকুম দিয়েছেন শোননি? চৈত্র সংক্রান্তির পূর্ব্বে সমস্তই যে একদফা মিলিয়ে দেখ্‌তে হবে।

পূজারী হতবুদ্ধির ন্যায় চুপ করিয়া রহিল। মন্দির হইতে ষোড়শীর কর্ত্তৃত্ব যে ঘুচিয়া গেছে তাহা সে শুনিয়াছে এবং নন্দীমহাশয়ের প্রত্যক্ষ

আদেশ অমান্য করাও যে অতিশয় সাংঘাতিক তাহাও জানে, কিন্তু কর্ম্ম-নিরতা ওই যে ভৈরবী অনতিদূরে বসিয়া স্বকর্ণে সমস্ত শুনিয়াও শুনিতেছেনা, তাহাকে মুখের সম্মুখে গিয়া শুনাইবার সাহস তাহার নাই। সে ভয়ে ভয়ে কহিল, কিন্তু তার ত এখনো দেরি আছে নন্দী মশাই। এদিকে সূর্য্যাস্ত হয়ে এল—

তারাদাস এতক্ষণ কথা কহে নাই, এবং সঙ্কোচ ও ভয়ের চিহ্ন কেবল পূজারীর মুখে-চোখেই প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা নয়। আস্তে আস্তে কহিল, মিলিয়ে নিতে অনেক বিলম্ব হবে, নন্দী মশাই, একটু সকাল করে এসে আর একদিন এ কাজটা সেরে নিলে হবেনা? কি বলেন?

এককড়ি চিন্তা করিয়া কহিল, আচ্ছা, তাই না হয় হবে। পূজারীকে কহিল, কিন্তু মনে থাকে যেন চক্রবর্ত্তী মশাই, এই শনিবারেই সংক্রান্তি। ষোল-আনা পঞ্চাইৎি নাটমন্দিরেই হবে। হুজুর স্বয়ং এসে বস্‌বেন। উত্তর ধারটা কানাত দিয়ে ঘিরে দিয়ে তাঁর জন্যে সেই মখমলের গালচেটা পেতে দিতে হবে। আলোর সেজ ক'টাও তৈরি রাখা চাই।

এককড়ি একটু জোর গলায় কথা কহিতেছিল, সুতরাং অনেকেই কৌতূহলবশে বারান্দার নীচে প্রাঙ্গণে আসিয়া জমা হইয়াছিল। সে তাহাদের শুনাইয়া আরও একটু হাঁকিয়া পূজারীকে কহিল, সেদিন ভিড় ত বড় কম হবেনা,—ব্যাপারটা খুবই গুরুতর। মঙ্গলা মেয়েটাকে আদর করিয়া কহিল, কি গো মা, খুদে ভৈরবী! দেখেশুনে সব চালাতে পারবে ত? তবে আমরা আছি, হুজুর এখন থেকে নিজে দৃষ্টি রাখবেন বলেছেন, নইলে ভার বড় সহজ নয়! অনেক বিদ্যে-বুদ্ধির দরকার। এই বলিয়া ষোড়শীর প্রতি আড় চোখে চাহিয়া দেখিল সে ঠাকুরের পূজার সজ্জায় তেম্‌নি নিবিষ্ট-চিত্ত হইয়া আছে। তারাদাসকে লক্ষ্য

করিয়া হাসিয়া বলিল, কি গো ঠাকুর মশাই, নূতন অভিষেকের দিন-ক্ষণ কিছু স্থির হয়েচে শুনেচ? লোকে ত আমাদের একেবারে ব্যস্ত করে তুলেচে, নাবার-খাবার সময় দিতে চায়না!

প্রত্যুত্তরে তারাদাস অস্ফুটে কি যে বলিল বুঝিতে পারা গেলনা। তাহারা সদর দরজা দিয়া যখন বাহির হইয়া গেল, তখন পিছনে পিছনে অনেকেই গেল, এবং গুঞ্জনধ্বনি তাহাদের প্রাঙ্গণের অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত স্পষ্ট শুনা গেল, কিন্তু চণ্ডীর আরতির প্রতীক্ষায় যাহারা অবশিষ্ট রহিল তাহারা দূর হইতে ষোড়শীর আনত মুখের প্রতি শুধু নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল; এমন ভরসা কাহারও হইলনা কাছে গিয়া একটা প্রশ্ন করে।

যথাসময়ে দেবীর আরতি শেষ হইল। প্রসাদ লইয়া যে যাহার গৃহে চলিয়া গেলে মন্দিরের ভৃত্য যখন দ্বার রুদ্ধ করিতে আসিল, তখন ষোড়শী পূজারীকে নিভৃতে ডাকিয়া কহিল, চক্রবর্ত্তী মশায়, ঠাকুরের সেবাইৎ আমি না এককড়ি নন্দী?

চক্রবর্ত্তী লজ্জিত হইয়া বলিল, তুমি বই কি মা, তুমিই ত মায়ের ভৈরবী।

ষোড়শী কহিল, কিন্তু তোমার ব্যবহারে আজ অন্য ভাব প্রকাশ পেয়েছে। যতদিন আছি গোমস্তার চেয়ে আমার মান্যটা মন্দিরের ভেতর বেশী থাকা দরকার। ঠিক না?

পূজারী কহিল, তাতে আর সন্দেহ কি মা? কিন্তু—

ষোড়শী কহিল, ওই কিন্তুটা তোমাকে সে কটা দিন বাদ দিয়ে চলতে হবে।

এই শান্ত মৃদু কণ্ঠ পূজারীর অত্যন্ত সুপরিচিত; সে অধোমুখে নিরুত্তরে রহিল, এবং ষোড়শীও আর কিছু কহিলনা। মন্দির-দ্বারে তালা পড়িলে সে চাবির গোছা আঁচলে বাঁধিয়া নীরবে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

পরদিন সকালে স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিয়া দূর হইতে দেখিতে পাইল এইটুকু সময়ের মধ্যে তাহার পর্ণকুটীরখানি ঘেরিয়া বহু লোক জড় হইয়া বসিয়া আছে। কাছে আসিতেই লোকগুলা ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া পদধূলির আশায় একযোগে প্রায় পঁচিশখানা হাত বাড়াইয়া দিতে ষোড়শী পিছাইয়া গিয়া হাসিয়া কহিল, ওরে, অত ধূলো পায়ে নেইরে নেই, আবার আমাকে নাইয়ে মারিস্‌নে, আমার মন্দিরের বেলা হয়ে গেছে। কি হয়েছে বল্‌?

ইহারা প্রায় সকলেই তাহার প্রজা; হাত জোড় করিয়া কহিল, মা, আমরা যে মারা যাই! সর্ব্বনাশ হয় যে!

তাহাদের মুখের চেহারা যেমন বিষণ্ণ, তেম্‌নি শুষ্ক। কেহ কেহ বোধ করি সারারাত্রি ঘুমাইতে পর্য্যন্ত পারে নাই। এই সকল মুখের প্রতি চাহিয়া তাহার নিজের হাসিমুখখানি চক্ষের পলকে মলিন হইয়া গেল। বুড়া বিপিন মাইতি অবস্থা ও বয়সে সকলের বড়; ইহাকেই উদ্দেশ করিয়া ষোড়শী জিজ্ঞাসা করিল, হঠাৎ কি সর্ব্বনাশ হ'ল বিপিন?

বিপিন কহিল, কে একজন মান্দ্রাজী সাহেবকে সমস্ত দক্ষিণের মাঠকে মাঠ জমিদার তরফ থেকে বিক্রি করা হচ্চে। আমাদের যথাসর্ব্বস্ব। কেউ তা'হলে আর বাঁচবনা,—না খেতে পেয়ে সবাই শুকিয়ে মারা যাবো, মা।

ব্যাপারটা এম্‌নি অসম্ভব যে ষোড়শী হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, তা'হলে তোদের শুকিয়ে মরাই ভাল। যা বাড়ী যা; সকাল-বেলা আর আমার সময় নষ্ট করিস্‌নে।

কিন্তু তাহার হাসিতে কেহ যোগ দিতে পারিলনা, সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল, না মা, এ সত্যি।

ষোড়শী বিশ্বাস করিতে পারিলনা, বলিল, না রে না, এ কখনো সত্য হতেই পারেনা, তোদের সঙ্গে কে তামাসা করেছে। বিশ্বাস না করিবার তাহার বিশেষ হেতু ছিল। একে ত এই সকল জমিজমা তাহারা পুরুষানুক্রমে ভোগ করিয়া আসিতেছে ; তাহাতে সমস্ত মাঠ শুধু কেবল বীজ গ্রামের সম্পত্তিও নহে। ইহার কতক অংশ ৺চণ্ডীমাতার এবং কিছু রায় মহাশয়ের খরিদা ; অতএব জীবানন্দ একাকী ইচ্ছা করিলেও ইহা হস্তান্তর করিয়া দিতে পারেননা। কিন্তু বৃদ্ধ বিপিন মাইতি যখন সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া কহিল, কাল কাছারী-বাটীতে সকলকে ডাকাইয়া আনিয়া নন্দী মহাশয় নিজের মুখে জানাইয়া দিয়াছেন এবং তথায় জনার্দ্দন ও তারাদাস উভয়েই উপস্থিত ছিলেন, এবং দেবীর পক্ষ হইতে তাহার পিতা তারাদাসই দলিলে দস্তখত করিয়া দিয়াছেন, তখন অপরিসীম ক্রোধ ও বিস্ময়ে ষোড়শী বহুক্ষণ পর্য্যন্ত স্তব্ধ হইয়া রহিল। অবশেষে ধীরে ধীরে কহিল, তাই যদি হয়ে থাকে তোরা আদালতে নালিশ করগে।

বিপিন নিরুপায় ভাবে মাথা নাড়িতে নাড়িতে কহিল, তাও কি হয় মা ? রাজার সঙ্গে কি বিবাদ করা চলে ? কুমীরের সঙ্গে শত্রুতা করে জলে বাস করলে যার যা কিছু আছে—ভিটেটুকু পর্য্যন্তও যে থাকবেনা !

ষোড়শী কহিল, তা'বলে বাপ-পিতামহের কালের পৈতৃক বিষয়টুকু তোরা মুখ বুজে ছেড়ে দিবি ?

বিপিন কহিল, তুমি যদি কৃপা করে আমাদের বাঁচিয়ে দাও মা। দীন দুঃখী আমাদের নইলে ছেলেপিলের হাত ধরে গাছতলায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে। তাই ত তোমার কাছে সবাই ছুটে এসেচি।

ষোড়শী একে একে সকলের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। ইহাদের

কাহারও কিছুই করিবার সাধ্য নাই ; তাই এই একান্ত বিপদের দিনে দল বাঁধিয়া অপরের কৃপা ভিক্ষা করিতে তাহারা বাহির হইয়াছে। এই সব নিরুদ্যম ভরসাহীন মুখের সকরুণ প্রার্থনায় তাহার বুকের ভিতরে আগুন জ্বলিয়া উঠিল ; কহিল তোরা এতগুলো পুরুষমানুষ মিলে নিজেদের বাঁচাতে পারবিনে, আর মেয়েমানুষ হয়ে আমি যাবো তোদের বাঁচাতে ? রাগ কোরোনা বিপিন, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এ জমি না হয়ে মাইতি-গিন্নীকে যদি জমিদার বাবু এমনি জবরদস্তি আর একজনকে বিক্রী করে দিতেন, আর সে আসতো তাকে দখল করতে, কি করতে বাবা তুমি ?

ষোড়শীর এই অদ্ভুত উপমায় অনেকের মুখই চাপা হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল ; কিন্তু বৃদ্ধের চোখের কোণে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখা দিল। কিন্তু আপনাকে সম্বরণ করিয়া সহজ কণ্ঠে বলিল, মা আমি না হয় বুড়ো হয়েছি, আমার কথা ছেড়েই দাও, কিন্তু মাইতি-গিন্নীর পাঁচ-পাঁচজন যোয়ান বেটা আছে, তারা তখন জেল কেন, ফাঁসি কাঠের ভয় পর্য্যন্ত কোরবেনা, এ কথা তোমাকে মা চণ্ডীর দিব্যি করেই জানিয়ে যাচ্চি !

সে আরও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু ষোড়শী বাধা দিয়া কহিল, তাই যদি সত্যি হয় বিপিন, তোমার সেই পাঁচ-পাঁচজন যোয়ান বেটাকে বোলো, এই পিতা-পিতামহ কালের ক্ষেত-খামারটুকুও তাদের বুড়ো মায়ের চেয়ে এক তিল ছোট নয়। এঁরা দুজনেই তাদের সমান প্রতিপালন করে এসেছেন।

বৃদ্ধ চক্ষের নিমিষে সোজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, ঠিক ! ঠিক কথা মা ! আমাদের মা-ই ত বটে ! ছেলেদের এখনি গিয়ে আমি এ কথা জানাবো. কিন্তু তুমি আমাদের সহায় থেকো।

ষোড়শী মাথা নাড়িয়া বলিল, শুধু আমি কেন বিপিন, মা চণ্ডী

তোমাদের সহায় থাক্‌বেন! কিন্তু আমার পূজোর সময় বয়ে যাচ্চে, বাবা, আমি চল্লুম। এই বলিয়া সে দ্রুতপদে গিয়া আপনার কুটীরের মধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু বিপিনের গম্ভীর গলা সে স্পষ্ট শুনিতে পাইল। সে সকলকে ডাকিয়া কহিতেছে, তোরা সবাই শুন্‌লি ত রে, শুধু গর্ভধারিণীই মা নয়, যিনি পালন করেন তিনিও মা। যা' হবার হবে, ঘরের মাকে আমরা কিছুতেই পরের হাতে তুলে দিতে পারবনা।

১৫

চৈত্রের সংক্রান্তি আসন্ন হইয়া উঠিল। চড়ক ও গাজন উৎসবের উত্তেজনায় দেশের কৃষিজীবীর দল প্রায় উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে,—এতবড় পর্ব্বদিন তাহাদের আর নাই। নর-নারী নির্ব্বিশেষে যাহারা সমস্ত মাস ব্যাপিয়া সন্ন্যাসের ব্রত ধারণ করিয়া আছে, তাহাদের পরিধেয় বস্ত্রে ও উত্তরীয়ের গৈরিকে দেশের বাতাসে যেন বৈরাগ্যের রঙ ধরিয়া গেছে। পথে পথে 'শিব-শম্ভু' নিনাদের বিরাম নাই ; চণ্ডীর দেউলে তাহাদের আসা যাওয়ার শেষ হইতেছেনা,—প্রাঙ্গণ-সংলগ্ন শিবমন্দির ঘেরিয়া দেবতার অসংখ্য সেবকে যেন মাতামাতি বাধাইয়া দিয়াছে। পূজা দিতে, তামাসা দেখিতে, বেচা-কেনা করিতে যাত্রী আসিতে আরম্ভ করিয়াছে, বাহিরে প্রাচীরতলে দোকানীরা স্থান লইয়া লড়াই করিতে সুরু করিয়া দিয়াছে,—চোখ চাহিলেই মনে হয় চণ্ডীগড়ের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত মহোৎসবের সূচনায় বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতে আর বিলম্ব নাই। ষোড়শী মনের অশান্তি দূর করিয়া দিয়া অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও কাজে লাগিয়া গেছে,—সকল দিকে দৃষ্টি রাখিতে সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত তাহার মন্দির ছাড়িবার যো নাই। বিকালের দিকে মন্দিরের রকে বসিয়া সে নিবিষ্ট চিত্তে হিসাবের খাতাটায় জমা-খরচের মিল করিতেছিল, নানা জাতীয় শব্দতরঙ্গ অভ্যস্ত ব্যাপারের ন্যায় তাহার কানে পশিয়াও ভিতরে প্রবেশ করিতেছিলনা, এমন সময়ে হঠাৎ একটা অপ্রত্যাশিত নীরবতা খোঁচার মত যেন তাকে আঘাত করিল। চোখ তুলিয়া দেখিল স্বয়ং

জীবানন্দ চৌধুরী। তাঁহার দক্ষিণে বামে ও পশ্চাতে পরিচিত ও অপরিচিত অনেকগুলি ভদ্র ব্যক্তি। রায় মহাশয়, শিরোমণি ঠাকুর, তারাদাস, এককড়ি, এবং গ্রামের আরও অনেকে প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। আরও তিন চারিজনকে সে চিনিতে পারিলনা; কিন্তু পরিচ্ছদের পরিপাট্য দেখিয়া অনুভব করিল ইঁহারা কলিকাতা হইতে বাবুর সঙ্গে আসিয়াছেন। খুব সম্ভব পল্লীগ্রামের বিশুদ্ধ বায়ু ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করাই অভিপ্রায়। জন চারেক ভোজপুরী পাইক-পেয়াদাও আছে। তাহাদের মাথায় রঙ্গিন পাগড়ী ও কাঁধে সুদীর্ঘ যষ্টি। অনতিকাল পূর্ব্বের হোলী উৎসবের সমস্ত চিহ্ন আজও তাহাদের পরিচ্ছদে দেদীপ্যমান। মনিবের শরীর-রক্ষা ও গৌরব-বৃদ্ধি করাই তাহাদের উদ্দেশ্য। ষোড়শী ক্ষণেকের জন্য চোখ তুলিয়াই আবার তাহার খাতার পাতায় দৃষ্টি সংযোগ করিল, কিন্তু মনঃসংযোগ করিতে পারিলনা। জীবানন্দ আর কখনও এখানে আসেন নাই; তিনি সকৌতুকে সমস্ত তন্ন-তন্ন করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন, এবং সুপ্রাচীন শিরোমণি মহাশয় তাঁহার বহু বৎসরের অভিজ্ঞতা লইয়া যেখানে যা' কিছু আছে,—তাহার ইতিহাস, তাহার প্রবাদ-বাক্য,—সমস্তই এই নবীন জমিদার প্রভুটিকে শুনাইতে শুনাইতে সঙ্গে চলিলেন। এইভাবে প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল ঘুরিয়া ফিরিয়া এই দলটি আসিয়া এক সময়ে মন্দিরের দ্বারের কাছে উপস্থিত হইল, এবং মিনিট দুই পরেই পূজারী আসিয়া ষোড়শীকে কহিল, মা, বাবু তোমাকে নমস্কার জানিয়ে একবার আস্‌তে অনুরোধ করলেন।

ষোড়শী মুখ তুলিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, আচ্ছা, চল, যাচ্চি। এই বলিয়া সে তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া জমিদারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। জীবানন্দ মিনিট পাঁচ ছয় নিঃশব্দে তাহার আপাদ-মস্তক বারবার নিরীক্ষণ

করিয়া অবশেষে ধীরে ধীরে কহিলেন, সকলের অনুরোধে তোমার সম্বন্ধে আমি কি হুকুম দিয়েছি শুনেচ ?

ষোড়শী মাথা নাড়িয়া জানাইল, না।

জীবানন্দ কহিলেন, তোমাকে বিদায় করা হয়েছে, এবং ওই ছোট মেয়েটিকে নূতন ভৈরবী করে মন্দিরের তত্ত্বাবধানের ভার দেওয়া হয়েছে। অভিষেকের দিন স্থির হয়নি, কিন্তু শীঘ্রই হবে। কাল সকালে রায় মশায় প্রভৃতি সকলে আসবেন। তাঁদের কাছে দেবীর সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি বুঝিয়ে দিয়ে আমার গোমস্তার হাতে সিন্দুকের চাবি দেবে। এ সম্বন্ধে তোমার কোন বক্তব্য আছে ?

ষোড়শী বহু পূর্ব্ব হইতেই আপনাকে সম্বরণ করিয়া লইয়াছিল ; তাই তাহার কণ্ঠস্বরে কোন প্রকার উত্তেজনা প্রকাশ পাইলনা, সহজ কণ্ঠে কহিল, আমার বক্তব্যে আপনাদের কি কিছু প্রয়োজন আছে ?

জীবানন্দ কহিলেন, না। তবে পরশু সন্ধ্যার পরে ঐইখানেই একটা সভা হবে, ইচ্ছে কর ত দশের সামনে তোমার দুঃখ জানাতে পার। ভাল কথা, শুনতে পেলাম তুমি না কি আমার বিরুদ্ধে আমার প্রজাদের বিদ্রোহী করে তোলবার চেষ্টা কোরচ ?

ষোড়শী বলিল, তা জানিনে। তবে, আমার নিজের প্রজাদের আপনার উপদ্রব থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করচি।

জীবানন্দ অধর দংশন করিয়া কহিলেন, পারবে ?

ষোড়শী কহিল, পারা না পারা মা চণ্ডীর হাতে।

জীবানন্দ কহিলেন, তারা মরবে।

ষোড়শী কহিল, মানুষ অমর নয় সে তারা জানে।

ক্রোধে ও অপমানে সকলের চোখ-মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। এককড়ি

ত এম্‌নি ভাব দেখাইতে লাগিল যে সে কষ্টে আপনাকে সংযত করিয়া রাখিয়াছে।

জীবানন্দ একমুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, তোমার নিজের প্রজা আর কেউ নেই। তারা যাঁর প্রজা তিনি নিজে দলিলে দস্তখত করে দিয়েছেন। তাকে কেউ ঠেকাতে পারবে না।

ষোড়শী মুখ তুলিয়া কহিল, আপনার আর কোন হুকুম আছে?

জীবানন্দ স্পষ্ট অনুভব করিলেন বলিবার সময়ে তাহার ওষ্ঠাধর তাচ্ছল্যের আভাসে যেন স্ফুরিত হইয়া উঠিল, কিন্তু সংক্ষেপে জবাব দিয়া কহিলেন, না, আর কিছু নেই।

ষোড়শী কহিল, তাহলে দয়া করে এইবার আমার কথাটা শুনুন।

বল।

ষোড়শী কহিল, কাল দেবীর অস্থাবর সম্পত্তি বুঝিয়ে দেবার সময় আমার নেই এবং পরশু মন্দিরের কোথাও সভাসমিতির স্থানও হবে না। এগুলো এখন বন্ধ রাখতে হবে।

শিরোমণি অনেক সহিয়াছিলেন, আর পারিলেননা। সহসা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, কখনো না! কিছুতেই নয়! এ সব চালাকি আমাদের কাছে খাটবে না বলে দিচ্চি,—

এবং, শুধু জীবানন্দ ছাড়া যে যেখানে ছিল ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া উঠিল।

জনার্দ্দন রায় এতক্ষণ কথা কহেন নাই; কলরব থামিলে অকস্মাৎ উষ্মার সহিত বলিয়া উঠিলেন, তোমার সময় এবং মন্দিরের ভেতর যায়গা কেন হবে না শুনি ঠাকরুণ?

ইহার শেষ কথাটার শ্লেষ উপলব্ধি করিয়াও ষোড়শী সহজ বিনীত কণ্ঠে

কহিল, আপনি ত জানেন রায় মশায়, এখন গাজনের সময়। যাত্রীর ভিড়, সন্ন্যাসীর ভিড়, আমারই বা সময় কোথায়, তাদেরই বা সরাই কোথায় ?

সত্যই তাই। এবং এই নিবেদনের মধ্যে যে কিছুমাত্র অসঙ্গতি নাই, বোধ করি জীবানন্দ তাহা বুঝিলেন, কিন্তু দেশের যাঁহারা, তাঁহারা নাকি বদ্ধপরিকর হইয়া আসিয়াছিলেন, তাই এই নম্র কণ্ঠস্বরে উপহাস কল্পনা করিয়া একেবারে জ্বলিয়া গেলেন। জনার্দ্দন রায় আত্ম-বিস্মৃত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, হতেই হবে! আমি বল্‌চি হতে হবে। এবং দলের মধ্যে হইতে একজন একটা কটূক্তি পর্য্যন্ত করিয়া ফেলিল।

কথা ষোড়শীর কানে গেল, এবং মুখের ভাব তাহার সঙ্গে সঙ্গেই অত্যন্ত কঠোর ও গম্ভীর হইয়া উঠিল। পলক মাত্র চুপ করিয়া থাকিয়া জীবানন্দকেই বিশেষ করিয়া উদ্দেশ করিয়া কহিল, ঝগড়া করতে আমার ঘৃণা বোধ হয়। তবে, ওসব করবার এখন সুযোগ হবেনা, এই কথাটা আপনার অনুচরদের বুঝিয়ে বলে দেবেন। আমার সময় অল্প; আপনাদের কাজ মিটে থাকে ত আমি চললাম।

এই মুখ, এই কণ্ঠস্বর, এই একান্ত অবহেলা হঠাৎ জীবানন্দকেও তীক্ষ্ণ আঘাত করিল, এবং তাঁহার নিজের কণ্ঠস্বরও তপ্ত হইয়া উঠিল, কহিলেন, কিন্তু আমি হুকুম দিয়ে যাচ্চি, কালই এসব হতে হবে এবং হওয়াই চাই।

জোর কোরে ?

হাঁ, জোর কোরে।

সুবিধে অসুবিধে যাই-ই হোক্ ?

হাঁ, সুবিধে অসুবিধে যাই-হোক্।

ষোড়শী আর কোন তর্ক করিলনা। পিছনে চাহিয়া ভিড়ের মধ্যে একজনকে অঙ্গুলি-সঙ্কেতে আহ্বান করিয়া কহিল, সাগর, তোদের সমস্ত ঠিক আছে ?

সাগর সবিনয়ে কহিল, আছে মা, তোমার আশীর্ব্বাদে অভাব কিছুই নেই।

ষোড়শী কহিল, বেশ। জমিদারের লোক কাল একটা হাঙ্গামা বাধাতে চায়, কিন্তু আমি তা চাইনে। এই গাজনের সময়টায় রক্তপাত হয় আমার ইচ্ছে নয়, কিন্তু দরকার হলে করতেই হবে। এই লোকগুলোকে তোরা দেখে রাখ্; এদের কেউ যেন আমার মন্দিরের ত্রিসীমানায় না আস্‌তে পারে! হঠাৎ মারিস্‌নে,—শুধু গলা ধাক্কা দিয়ে বার করে দিবি।

এই বলিয়া সে আর দৃক্‌পাত মাত্র না করিয়া মন্দপদে বারান্দা পার হইয়া গেল। ষোড়শীকে বিশ বছর ধরিয়া লোকে দেখিয়া আসিয়াছে, তাহাকে জানিবার যে কিছু বাকি আছে কেহ মনেও করে নাই। কিন্তু আজ তাহার প্রকৃতির এই অসাধারণ দিক্‌টার এই প্রথম পরিচয় পাইয়া হুজুর হইতে পিয়াদা পর্য্যন্ত যেন পাথরের মূর্ত্তির মত স্তব্ধ হইয়া রহিল।

চৈত্রের সংক্রান্তি নিরুপদ্রবে কাটিয়া গেল,—'শিব-শম্ভুর' গাজন উৎসবে কোথাও কিছুমাত্র বিঘ্ন ঘটিলনা। দর্শকের দল ঘরে ফিরিল, দোকানিরা দোকান ভাঙিতে প্রবৃত্ত হইল, বাতাসে তেলে-ভাজা খাবারের গন্ধ ফিকা হইয়া আসিল, এবং গেরুয়াধারীরাও চীৎকার ছাড়িয়া গৃহকর্ম্মে মন দিবার প্রয়োজন অনুভব করিল ;—চিরদিনের অভ্যস্ত সুরে চারিদিকের আবহাওয়ায় সুখদুঃখের আবার সেই পরিচিত স্রোত দেখা দিল, কেবল চণ্ডীগড়ের ভৈরবীর দেহের মধ্যে কি যে রোগ প্রবেশ করিল তাহার সে চেহারা আর ফিরিয়া আসিলনা—কি এক-প্রকার ভয়ে ভয়ে মন যেন তাহার অহর্নিশি চকিত হইয়াই রহিল। উৎসবের কয়টা দিন যে নির্ব্বিঘ্নে কাটাই সম্ভব এ আশা ষোড়শীর ছিল, কারণ, দেবতার ক্রোধোদ্রেকের দায়িত্ব আর যে কেহ মাথায় করিতে চাহুক জনার্দ্দন চাহিবেনা সে নিশ্চিত জানিত। কিন্তু এইবার ?

তবুও দিনগুলা এম্‌নি নিঃশব্দে কাটিতে লাগিল যেন আর কোন হাঙ্গামা নাই, সমস্ত মিটিয়া গেছে। কিন্তু সত্য সত্যই মিটিয়া যে কিছু যায় নাই, অলক্ষ্যে গোপনে কঠিন কিছু একটা দানা বাঁধিয়া উঠিতেছে এ আশঙ্কা শুধু ষোড়শীর নহে, মনে মনে প্রায় সকলেরই ছিল। সেই মাঠ সংক্রান্ত কৃষকদের কাছে আজ সে সম্বাদ পাঠাইয়া দিয়াছিল। কথা ছিল, তাহারা দেবীর সন্ধ্যা আরতির পরে মন্দির প্রাঙ্গণে জমা হইবে, কিন্তু আরতি শেষ হইয়া গেল, রাত্রি আটটা ছাড়াইয়া নয়টা এবং নয়টা ছাড়াইয়া দশটা বাজিতে চলিল কিন্তু কাহারও দেখা নাই। প্রণাম করিতে যাহারা নিত্য আসে প্রসাদ লইয়া একে একে তাহারা প্রস্থান

করিল, পূজারী অহিত হইল, এবং মন্দিরের ভৃত্য দুয়ার রুদ্ধ করিবার অনুমতি চাহিল। আর অপেক্ষা করিয়া ফল নাই, এবং কি একটা ঘটিয়াছে তাহাতেও ভুল নাই, কিন্তু ঠিক কি তাহা জানিতে না পারিয়া সে অত্যন্ত উদ্বেগ অনুভব করিতে লাগিল। এমনি সময়ে ধীরে ধীরে সাগর আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে একাকী দেখিয়া ষোড়শী ব্যগ্র হইয়া প্রশ্ন করিল, এত দেরি যে সাগর? কিন্তু আর কেউ ত আসেনি? এরা কি তবে খবর পায়নি বাবা?

সাগর কহিল, পেয়েছে বই কি মা। আমি নিজে গিয়ে সকলের ঘরে ঘরে তোমার ইচ্ছে জানিয়ে এসেচি।

ষোড়শী শঙ্কিত হইয়া কহিল, তবে?

সাগর বলিল, আজ বোধকরি কেউ আর সময় করে উঠ্‌তে পারলে না। হুজুরের কাছারি বাড়ীতে ষোলআনার পঞ্চাইতি ছিল, তা এইমাত্র সাঙ্গ হল। পঞ্চু, অনাথ, রামময়, নবকুমার, অক্ষয় মাইতি, মায় আমাদের বুড়ো বিপিন খুড়ো পর্য্যন্ত তার সা-জোয়ান ব্যাটাদের নিয়ে। কেউ বাদ যায়নি মা, আমিও একটা বাতাপি নেবুগাছের তলায় দেওয়াল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

ষোড়শী কহিল, ভাল করিস্‌নি, সাগর, কেউ দেখে ফেল্‌লে—

সাগর হাসিয়া বলিল, একা যাইনি মা, ইনি সঙ্গে ছিলেন,—এই বলিয়া সে বাঁ হাতের সুদীর্ঘ বংশদণ্ডখানি সস্নেহে সসম্ভ্রমে দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিল।

ষোড়শী কহিল, কিন্তু এইখানে হবার যে কথা ছিল?

সাগর কহিল, কথাও ছিল, হুজুরের ভোজপুরীগুলোর ইচ্ছেও ছিল, কিন্তু গ্রামের কেউ রাজী হলেননা। তাঁরা ত এ দিক্‌কার মানুষ,—আমাদের খুড়ো-ভাইপোকে হয়ত চেনেন।

ষোড়শী ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সভায় কি স্থির হল ?

সাগর কহিল তা' সব ভাল। এই মঙ্গলেই মেয়েটার অভিষেক শেষ হবে। তবে তোমারও ভাবনা নেই—কাশীবাসের বাবদে প্রার্থনা জানালে শ খানেক টাকা পেতে পারবে।

ষোড়শী কহিল, প্রার্থনা জানাতে হবে কার কাছে ?

সাগর বলিল, বোধহয় হুজুরের কাছেই।

ষোড়শী জিজ্ঞাসা করিল, আর সকলের ? যাদের জমি-জমা সব গেল তাদের ?

সাগর বলিল, ভয় নেই মা, চিরকাল ধরে যা হয়ে আস্‌চে তা থেকে তারা বাদ যাবেনা। এই যে সেদিন প্রজার পক্ষ থেকে পাঁচ হাজারের নজর দাখিল হল তার খতের কাগজগুলো ত রায় মহাশয়ের সিন্দুক ছাড়া আর কোথাও যায়গা পায়নি,—নইলে, তিনি একটা হুকুম দিতে-না-দিতে ভিড় করে আজ সকলে যাবই বা কেন ?

ষোড়শী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, পরে কহিল, আর তোদের ?

সাগর কলিল, আমাদের খুড়ো-ভাইপোর ? একটু হাসিয়া বলিল, সে ব্যবস্থাও তিনি করেছেন, সাত সাতটা দিন কিছু আর চুপ করে বসে ছিলেননা। পাকা লোক, দারোগা-পুলিশ মুঠোর মধ্যে, কোশ দশেকের মধ্যে কোথাও একটা ডাকাতি হতে যা দেরি। জান ত মা, বছর দুই করে একবার খেটে এসেচি, এবার দশ বছরের মত একেবারে নিশ্চিন্ত। খুড়োর গঙ্গালাভ তার মধ্যেই হবে, তবে, আমার বয়সটা এখনও কম, হয়ত আর একবার দেশের মুখ দেখ্‌তেও পাবো। এই বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

ষোড়শী ভয় পাইয়া কহিল, হাঁরে, একি তোরা সত্যি বলে মনে করিস্ ?

সাগর বলিল, মনে করি ? এ তো চোখের ওপর স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্চি মা। জেলের বাইরে আমাদের রাখ্‌তে পারে এ সাধ্যি আর কারও নেই। বেশি নয়, দুমাস একমাস দেরি, হয়ত নিজের চোখেই দেখে যেতে পারবে মা।

ষোড়শী কহিল, আর যারা আজ ওখানে গেছে, তাদের ?

সাগর বলিল, তাদের অবস্থা আমাদের চেয়েও মন্দ। জেলের মধ্যে খেতে দেয়, যাহোক্ আমরা দুটো খেতে পাবো, কিন্তু এরা তাও পাবেনা। নালিশগুলো সব ডিক্রি হতে যা বিলম্ব, তার পরে রায়মশায়ের নিজ জোতে জন খেটে দু মুটো জোটে ভাল, না হয় আসামের চা বাগান ত আছেই। কেন মা, তোমারই কি মনে পড়েনা ওই বেনের-ডাঙাটায় আগে আমাদের কত ঘর ভূমিজ, বাউরির বস্‌তি ছিল, কিন্তু আজ তারা কোথায় ? কতক গেল কয়লা খুঁড়্‌তে, কতক গেল চালান হয়ে চা বাগানে। কিন্তু, আমি দেখেচি ছেলেবেলায় তাদের জমি-জমা, হাল-বলদ। দু মুটো ধানের সংস্থান তাদের সবাইয়ের ছিল। আজ তাদের অর্দ্ধেক এককড়ি নন্দীর, অর্দ্ধেক রায়মশায়ের।

ষোড়শী স্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া সমস্ত ব্যাপারের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে লাগিল। এই সেদিন যাহারা দল বাঁধিয়া তাহার আশ্রয় চাহিতে আসিয়াছিল, আজ অক্ষম জানিয়া প্রবলের চোখের ইঙ্গিতে তাহারি বিরুদ্ধে তাহারা মন্ত্রণা করিতে একত্র হইয়াছে,—সেদিনের সমস্ত সঙ্কল্প তাহাদের কোথায় ভাসিয়া গেল। যে প্রবল, যে ধনবান, যে ধর্ম্ম-জ্ঞান বিরহিত তাহার অত্যাচার হইতে বাঁচিবার কোন পথ দুর্ব্বলের নাই। কোথাও ইহার নালিশ চলেনা, ইহার বিচার করিবার কেহ নাই,—ভগবান কান

দেননা, সংসারে চিরদিন ইহা অবারিত চলিয়া আসিতেছে। এই যে আজ এতগুলি লোক গিয়া একটিমাত্র প্রবলের পদতলে তাহাদের বিবেক, ধর্ম্ম, মনুষ্যত্ব সমস্ত উজাড় করিয়া দিয়া কোন মতে বাঁচিয়া থাকিবার একটু-খানি আশ্বাস লইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিল, ইহার লজ্জা, ইহার দৈন্য ইহার ব্যথা যত বড়ই হোক, যতদূর দেখা যায়, এই দুঃখীদের এই ক্ষুদ্র কৌশল-টুকু ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছুই চোখে পড়েনা! যে অন্যায় এতগুলি মানুষকে এমন অমানুষ করিয়া দিল, তাহাকে প্রতিহত করিবার শক্তি এতবড় বিশ্ব-বিধানে কই? এই যে সাগর সর্দ্দার সেদিন পীড়িতের পক্ষ গ্রহণ করিয়াছিল, দুর্ব্বলের এতবড় স্পর্দ্ধার সহস্র গুণ বড় দণ্ড তাহার তোলা আছে,—অব্যাহতির কোন পথ নাই। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা সাগর, এ সব তুই শুন্‌লি কার মুখে?

সাগর কহিল, স্বয়ং হুজুরের মুখে।

"তাহলে এ সকল তাঁরই মৎলব?"

সাগর চিন্তা করিয়া কহিল, কি জানি মা, কিন্তু মনে হয় রায়মশায়ও আছেন।

ষোড়শী এক মুহূর্ত্ত স্থির থাকিয়া বলিল, আচ্ছা সাগর, তুই বল্‌তে পারিস্ জমিদার আমার প্রতি অত্যাচার করেননা কেন? আমি ত ভাঙা কুঁড়েয় একা থাকি, ইচ্ছে করলেই ত পারেন?

সাগর হাসিল, কহিল, কে তোমাকে বল্‌লে মা তুমি একলা থাকো? মা, আমাদের নিজের পরিচয় নিজে দিতে নেই গুরুর নিষেধ আছে,—বলিতে বলিতে সহসা তাহার বলিষ্ঠ দক্ষিণ হাতের পাঁচটা আঙুল লাঠির গায়ে যেন ইস্পাতের সাঁড়াসির মত চাপিয়া বসিল, কহিল, যার ভয়ে চণ্ডীর মন্দিরে না বসে ষোল আনা বস্‌তে গেল আজ এককড়ির কাছারী

বাড়ীতে তারই ভয়ে কেউ তোমার ত্রিসীমায় ঘেঁসেনা। হরিহর সর্দ্দারের ভাইপো সাগরের নাম দশ-বিশ ক্রোশের লোকে জানে, তোমার উপর অত্যাচার করবার মানুষ ত মা, পঞ্চাশখানা গ্রামে কেউ খুঁজে পাবেনা।

ষোড়শীর দুই চক্ষু অকস্মাৎ জ্বলিয়া উঠিল, কহিল, সাগর, এ কি সত্যি?

সাগর হেঁট হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার হাতের লাঠিটা ষোড়শীর পায়ের নীচে রাখিয়া দিয়া কহিল, বেশ ত মা, সেই আশীর্ব্বাদই কর না যেন কথা আমার মিথ্যে না হয়।

ষোড়শীর চোখের দৃষ্টি একবার একটুখানি কোমল হইয়াই আবার তেম্‌নি জ্বলিতে লাগিল, কহিল, আচ্ছা, সাগর আমি ত শুনেচি তোদের প্রাণের ভয় করতে নেই?

সাগর সহাস্যে কহিল, মিথ্যে শুনেচ তাও ত আমি বল্‌চিনে মা।

ষোড়শী কহিল, কেবল প্রাণ দিতেই পারিস্ আর নিতে পারিস্‌নে?

সাগর কহিল, একটা হুকুম দিয়ে আজ রাত্রেই কেন যাচাই করনা মা? এই বলিয়া সে ষোড়শীর মুখের উপর দুই চোখ মেলিয়া ধরিতে ষোড়শী বিস্ময়ে ও ভয়ে একেবারে নির্ব্বাক হইয়া গেল। সাগরের চাহনি এক-পলকে বদ্‌লাইয়া গেছে। সেই স্বাভাবিক দীপ্তি নাই, সে তেজ নাই, সে কোমলতা কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে—নিষ্প্রভ, সঙ্কুচিত, গভীর দৃষ্টি—এ যেন আর সে সাগর নয়, এ যেন আর কেহ। সাগর কথা কহিল। কণ্ঠস্বর শান্ত, কঠিন, অত্যন্ত ভারি। কহিল, রাত বেশি হয়নি—ঢের সময় আছে। মা চণ্ডীর কপাট তাই এখনো খোলা আছে, মা, আমি তোমার হুকুম শুন্‌তে পেয়েচি। বেশ, তাই হবে মা, পাপের শেষ করে দেব—কাল সকালেই শুন্‌তে পাবে, তোমার সাগর সর্দ্দার মিছে অহঙ্কার করে যায়নি। তাহার পিতৃপিতামহের হাতের সুদীর্ঘ লাঠিখানা ত

ষোড়শীর পায়ের কাছে পড়িয়া ছিল, হেঁট হইয়া তৎক্ষণাৎ তুলিয়া লইয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল। ষোড়শী কথা কহিতে গেল, তাহার ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল, নিষেধ করিতে চাহিল কণ্ঠে স্বর ফুটিলনা, ভূমিকম্পের সমুদ্রের মত অকস্মাৎ সমস্ত বুক জুড়িয়া দোলা উঠিল, এবং নিমিষের জন্য সাগরের এই একান্ত অপরিচিত ঘাতকের মূর্ত্তি তাহার চোখের উপর হইতে অদৃশ্য হইয়া গেল। সাগর কি যেন একটা কহিল, কিন্তু সে বুঝিতে পারিলনা, কেবল এইটুকু মাত্র উপলব্ধি করিল যে সে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া দ্রুতবেগে বাহির হইয়া যাইতেছে।

ষোড়শীর যখন চেতনা ফিরিয়া আসিল, তখন সাগর চলিয়া গেছে। মন্দিরের ভৃত্য ডাকিয়া কহিল, মা, এইবার দোর বন্ধ করি ?

কর, বলিয়া সে চাবির জন্য দাঁড়াইয়া রহিল। ছেলেবেলা হইতে জীবনটা তাহার যথেষ্ট সুখেরও নয়, নিছক আরামেও দিন কাটে নাই ; বিশেষ করিয়া যে অশুভ মুহূর্ত্তে বীজগ্রামের নূতন জমিদার চণ্ডীগড়ে পদার্পণ করিয়াছেন, তখন হইতে উপদ্রবের ঘূর্ণা হাওয়া তাহাকে অনুক্ষণ ঘেরিয়া নিরন্তর অশান্ত, চঞ্চল ও বিশ্রামবিহীন করিয়া রাখিয়াছে। তবুও সে সকল সমুদ্রের কাছে গোষ্পদের ন্যায়, আজ যেখানে সাগর সর্দ্দার তাহাকে এইমাত্র নিক্ষেপ করিয়া অন্তর্হিত হইল। অথচ, যথার্থই সে যে এতবড় ভয়ঙ্কর কিছু একটা এই রাত্রির মধ্যে করিয়া উঠিতে পারিবে, ইহা এমনি অসম্ভব যে ষোড়শী বিশ্বাস করিলনা। অথবা, এ আশঙ্কাও তাহার মনের মধ্যে সত্য সত্যই স্থান পাইলনা যে, যে-লোক হত্যা, রক্তপাত ও হিংসার সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র ও আয়োজনে পরিবৃত হইয়া অহর্নিশি বাস করে, পাপ তাহার যত বড়ই হোক, কেবলমাত্র সাগরের লাঠির জোরেই তাহার পরিসমাপ্তি ঘটিবে। তথাপি দৈব বলিয়া যে শক্তির কাছে সকল অঘটনই হার মানে, তাহারই ভয়ে বুকের মধ্যে তাহার মুগুরের ঘা পড়িতে লাগিল। মন্দির-দ্বারে তালা বন্ধ করিয়া ভৃত্য চাবির গোছা হাতে আনিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, রাত অনেক হয়েছে, মা, সঙ্গে যেতে হবে কি ?

ষোড়শী মুখ তুলিয়া অন্যমনস্কের মত প্রশ্ন করিল, কোথায় বলাই ?

তোমাকে পৌঁছে দিতে মা।

পৌঁছে দিতে? না:—বলিয়া ষোড়শী ধীরে ধীরে স্বপ্নাবিষ্টের মত বাহির হইয়া গেল। প্রত্যহের মত এই পথটুকু মধ্যেও অতিসতর্কতা আজ তাহার মনেই হইলনা। রাত্রি প্রগাঢ় অন্ধকার, কিন্তু এ কয়দিনের ন্যায় ঝাপসা মেঘের আচ্ছাদন আজ ছিলনা। স্বচ্ছ, নির্ম্মল,—কৃষ্ণা-দ্বাদশীর কালো আকাশ এইমাত্র যেন কোন্ অদৃশ্য পারাবারে স্নান করিয়া উঠিয়া আসিয়াছে, তাহার আর্দ্র মাথায় এখনো যেন জল মাখানো রহিয়াছে। মন্দির হইতে ষোড়শীর কুটীরখানির ব্যবধান যৎসামান্য; এই আঁকা-বাঁকা পায়ে-হাঁটা ধূসর পদ রেখাটির উপরে একটি স্নিগ্ধ আলোক অসংখ্য নক্ষত্রলোক হইতে ঝরিয়া পড়িয়াছে; তাহারই উপর দিয়া সে নিঃশব্দ পদক্ষেপে তাহার ঘরের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল।

যে চৈত্রের এই কয়টা দিন গ্রামে জন-মজুর মিলেনা, তথাপি তাহার অনুগত ভক্ত প্রজারা আঙ্গিনার চারিদিকে শক্ত করিয়া বাঁশের বেড়া বাঁধিয়া দিয়াছে এবং জীর্ণ কুটীরের কিছু কিছু সংস্কার করিয়া তাহারি গায়ে একখানি ছোট চালা রাঁধিবার জন্য তৈরি করিয়া দিয়াছে। পুরাতন অর্গল নূতন হইয়াছে, এবং দেয়ালের গায়ে ফাটা ও গর্ত্ত যত ছিল, বুজাইয়া নিকিয়া মুছিয়া ঘরটিকে অনেকটা বাসোপযোগী করিয়া তুলিয়াছে। তালা খুলিয়া ষোড়শী এই ঘরের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং আলো জ্বালিয়া সেইখানেই মাটির উপরে বসিয়া পড়িল। প্রতিদিনের ন্যায় আজিও তাহার অনেক কাজ বাকি ছিল। রাত্রে রান্নার হাঙ্গামা তাহার ছিল না বটে; দেবীর প্রসাদ যাহা কিছু আঁচলে বাঁধিয়া সঙ্গে আনিত, তাহাতেই চলিয়া যাইত, কিছু আহ্নিক প্রভৃতি নিত্যকর্ম্মগুলি সে সর্ব্বসমক্ষে মন্দিরে না করিয়া নির্জ্জন গৃহের মধ্যেই সম্পন্ন করিত, তাহার পরে অনেক রাত্রি জাগিয়া ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিত। এ সকল তাহার প্রতিদিনের নিয়ম; তাই

প্রতিদিনের মত আজও তাহার মনের মধ্যে অসমাপ্ত কর্ম্মের তাগিদ উঠিতে লাগিল, কিন্তু পা দুটা কোনমতেই আজ খাড়া হইতে চাহিলনা; এবং যে দরজা উন্মুক্ত রহিল, উঠি উঠি করিয়াও তাহাকে সে বন্ধ না করিয়া তেম্‌নি জড়ের মত স্থির হইয়া প্রদীপের সম্মুখে বসিয়া রহিল।

সে সাগরের কথা ভাবিতেছিল। মন্দিরের অনতিদূরবর্ত্তী ভূমিজ পল্লীস্থ এই দুঃস্থ ও দুরন্ত লোকগুলিকে সে শিশুকাল হইতেই ভালবাসিত, এবং বড় হইয়া ইহাদের দুঃখ দুর্দ্দশার চিহ্ন যতই বেশী করিয়া তাহার চোখে পড়িতে লাগিল ততই স্নেহ তাহার সন্তানের প্রতি মাতৃস্নেহের ন্যায় দৃঢ় ও গভীর হইয়া উঠিতে লাগিল। সে দেখিল চণ্ডীগড়ের ইহারাই একপ্রকার আদিম অধিবাসী, এবং একদিন সকলেই ইহারা গৃহস্থ কৃষক ছিল; কিন্তু আজ অধিকাংশই ভূমিহীন,—পরের ক্ষেত্রে মজুরী করিয়া বহুদুঃখে দিন-পাত করে। সমস্ত জমিজমা হয় জনার্দ্দন, না হয় জমিদারের কর্ম্মচারী স্বনামে বেনামে গলিয়া খাইয়াছে। ভূতপূর্ব্ব ভৈরবীদের আমলে দেবীর অনেক জমি মন্দিরের নিজ জোতে ছিল, তাঁহাদের যথেচ্ছামত সেগুলি প্রতিবৎসর ভাগে বিলি হইত, এবং এই উপলক্ষে প্রজায় প্রজায় দাঙ্গা হাঙ্গামার অবধি থাকিতনা। অথচ, লাভ কিছুই ছিলনা। তত্ত্বাবধান ও বন্দোবস্তের অভাবে প্রাপ্য অংশের কিছু বা প্রজারা লুটিয়া খাইত, এবং অবশিষ্ট আদায় যদি বা হইত অপব্যয়েই নিঃশেষ হইত। এই সকল ভূমিই সে ভূমিহীন ভূমিজ প্রজাদিগকে বছর ছয় সাত পূর্ব্বে ফকির সাহেবের নির্দ্দেশ মতে নির্দ্দিষ্ট হারে বন্দোবস্ত করিয়া দেয়। জনার্দ্দন রায় ও এককড়ি নন্দীর সহিত তাহার বিবাদের সূত্রপাতও তখন হইতে। এবং সেই কলহই পর-বর্ত্তী কালে নানা অজুহাতে নানা তুচ্ছ কাজে আজ এই আকারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সাগর ও হরিহর সর্দ্দার তখন জেল খাটিতেছিল; খালাস

পাইয়া তাহারা মন্দিরে ষোড়শীর কাছে আসিয়া একদিন হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইল। কহিল, মা, আমরা খুড়োভাইপোয়েই কি কেবল কূল-কিনারা পাবোনা, শুধু ভেসে-ভেসে বেড়াব?

ষোড়শী রাগ করিয়া কহিল, তোরা ভাসতে যাবি কেন হরিহর—জেলের অন্ন সব বাড়ীঘর হয়েছে তো, কিসের জন্যে?

সাগর নিঃশব্দে মুখ ফিরাইয়া মাথা হেঁট করিয়া রহিল; কিন্তু বুড়া হরিহর তেমনি জোড়হাতে কহিল, মা, আমরা তোমার কুপুত্র বলে তুমিও কি কুমাতা হবে? আমাদেরও একটা পথ করে দাও।

ষোড়শী একটু নরম হইয়া কহিল, তোমার কথাগুলি ত ভাল হরিহর, তা ছাড়া তুমি বুড়ো হয়েও গেছ, কিন্তু তোমার ভাইপোটি ত অহঙ্কারে মুখ ফিরিয়ে রইল, দোষটুকু পর্য্যন্ত স্বীকার করলেনা,—ও কি কখনো শান্ত হতে পারবে?

হরিহর নিজের সর্ব্বাঙ্গে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, বুড়ো হয়ে গেছি, না মা? চুলগুলোও সব পেকে গেছে,—এই বলিয়া সে মুচকিয়া একটু হাসিতেই সাগরের সমস্ত মুখ শান্ত হাসিতে দীপ্ত হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্তে, খুড়া ভাইপোর চোখে চোখে নিঃশব্দে বোধ হয় এই কথাই হইয়া গেল যে, এই ভাল। তোমার এই প্রাচীন বাহু দুটির শক্তির কোন সংবাদ যে রাখেনা, তাহার কাছে এমনি সহাস্যে সবিনয়ে স্বীকার করাই সবচেয়ে শোভন।

বুড়া কহিল, অহঙ্কার নয় মা, অভিমান। ওটুকু ও পারে করতে,—সাগর কখনো ডাকাতি করেনা।

ষোড়শী আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, ও কি তবে বিনাদোষে শাস্তি ভোগ করলে? যা সবাই জানে, তা সত্যি নয়—এই কি আমাকে তুমি বোঝাতে চাও.

হরিহর? তাহার অবিশ্বাসের কণ্ঠস্বর অকারণে অত্যন্ত কঠোর হইয়া বাজিল। তথাপি বুড়া হরিহর কি একটা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু ভাইপো সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে বাধা দিল। কহিল, কি হবে মা, তোমার সে কথা শুনে? তোমরা ভদ্রলোকেরা যখন আমাদের ছোটলোকের কথা বিশ্বাস করতে পারবেনা মা, ভদ্রলোকেরা যখন আমাদের সর্ব্বস্ব কেড়ে নিলে সেও সত্যি, পাওনার [illegible] বাবু যখন জেলে দিলে সেও তেমনি সত্য সাক্ষীর জোরে। জজ সাহেবের আদালত থেকে মা চণ্ডীর মন্দির পর্য্যন্ত ছোটলোকের কথা বিশ্বাস করবার ত কেউ নেই মা! চল, ছোট খুড়ো, আমরা ঘরে যাই। এই বলিয়া সে চট্ করিয়া হেঁট হইয়া ভৈরবীর পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া প্রস্থান করিল। হরিহর নিজেও প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিয়া সলজ্জ কণ্ঠে কহিল, রাগ কোরোনা মা, ও ব্যাটা ঐ রকম গোঁয়ার, ও কথা কারু সইতে পারেনা। বলিয়া সেও ভ্রাতুষ্পুত্রের অনুসরণ করিল।

হোক ইহারা অন্ত্যজ, হোক ইহারা শূদ্র; যতক্ষণ দেখা গেল ষোড়শী স্তব্ধ বিস্ময়ে এই হীনবীর্য্য, অবমানিত, অধঃপতিত বাংলা দেশের এই দুটি সুস্থ, নির্ভীক ও পরম শক্তিমান পুরুষদিগের [illegible] চাহিয়া রহিল।

পরদিন প্রভাতেই ষোড়শী সাগরকে ডাকাইয়া [illegible] নিয়া কহিল, তোদের কাছে বাবা, কাল আমি অন্যায় করেছি। বিঘে দশ পনর জমি আমারি এখনো আছে, তোরা খুড়ো-ভাইপোতে তাই ভাগ করে নে। মায়ের খাজনা তোরা যা' খুসি দিস্, কিন্তু অসৎ পথে আর কখনো পা দিবিনে এই আমার সর্ত্ত।

সেই অবধি সাগর ও হরিহর তাহার ক্রীতদাস। তাহার সকল কর্ম্মে সকল সম্পদে তাহারা ছায়ার মত অনুসরণ করিয়াছে, সকল বিপদে বুক দিয়া রক্ষা করিয়াছে। এই যে ভাঙ্গা কুটীর, এই যে সঙ্গীবিহীন বিপদাপন্ন জীবন,

তবু যে কেহ তাহার কেশাগ্র স্পর্শ করিবার দুঃসাহস করেনা, সে যে কিসের ভয়ে এ কথা ত তাহার অবিদিত নাই। তথাপি, সেই সাগরের যে মূর্ত্তি আজ সে চোখে দেখিয়া আসিল তাহাতে ভরসা করিবার, বিশ্বাস করিবার আর তাহার কিছুই রহিলনা। সে ডাকাতি করে কিনা বলা কঠিন; কিন্তু প্রয়োজন বোধ করিলে তাহার অসাধ্য কিছু নাই,—তাহার সমস্ত আয়োজন ও উপকরণ আজও ... সজীব আছে,—এবং মুহূর্ত্তের আহ্বানে তাহারা আজও তেমনি সাজিয়া দাঁড়াইতে পারে, এ সংশয় আর ত ঠেকাইয়া রাখা যায়না।

... একখানা কাগজের টুকরা একপাশে পড়িয়া ছিল, অন্যমনস্ক ভাবে হাতে তুলিয়া লইতেই তাহার প্রদীপের আলোকে চোখে পড়িল, হৈমর চিঠির জবাবে সেদিন যে চিঠিখানা সে লিখিয়াও ভাল হইলনা ভাবিয়া ছিঁড়িয়া ... আর একখানা লিখিয়া পাঠাইয়াছিল, ইহা তাহারই অংশ। অনেক ... কাটিয়া দীর্ঘ ... যখন শেষ হয় তখন একবার যেন সন্দেহ হইয়া ইতিপূর্ব্বেও ... সকলেই হইত,—পরের কাছে আপনাকে এমন ... সেই সাগরের ... তেই ঠিক হইলনা, কিন্তু নিদ্রাহীন সেই ... রাতে ঠিক ... চেষ্টাও আর তাহার ছিলনা। কিন্তু পরদিন ডাকে ফেলিয়া দিতে যখন পাঠাইল, তখন না পড়িয়াই পাঠাইয়া দিল,—তাহার ভয় হইল পাছে ইহাও সে ছিঁড়িয়া ফেলে—পাছে আজও তাহার হৈমকে উত্তর দেওয়া ঘটিয়া না উঠে। এ কয়দিন যাহা ভুলিয়াছিল, আজ একে একে সেই চিঠির কথাগুলাই মনে পড়িয়া তাহার ভারি লজ্জা করিতে লাগিল,—ভয় হইতে লাগিল পাছে তাহার নির্য্যাতনের কাহিনীটুকু কেহ ভুল বুঝিয়া তাহাকে রক্ষা করিতে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই হৈম ও তাহার স্বামীকে মনে পড়িলেই মন যেন তাহার কেমন বিবশ হইয়া আসিত।

ইহাদের শৃঙ্খলিত জীবন-যাত্রার ধারার সহিত তাহার বিশেষ পরিচয় নাই, তবুও কেমন করিয়া যে স্বপ্ন রচিয়া উঠিত, কেমন করিয়া যে কাজের চিন্তা তাহার এলোমেলো কল্পনায় পর্য্য সিক্ত হইত, কখনো হৈম, কখনো নির্ম্মলের সূত্র ধরিয়া কি করিয়া যে ইহাই একসময়ে ... সংযমের বেড়া ভাঙ্গিয়া অকস্মাৎ লজ্জায় ফাটিয়া পড়িত, তাহা সে নিজেই ভাবিয়া পাইত না। অথচ নিজের মনের এই মোহাবিষ্ট লক্ষ্যহীন গতিকে সে চিনিত, ভয় করিত, লজ্জা করিত ... শক্তি দিয়া বর্জ্জন করিতে চাহিত। সেই উতলা আবেগের আক্রমণ ... রক্ষা করিতে প... খণ্ড খানখান করিয়া ফেলিয়া দিয়া শক্ত হইয়া বসিল। মনে মনে দৃঢ়বলে কহিল, কিসের জন্য হৈমদের এত কথা আমি বলিতে গেলাম! কোন্ সাহায্য তাহাদের কাছে আমি ভিক্ষা করিয়া লইব? কিসের জন্য ... হইব? দেবীর ভৈরবীপদের মধ্যে কি আছে যে, এমন করিয়া আঁকড়াইয়া থাকিব? যে কেহ নিক্ না, কি আমার আসিয়া যায়? ইহারা সবাই ত চোর ডাকাত। যাহার যত শক্তি সে তত বড়ই দস্যু। সুবিধা ও সামর্থ্য ... অপর... কাড়িয়া লওয়াই ইহাদের কাজ। ... সংসার ... চোর ... মানুষের ব্যবসা! পীড়িত ও পীড়কের ম... ... শি এমন ভয়ে ভয়ে আছি! কিসের ... উঠিয়া দাঁড়াইয়া কিসের জন্য এতবড় বিরোধ সৃষ্টি করিয়াছি! নহিলে, জমিদারীর আসনে ত্যাগ করা কিসের জন্য এতবড় কঠিন! মুহূর্ত্তের জন্য মনে হইল এ কাজ তাহার পক্ষে একেবারেই কঠিন নয়, কাল সকালেই সে এককড়ি ও জনার্দ্দন রায়কে লিখিয়া পাঠাইয়া ভৈরবীর সকল দায়িত্ব স্বচ্ছন্দে ফিরাইয়া দিতে পারে, কোথাও কোন টান্, কোন ব্যথা তাহার বাজিবে না।

ষোড়শী উঠিয়া দাঁড়াইল। পাশের কুলুঙ্গিতে তাহার কালি কলম ও

কাগজ থাকিত ; পাড়িয়া লইয়া এই চিঠিখানা তখনই লিখিয়া ফেলিতে প্রস্তুত হইল। তাড়াতাড়ি কয়েক ছত্র লিখিয়া ফেলিয়া সহসা তাহার লেখনী রুদ্ধ হইল। সর্দ্দার ও সাগরকে মনে পড়িল,—পৃথিবী-জোড় কাড়াকাড়ি ও দস্যুপনার মাঝখানে কেবল এই দুটি দস্যুই আজও তাহাকে ত্যাগ করে নাই। সহসা নি[illegible] কথা মনে পড়িয়া মনে হইল তার পরে ? দাঁড়াইবার কোথাও স্থান নাই—সবাই ত্যাগ করিয়াছে কাল যাহারা তাহাকে ঘেরিয়াছিল, আজ আছে,—শাসনের ভয়ে জমিদারের গৃহপ্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া তাহারা দাঁড়াইতে [illegible]ঝাইতি করিয়া আসিয়াছে। অথচ, সে বেশি দিনের কথা নয় ইহাদিগকেই,—কিন্তু থাক্ সে কথা। এই অত্যন্ত ছোটদের বিরুদ্ধে তাহার অভিযোগ নাই। এককড়ি জনার্দ্দন, শিরোমণি, তাহার পিতা তারাদাস, আর এই জমিদার,—[illegible] পুরানো ও নূতন অনেক কথা,—কিন্তু সেও থাক্ ; এ আলোচনাতে আজ আর কাজ নাই। তাহার ফকির সাহেবকে মনে পড়িল। তিনি যে [illegible] করিয়া অকস্মাৎ চলিয়া গেলেন তাহার জানা নাই। ইতিপূর্ব্বেও [illegible] হেতু, কাহারও বিরুদ্ধে কোন অনুযোগ করিয়া [illegible] হইলে তিনি নীরবে চলিয়া গেছেন ; স্নেহ দিয়া [illegible] ও আর তাহার [illegible] কোন অবসর কাহাকেও দেন নাই,—[illegible] দিতে, ইহাই তাঁহার [illegible] পদ্ধতি। তবুও কেমন করিয়া যেন ষোড়শী [illegible] মনের মধ্যে ব্যথা একটা বিঁধিয়াই ছিল, তাঁহার এই যাওয়াটাকে কোন ক্রমেই সে তাঁহার অভ্যাস বলিয়া সান্ত্বনা লাভ করিতে পারিতেছিলনা। তিনি মাঝে মাঝে তাহার কথার প্রত্যুত্তরে বলিতেন, মা, আমি নিজের সঙ্গেই সম্বন্ধ ছেদ ক'রতে চাই, লোকের সঙ্গে নয়। তাই, লোকালয়ের মায়া কাটাতে পারিনে,—মানুষের মাঝখানে বাস করতেই ভালবাসি। তুমিও

তোমার দেহটাকে যখন দেবতাকেই দিয়েছ, তখন সেই কথাটাই সকলের আগে মনে রেখো। কোন ছলে নিজের বলে যেন ভুল না হয়। দেবতার সঙ্গে আপনাকে জড়িয়ে আত্মবঞ্চনার চেয়ে বরঞ্চ দেবতাকে ছাড়াও ভাল। আজ এই বঞ্চনাই ত তাহাকে জালের মত জড়াইয়া ধরিতেছে। আজ যদি তিনি থাকিতেন! আর একবার যদি সে তাঁহার পায়ের কাছে গিয়া বসিতে পারিত! বহুপূর্বে ... তিনি বলিয়াছিলেন, মা, যখন আমাকে তোমার যথার্থ প্রয়োজন হবে, ... ডাকবে, যেখানেই থাকি আমি তখনি এসে দাঁড়াব। আজ ত তার সেই প্রয়োজন!

ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই বাহিরে হইতে ডাক আসিল, একবার ভিতরে আস্‌তে পারি কি?

ষোড়শীর বিক্ষিপ্ত উদ্‌ভ্রান্ত চিত্ত চক্ষের পলকে সচেতন হইয়া পরক্ষণেই আবার যেন আচ্ছন্ন হইয়া গেল। ... অলৌকিক বিস্ময় সহসা যেন সে সহিতে পারিলনা। ... তোমার ...

আমি আস্‌তে পারি কি?

আসুন, বলিয়া ষোড়শী উঠিয়া দাঁড়াইয়া, চোখের জল ... আগন্তুকের পদতলে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া ... এবং উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রদীপের আলোকে চাহিয়া দেখিল ফকির সাহেব নহেন, জমিদার জীবানন্দ চৌধুরী। চক্ষে আর পলক পড়িলনা,—চোখের পাতা দুটো পর্য্যন্ত যেন পাষাণ হইয়া গেল। গৃহের দীপশিখা স্তিমিত হইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু এমন ... যে-মানুষ এক নিমিষে পা ... হইয়া গেল, তাহাকে চিনিবার ... আলো ছিল। সুতরাং এই অদ্ভুত ও অকারণ উচ্ছ্বসিত ভক্তির উপলক্ষ যে সত্যই সে নয় আর কেহ, তাহা অনুভব করিয়া জীবানন্দর ভয় ভাঙিল। গম্ভীর মুখে কহিল, এরূপ পতিভক্তি কলিকালে দুর্লভ। আমার পাদ্য-অর্ঘ্য আসনাদি কই?

ষোড়শী স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার এই হতভাগ্য জীবনে সে অনেককে দেখিয়াছে। সে জনার্দ্দনকে দেখিয়াছে, সে এককড়ি নন্দীকে দেখিয়াছে, সে তাহার আপনার পিতাকে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠরূপে দেখিয়াছে; কিন্তু মানুষের পাষণ্ডতা যে এতদূরে উঠিতে পারে, এ কথা উপলব্ধি করিয়া তাহার ধাক্কা সামলাইতে তাহার [illegible] লাগিল। জীবানন্দ এদিক ওদিক চাহিয়া বাঁশের আলনা [illegible] লের আসনখানি পাড়িয়া লইল; পাতিতে [illegible] খোলা দরজার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, খিল্‌টা একেবারে দিয়েই ব[illegible]নে কেন? তোমার সাগর চাঁদটি শুনেচি নাকি আমাকে তেমন ভালবাসে না। কাছাকাছি কোথাও আছেন নিশ্চয়,—এসে পড়লে হয়ত বা কিছু মনেই করবে। ছোটলোক বইত নয়। বলিয়া সে এইবার একটু হাসিল। ষোড়শীর গা কাঁপিতে লাগিল। [illegible] নিশ্চয় [illegible] লোকটা একাকী আসে নাই, তাহার লোকজন [illegible] লুকাইয়া আছে, এবং সম্ভবতঃ এই সুযোগই সে প্রত্যহ প্রতীক্ষা করি[illegible]। আজ ভীষণ কিছু একটা করিতে পারে,—হত্যা [illegible] ও আর নয়। এবং এই উদ্বেগ কণ্ঠস্বরে সে সম্পূর্ণ গোপন [illegible] পারিয়া কহিল, আপনি এখানে এসেছেন কেন?

জীবানন্দ কহিল, তোমাকে দেখতে। একটু ভয় পেয়েচ বোধ হচ্চে,—[illegible]রারই কথা। কিন্তু তাই বলে চেঁচিয়োনা। সঙ্গে গাদা পিস্তল আছে, তোমার ডাকাতের দল শুধু মারাই পড়বে, আর বিশেষ কিছু করতে পারবেনা। এই বলিয়া সে পকেট হইতে রিভলভার বাহির করিয়া পুনশ্চ পকেটেই রাখিয়া দিয়া কহিল, কিন্তু দোরটা বন্ধ করে দিয়ে একটু নিশ্চিন্ত হওয়াই যাকনা। এই বলিয়া সে ষোড়শীর মুখপানে চাহিয়া

একটু হাসিল, এবং অগ্রসর হইয়া দ্বার অর্গল-বদ্ধ করিয়া দিল, যাহার গৃহ তাহার অনুমতির অপেক্ষা মাত্র করিলনা।

ষোড়শীর মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল। একবার কথা কহিতে গিয়া তাহার কণ্ঠে বাধিল, তার পরে স্বর যখন ফুটিল, তখন সেই স্বর ভয়ে কাঁপিতে লাগিল, কহিল, সাগর নেই—

জীবানন্দ বলিল, নেই? ব্যাটা গেল কোথায়?

ষোড়শী কহিল, আপনারা জানেন বলেই ত—

জীবানন্দ কহিল, জানি বলে? কিন্তু আপনারা কারা? আমি ত বাপ্পও জানতামনা।

ষোড়শী বলিল, নিরাশ্রয় বলেই ত লোক নিয়ে আমাকে মারতে এসেছেন। কিন্তু আপনার কি করেছি আমি?

জীবানন্দ কহিল, লোক নিয়ে মারতে এসেচি! তোমাকে? মাইরি না! বরঞ্চ মন কেমন করছিল বলে দেখতে এসেচি।

ষোড়শী আর কথা কহিলনা। তাহার চোখে জল আসিতেছিল, এই কদর্য্য উপহাসে তাহা একেবারে শুকাইয়া গেল। এবং সেই শুষ্ক চক্ষু ভূমিতলে নিবদ্ধ করিয়া সে নিঃশব্দে বসিয়া রহিল; এবং অদূরে বসিয়া আর একজন তাহারই আনত মুখের প্রতি লুব্ধ, তৃষিত দৃষ্টি স্থির করিয়া তাহারি মত চুপ করিয়া রহিল।

অলকা ?

বলুন।

তোমার এখানে তামাক-টামাকের ব্যবস্থা নেই বুঝি ?

ষোড়শী একবার মুখ তুলিয়াই আবার অধোমুখে স্থির হইয়া রহিল। জবাব না পাইয়া জীবানন্দ সজোরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করিয়া বলিল, ব্রজেশ্বরের কপাল ভাল ছিল। দেবী-রাণী তাকে ধরে আনিয়েছিল সত্যি, কিন্তু অম্বুরি তামাক খাইয়েছিল, এবং ভোজনান্তে দক্ষিণা দিয়েছিল। বিয়ের পালাটা আর তুল্‌বনা, বলি, বঙ্কিমবাবুর বইখানা পড়েচ ত ?

ষোড়শী স্থির করিয়াছিল এই পাষণ্ড আজ তাহাকে যত অপমানই করুক সে নিরুত্তরে সহ্য করিবে, কিন্তু জীবানন্দের কণ্ঠস্বরের শেষ দিকটায় হঠাৎ কেমন যেন তাহার সঙ্কল্প ভাঙিয়া দিল ; বলিয়া ফেলিল, আপনাকে ধরে আন্‌লে সেই মত ব্যবস্থাও থাকৃত—অনুযোগ করতে হোতোনা।

জীবানন্দ হাসিল, কহিল, তা' বটে। টানা-হেঁচ্‌ড়া দড়ি-দড়ার বাঁধাবাঁধিই মানুষের নজরে পড়ে। ভোজপুরী পেয়াদা পাঠিয়ে ধরে আনাটাই পাড়াশুদ্ধ সকলে দেখে ; কিন্তু যে পেয়াদাটিকে চোখে দেখা যায়না,—হাঁ, অলকা তোমাদের শাস্ত্রগ্রন্থে তাঁকে কি বলে ? অতনু, না ? বেশ তিনি।

ষোড়শী আরক্ত অধোমুখে নির্ব্বাক হইয়া রহিল। জীবানন্দ কহিল, যৎসামান্য অনুরোধ ছিল, কিন্তু আজ উঠি। তোমার অনুচরগুলো সন্ধান

পেলে ঠিক জামাই-আদর করবেনা, এমন কি, শ্বশুর-বাড়ী এসেচি বলে হয় ত বিশ্বাস করতেই চাইবেনা,—ভাববে প্রাণের দায়ে বুঝি মিথ্যেই বল্‌চি।

ষোড়শী কোন কথাই কহিলনা; এই কদর্য্য পরিহাসে অন্তরে সে যে কিরূপ লজ্জা বোধ করিল মুখ তুলিয়া তাহা জানিতেও দিলনা!

জবাব না পাইয়া জীবানন্দ মুহূর্ত্ত কয়েক তাহার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া সত্যই উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, অম্বুরি তামাকের ধূঁয়া আপাততঃ পেটে না গেলেও চলবে; কিন্তু ধূঁয়া নয় এমন কিছু একটা পেটে না গেলে আর ত দাঁড়াতে পারিনে। বাস্তবিক, নেই কিছু অলকা?

ষোড়শী চুপ করিয়াই থাকিত, কিন্তু, তাহার নাম ধরিয়া শেষ প্রশ্নটা তাহাকে মৌন থাকিতে দিলনা, মুখ তুলিয়া বলিল, কিছু কি? মদ?

জীবানন্দ হাসিয়া মাথা নাড়িল। কহিল, এবারে ভুল হল। ওর জন্যে অন্য লোক আছে, সে তুমি নয়। তোমাকে বুঝ্‌তে পারার যথেষ্ট সুবিধে দিয়েচ—আর যা অপবাদ দিই, অস্পষ্টতার অপবাদ দিতে পারবনা। অতএব, তোমার কাছে যদি চাইতেই হয় ত, চাই এমন কিছু যা মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে, মরণের দিকে ঠেলে দেয়না। ডাল-ভাত, মেঠাই মুণ্ডা, চিড়ে-মুড়ি যা'হোক দাও, আমি খেয়ে বাঁচি। নেই?

ষোড়শী স্থির চক্ষে চাহিয়া রহিল, জীবানন্দ বলিতে লাগিল, সকালে আজ মন ভাল ছিলনা। শরীরের কথা তোলা বিড়ম্বনা, কারণ, সুস্থ দেহ যে কি, আমি জানিনে। সকালে হঠাৎ নদীর তীরে বেরিয়ে পড়লাম,—ধারে ধারে কতদূর যে হাঁটলাম বল্‌তে পারিনে,—ফির্‌তে ইচ্ছেই হ'লনা। সূর্য্যদেব অস্ত গেলেন, একলা মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কি যে ভাল

লাগ্‌ল বল্‌তে পারিনে। কেবল তোমাকে মনে পড়তে লাগলো। ফের্‌বার পথে তাই বোধ হয় আর বাড়ী গেলামনা, ক্ষিধে-তেষ্টা নিয়েই এসে দাঁড়ালাম ওই মন্‌সা গাছটার পেছনে। দেখি দোর খোলা, আলো জ্বল্‌চে। পিস্তল ছাড়া আমি এক পা বাড়াইনে—ওটা পকেটেই ছিল, তবুও গা ছম্‌-ছম্‌ করতে লাগ্‌ল। জানি ত,—বাবাজীবনরা আড়ালে আবডালে কোথাও আছেন নিশ্চয়। হঠাৎ, পাতার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখি মেঝের ওপর তুমি চুপ্‌ করে বসে। আপনাকে আর সামলাতে পারলামনা। বাস্তবিক, নেই কিছু?

ষোড়শী এক মুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, কিন্তু-বাড়ী গিয়ে ত অনায়াসে খেতে পারবেন।

জীবানন্দ কহিল, অর্থাৎ, আমার বাড়ীর খবর আমার চেয়ে তুমি বেশী জানো। এই বলিয়া সে একটু হাসিল। কিন্তু সে হাসি না মিলাইতেই ষোড়শী হঠাৎ বলিয়া উঠিল, আপনি সারাদিন খান্‌নি, আর বাড়ীতে আপনার খাবার ব্যবস্থা নেই এ কি কখনো হতে পারে?

একজনের কণ্ঠস্বরে উত্তেজনার আভাস গোপন রহিলনা, কিন্তু আর একজন নিতান্ত ভালমানুষটির মত শান্ত ভাবে বলিল, পারে বই কি। আমি খাইনি বলে আর একজন উপোস করে থালা সাজিয়ে পথ চেয়ে থাক্‌বে, এ ব্যবস্থা ত করে রাখিনি। আজ খামকা রাগ করলে চল্‌বে কেন অলকা! বলিয়া সে তেম্‌নি একটু মৃদু হাসিয়া কহিল, আজ আসি। কিন্তু সত্যিসত্যিই থাক্‌তে না পেরে যদি আর কোনদিন এসে পড়ি, ত রাগ করতে পাবেনা বলে যাচ্ছি।

এই লোকটির একান্ত বিশৃঙ্খল জীবনযাত্রার যে চেহারা একদিন ষোড়শী নিজের চোখে দেখিয়াছিল তাহা মনে হইল। মনে হইল

কদাচারী, মদোন্মত্ত, নিষ্ঠুর মানুষ এ নয় ; যে জমিদার মিথ্যা দিয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে, সে আর কেহ। সে আর কেহ যে সেদিন মন্দির হইতে বিদায় দিতে তাহাকে অসঙ্কোচে হুকুম দিয়াছিল! তবু একবার দ্বিধা করিল, কিন্তু পরক্ষণেই অস্ফুটে কহিল, দেবীর প্রসাদ সামান্য কিছু আছে, কিন্তু সে কি আপনি খেতে পার্‌বেন ?

পারবনা ? তাই বল! এই বলিয়া সে আসনে ফিরিয়া গিয়া চাপিয়া বসিয়া পড়িয়া কহিল, প্রসাদ খেতে পারবনা ? শীগ্‌গীর নিয়ে এসো, ঠাকুর দেবতার প্রতি আমার কিরূপ অচলা ভক্তি একবার দেখিয়ে দিই।

তাহার সুমুখের স্থানটুকু ষোড়শী জল-হাত দিয়া মুছিয়া লইল, এবং, রান্নাঘরে গিয়া শালপাতায় করিয়া ঠাকুরের প্রসাদ যাহা কিছু ছিল, বহিয়া আনিয়া জীবানন্দর সম্মুখে রাখিয়া দিয়া বলিল, দেখুন যদি খেতে পারেন।

জীবানন্দ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, সে দেখ্‌তে হবেনা, কিন্তু এ তো তোমার জন্যে ?

ষোড়শী কহিল, অর্থাৎ আপনার জন্যে আলাদা করে এনে রেখে-ছিলাম কি না, তাই জিজ্ঞেসা করচেন ?

জীবানন্দ হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, না গো না, তা জিজ্ঞেসা করিনি, আমি জিজ্ঞেসা করচি, আর নেই তো ?

ষোড়শী কহিল, না।

তা হলে এ যে পরের মুখের গ্রাস একরকম কেড়ে খাওয়া অলকা ?

ষোড়শী কহিল, পরের মুখের গ্রাস কেড়ে খেলে কি আপনার হজম হয়না ?

এ কথার উত্তর জীবানন্দ আর হাসিমুখে দিতে পারিলনা। কহিল,

কি জানি। নিশ্চয় কিছুই বলা যায়না অলকা। কিন্তু, সে যাক্, তুমি খাবে কি? বরঞ্চ, অর্দ্ধেকটা রেখে দাও।

ষোড়শী কহিল, তাতে আমারও হবেনা, আপনারও পেট ভরবেনা।

জীবানন্দ জিদ্ করিয়া কহিল, না ভরুক, কিন্তু তোমাকে ত সারারাত্রি অনাহারে থাক্‌তে হবেনা।

আজ খাবার কথা ষোড়শীর মনেও ছিলনা,—জীবানন্দ না আসিলে ও-সকল পড়িয়াই থাকিত, সে হয় ত স্পর্শও করিতনা। কিন্তু সে কথা না বলিয়া কহিল, ভৈরবীদের অনাহার অভ্যাস করতে হয়। তা' ছাড়া, আমার একটা রাত্রির কষ্টের ভাব্‌না ভেবে আপনি কষ্ট নাই পেলেন। বরঞ্চ, মিথ্যে দেরি না করে বসে যান্; ঠাকুর-দেবতার প্রসাদের প্রতি অচলা ভক্তির সাফাই প্রমাণ দিন্।

তা' দিচ্চি, কিন্তু তোমাকে বঞ্চিত করচি জেনে সে-উৎসাহ আর নেই—

বেশ, কম উৎসাহ নিয়েই সুরু করুন—এই বলিয়া ষোড়শী একটু হাসিয়া কহিল, আমাকে বঞ্চনা করায় নতুন অপরাধ আর আপনার হবে-না। কিন্তু, যা নিয়ে তর্ক চালিয়েচেন তাতে আমারি লজ্জা করচে। এবার থামুন।

জীবানন্দ আর কথা না কহিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। মিনিট দুই পরে হঠাৎ মুখ তুলিয়া তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, প্রায় পোনর বছর হল, না? আজ একটা বড় লোক হতে পারতাম।

ষোড়শী নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল। প্রায় বছর পোনর পূর্ব্বের ইঙ্গিতটা সে বুঝিল, কিন্তু শেষের কথাটা বুঝিলনা।

জীবানন্দ কহিতে লাগিল, আর সমস্ত ছেড়ে দিয়ে মদের কথাটাই ধরি। মরতে বসেচি,—সে তো নিজের চোখেই দেখে এসেচ,—কিন্তু, এমন

একটি শক্ত লোক কেউ নেই যে আমাকে মুক্ত করে দেয়। হয়ত, আজও সময় আছে, হয়ত, এখনো বাঁচ্তে পারি,—নেবে আমার ভার অচলা?

ষোড়শী অন্তরে কাঁপিয়া উঠিয়া চোখ বুজিল। সেখানে হৈম, তাহার স্বামী, তাহার ছেলে, তাহার দাসদাসী, তাহার সংসারযাত্রার অসংখ্য বিচিত্র ছবি ছায়াবাজির মত খেলিয়া গেল।

জীবানন্দ কহিল, আমার সমস্ত ভার তুমি নাও অচলা—

আত্মসমর্পণের এই আশ্চর্য্য কণ্ঠস্বর ষোড়শীকে চমকিয়া দিল। এ জীবনে এমন করিয়া কেহ তাহাকে ডাকে নাই; ইহা একেবারে নূতন; কিন্তু ভৈরবী-জীবনের সংযমের কঠোরতা তাহাকে আত্মবিস্মৃত হইতে দিলনা। সে এক মুহূর্ত্ত থামিয়া কহিল, অর্থাৎ আমার যে কলঙ্কের বিচার করেছেন, আমাকে দিয়ে তাকেই প্রতিষ্ঠিত করিয়ে নিতে চান্। আমার মা'কে ঠকাতে পেরেছিলেন, কিন্তু আমাকে পার্বেননা।

কিন্তু সে চেষ্টা ত আমি করিনি। না জেনে তোমার প্রতি দুর্ব্যবহার করেচি তা সত্যি। তোমার বিচার করেচি, কিন্তু বিশ্বাস করিনি। কেবলি মনে হয়েছে এত বড় কঠিন মেয়ে-মানুষটিকে অভিভূত করেচে, সে মানুষটি কে?

ষোড়শী আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, তারা আপনার কাছে তার নাম বলেনি?

জীবানন্দ কহিল, না। আমি বারবার জিজ্ঞাসা করেচি, তারা বারবার চুপ করে গেছে।

আপনি খান্, বলিয়া ষোড়শী স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। দুই চারি গ্রাস আহারের পর জীবানন্দ মুখ তুলিয়া বলিল, আমি বেশী খেতে পারিনে—

বেশী খেতে আপনাকে বলিনে। সাধারণ লোকে যা' খায়, তাই খান্।

আমি তাও পারিনে। খাওয়া আমার শেষ হয়ে গেছে।

ষোড়শী কহিল, না, হয়নি। প্রসাদের ওপর অভক্তি দেখালে বাবাজীবনদের ডেকে দেব।

জীবানন্দ হাসিয়া বলিল, সে তুমি পারবেনা। তোমার জোর আমি জানি। পুলিশের দল থেকে মায় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবটি পর্য্যন্ত একদিন তার নমুনা জেনে গেছেন। তোমার মা যে একদিন আমার হাতে তোমাকে সঁপে দিয়ে গেছেন এ অস্বীকার করার সাধ্য তোমার নেই।

ষোড়শী চুপ করিয়া রহিল, জীবানন্দ হাতমুখ ধুইয়া ফিরিয়া আসিয়া বসিল, কহিল, আমি যখনি একলা থাকি, সে রাত্রের কথা মনে মনে আলোচনা করে কোথা দিয়ে যে সময় কাটে বল্‌তে পারিনে। বিশেষ করে চাকরদের ঘরে পাঠানোর ভয়ে তোমার সেই হাতজোড় করে কান্না! ভোলনি বোধ হয়?

ষোড়শী কহিল, না।

জীবানন্দ বলিল, তার পরে সেই শূল ব্যথা। একলা ঘরে তুমি আর আমি। শেষে তোমার কোলেই মাথা রেখে আমার রাত কাট্‌ল। তার পরের ঘটনাগুলো আর ভাব্‌তে ভাল লাগেনা। তোমাকে ঘুষ দিতে যাবার কথা মনে হলে আমার পর্য্যন্ত যেন লজ্জায় গা শিউরে উঠে। এই সেদিন পুরীতে যখন মর-মর হোলাম, প্রফুল্ল বল্‌লে, দাদা, অলকাকে একবার আনিয়ে নিন্। আমি বোল্‌লাম, সে আস্‌বে কেন? প্রফুল্ল বল্‌লে, গায়ের জোরে। আমি বোল্‌লাম, গায়ের জোরে ধরে এনে লাভ হবে কি? সে উত্তর দিলে, ঠাকরুণ একবার আসুন ত, তারপরে এর লাভ-লোকসানের হিসেব হবে। তাকে তুমি জানোনা, কিন্তু এত বড় ভক্ত তোমার আর নেই।

এই ভক্ত লোকটির পরিচয় জানিতে ষোড়শীর কৌতূহল হইল, কিন্তু সে ইচ্ছা সে দমন করিয়া রাখিল।

জীবানন্দ কহিল, রাত অনেক হ'ল, তোমাকে আর বসিয়ে রাখ্‌তে পারিনে। এবার আমি যাই, কি বল?

ষোড়শী কহিল, আপনার কি একটা যে কাজের কথা ছিল?

কাজের কথা? কিন্তু বিশেষ কি কথা ছিল আমার আর মনে পড়্‌চেনা। এখন কেবল একটা কথাই মনে পড়্‌চে, তোমার সঙ্গে কথা কহাই আমার কাজ। বড্ড খোসামোদের মত শোনাল, না? কিন্তু এ রকম খোসামোদ করতেও যে পারি, এর আগে তাও জানতাম্‌-না। হাঁ অলকা, তোমার কি সত্যি আবার বিয়ে হয়েছিল?

ষোড়শী মুখ তুলিয়া কহিল, আবার কি রকম? সত্যি বিয়ে আমার একবার মাত্রই হয়েছে।

জীবানন্দ বলিল, আর তোমার মা যে তোমাকে আমাকে দিয়েছিলেন সেটাই কি সত্যি নয়?

ষোড়শী তৎক্ষণাৎ অসঙ্কোচে কহিল, না, সে সত্যি নয়। মা আমার সঙ্গে যে টাকাটা দিয়েছিলেন আপনি তাই শুধু নিয়েছিলেন, আমাকে নেন্‌নি। ঠকানো ছাড়া তার মধ্যে লেশমাত্র সত্যও কোথাও ছিলনা।

জীবানন্দ স্থির হইয়া বসিয়া রহিল, কোন প্রকার উত্তর দিবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করিলনা। মিনিট পাঁচেক যখন এই ভাবে কাটিয়া গেল, তখন ষোড়শী মনে মনে চঞ্চল হইয়া উঠিল, এবং ম্লান দীপশিখা উজ্জ্বল করিয়া দিবার অবসরে চাহিয়া দেখিল সে যেন হঠাৎ ধ্যানে বসিয়া গেছে। এই ধ্যান ভাঙিতে তাহার দ্বিধা বোধ হইল, কিন্তু ক্ষণেক পরে সে নিজেই

যখন কথা কহিল, তখন মনে হইল কে যেন কতদূর হইতে কথা কহিতেছে।

অলকা, এ কথা তোমার সত্য নয়।

কোন্ কথা?

জীবানন্দ কহিল, তুমি যা জেনে রেখেচ। ভেবেছিলাম সে কাহিনী কখনো কাউকে বলবনা, কিন্তু সেই কাউকের মধ্যে আজ তোমাকে ফেল্‌তে পারচিনে। তোমার মাকে ঠকিয়েছিলাম, কিন্তু তোমাকে ঠকাবার সুযোগ ভগবান আমাকে দেননি। আমার একটা অনুরোধ রাখবে?

বলুন?

জীবানন্দ কহিল, আমি সত্যবাদী নই, কিন্তু আজকের কথা আমার তুমি বিশ্বাস কর। তোমার মাকে আমি জানতুম, তাঁর মেয়েকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করার মতলব আমার ছিলনা,—ছিল কেবল তাঁর টাকাটাই লক্ষ্য, কিন্তু সে রাত্রে হাতে হাতে তোমাকে যখন পেলাম, তখন না বলে ফিরিয়ে দেবার ইচ্ছাও আর হোলোনা।

তবে কি ইচ্ছে হোলো?

জীবানন্দ কহিল, থাক্, সে তুমি আর শুন্‌তে চেয়োনা। হয়ত শেষ পর্য্যন্ত শুন্‌লে আপনিই বুঝ্‌বে, এবং সে বোঝায় ক্ষতি বই লাভ আমার হবেনা. কিন্তু এরা তোমাকে যা বুঝিয়েছিল তা তাই নয়, আমি তোমাকে ফেলে পালাইনি।

ষোড়শী এ ইঙ্গিত বুঝিল, এবং ঘৃণায় কণ্টকিত হইয়া কহিল, আপনার না-পালানোর ইতিবৃত্ত এখন ব্যক্ত করুন।

তাহার কঠোর কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করিয়া জীবানন্দ মুচকিয়া হাসিল।

কহিল, অলকা, আমি নির্ব্বোধ নই, যদি ব্যক্তই করি, তার সমস্ত ফলাফল জেনেই কোরব। তোমার মায়ের এত বড় ভয়ানক প্রস্তাবেও কেন রাজী হয়েছিলাম জানো? একজন স্ত্রীলোকের হার আমি চুরি করি; ভেবেছিলাম টাকা দিয়ে তাকে শান্ত কোরব। সে শান্ত হল, কিন্তু পুলিশের ওয়ারেণ্ট তাতে শান্ত হলনা। ছ'মাস জেলে গেলাম—সেই যে শেষরাত্রে বার হয়েছিলাম, আর ফেরবার অবকাশ পেলামনা।

ষোড়শী নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া কহিল, তার পরে?

জীবানন্দ তেম্‌নি মৃদু হাসিয়া বলিল, তার পরেও মন্দ নয়। জীবানন্দ বাবুর নামে আরও একটা ওয়ারেণ্ট ছিল। মাস কয়েক পূর্ব্বে রেলগাড়ীতে একজন বন্ধু সহযাত্রীর ব্যাগ নিয়ে তিনি অন্তর্ধান হন। ফলে আরও দেড় বৎসর। একুনে এই বছর দুই নিরুদ্দেশের পর বীজগাঁয়ের ভাবী জমিদারবাবু আবার যখন রঙ্গমঞ্চে পুনঃ প্রবেশ করলেন, তখন কোথায় বা অলকা, আর কোথায় বা তার মা!

জীবানন্দর আত্ম-কাহিনীর এক অধ্যায় শেষ হইল। তার পরে দুজনেই নিঃশব্দে স্থির হইয়া বসিয়া রহিল।

রাত কত?

বোধ হয় আর বেশী বাকি নেই।

তা'হলে এ অন্ধকারে বাড়ী গিয়ে আর কাজ নেই।

কাজ নেই? তার মানে?

ষোড়শী কহিল, কম্বলটা পেতে দিই আপনি বিশ্রাম করুন।

জীবানন্দর দুই চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিল, কহিল, বিশ্রাম কোরব? এখানে?

ষোড়শী কহিল, ক্ষতি কি?

কিন্তু বড়লোক জমিদারের যে এখানে কষ্ট হবে অলকা ?

ষোড়শী বলিল, হলেও থাক্‌তে হবে। গরীবের দুঃখটা আজ একটুখানি জেনে যান।

জীবানন্দ চুপ করিয়া রহিল। তাহার চোখের কোণে জল আসিতেছিল, ইচ্ছা হইল বলে, আমি জানি সব, কিন্তু বুঝিবার মানুষটা যে মরিয়াছে। কিন্তু এ কথা না বলিয়া কহিল, যদি ঘুমিয়ে পড়ি অলকা ?

অলকা শান্ত ভাবে জবাব দিল, সে সম্ভাবনা ত রইলই।

জীবানন্দর উচ্ছিষ্ট ভোজনপাত্র ও ভুক্তাবশেষ প্রভৃতি ফেলিয়া দিতে, এবং রান্নাঘরের কিছু কিছু কাজ সারিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া আসিতে ষোড়শী বাহিরে চলিয়া গেলে তাহার সেই চিঠির ছেঁড়া টুক্‌রাখানা জীবানন্দর চোখে পড়িল। হাতে তুলিয়া লইয়া সেই মুক্তার মত সাজানো অক্ষরগুলির প্রতি মুগ্ধ চক্ষে চাহিয়া সে প্রদীপের আলোকে রাখিয়া সমস্ত লেখাটুকু এক নিঃশ্বাসে পড়িয়া ফেলিল। অনেক কথাই বাদ গিয়াছে, তথাপি এটুকু বুঝা গেল, লেখিকার বিপদের অবধি নাই, এবং সাহায্য না হোক, সহানুভূতি কামনা করিয়া এ পত্র যাহাকে সে লিখিয়াছে, সে নিজে যদিও নারী, কিন্তু প্রতি অক্ষরের আড়ালে দাঁড়াইয়া আর এক ব্যক্তিকে ঝাপ্‌সা দেখা যাইতেছে যাহাকে কোন মতেই স্ত্রীলোক বলিয়া ভ্রম হয়না। এই ছিন্ন পত্র তাহাকে যেন পাইয়া বসিল। একবার, দুইবার শেষ করিয়া যখন সে আরও একবার পড়িতে সুরু করিয়াছে, তখন, ষোড়শীর পায়ের শব্দে মুখ তুলিয়া কহিল, সবটুকু থাক্‌লে পড়ে বড় আনন্দ পেতাম। যেমন অক্ষর, তেমনি ভাষা—ছাড়তে ইচ্ছে করেনা।

ষোড়শী তাহার কণ্ঠস্বরের পরিবর্ত্তন সহজে লক্ষ্য করিয়াও কহিল, একবার উঠুন, কম্বলটা পেতে দিই।

জীবানন্দ কান দিলনা, বলিল, নর-পিশাচটি যে কে তা সামান্য বুদ্ধিতেই বোঝাযায়, কিন্তু তাকে নিধন করতে যে দেবতার আবাহন হয়েছে তিনি কে? নামটি তাঁর শুন্‌তে পাইনে?

এবারেও ষোড়শী কল্পনাকে বিচলিত হইতে দিলনা। শীতের দিনে

আকস্মিক একটা দখিনা বাতাসের মত তাহার মনের ভিতরটা আজ অজানা পদধ্বনির আশায় যেন উৎকর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, সেখানে জীবানন্দর বিদ্রূপ বেশ স্পষ্ট হইয়া পৌঁছিলনা, সে তেমনি সহজভাবেই কহিল, সে হবে। এখন আপনি একটু উঠে দাঁড়ান আমি এটা পেতে দিই।

জীবানন্দ আর কথা কহিলনা, একপাশে উঠিয়া দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে চোখ মেলিয়া তাহার কাজ করা দেখিতে লাগিল। ষোড়শী ঝাঁটা দিয়া প্রথমে সমস্ত ঘরখানি পরিষ্কার করিল, পরে কম্বলখানি দুপুরু করিয়া বিছাইয়া চাদরের অভাবে নিজের একখানি কাচা কাপড় সযত্নে পাতিয়া দিয়া কহিল, বসুন। আমার কিন্তু বালিশ নেই—

দরকার হলেই পাবে গো,—অভাব থাক্‌বেনা। এই বলিয়া সে কাছে আসিয়া হেঁট হইয়া কাপড়খানি তুলিয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিতে ষোড়শী মনে মনে অত্যন্ত লজ্জা পাইয়া আরক্ত মুখে কহিল, কিন্তু ওটা তুলে ফেল্‌লেন কেন, শুধু কম্বল ফুট্‌বে যে?

জীবানন্দ উপবেশন করিয়া কহিল, তা' জানি, কিন্তু আতিশয্যটা আবার বেশী ফুট্‌বে। যত্ন জিনিসটায় মিষ্টি আছে সত্যি, কিন্তু তার ভান করাটায় না আছে মধু, না আছে স্বাদ। ওটা বরঞ্চ আর কাউকে দিয়ো।

কথা শুনিয়া ষোড়শী বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গেল। তাহার মুখের উপর চোখের পলকে কে যেন ছাই মাখাইয়া দিল। জীবানন্দ কহিল, তার নামটি?

ষোড়শী কয়েক মুহূর্ত্ত কথা কহিতে পারিলনা, তাহার পরে বলিল, কার নাম?

জীবানন্দ হাতের পত্রখণ্ডের প্রতি কটাক্ষ চাহিয়া বলিল, যিনি দৈত্য

বধের জন্য শীঘ্র অবতীর্ণ হবেন? যিনি দ্রৌপদীর সখা, যিনি—আর বল্‌ব?

এই ব্যঙ্গের সে জবাব দিলনা, কিন্তু চোখের উপর হইতে তাহার মোহের যবনিকা খান্‌খান্‌ হইয়া ছিঁড়িয়া গেল। ধর্ম্মলেশহীন, সর্ব্বদোষাশ্রিত এই পাষণ্ডের আশ্চর্য্য অভিনয়ে মুগ্ধ হইয়া কেমন করিয়া যে তাহার মনে ক্ষণকালের নিমিত্ত ক্ষমামিশ্রিত করুণার উদয় হইয়াছিল ইহা সে সহসা ভাবিয়া পাইলনা। এবং চিত্তের এই ক্ষণিক বিহ্বলতায় সমস্ত অন্তঃকরণ তাহার অনুশোচনায় তিক্ত, সতর্ক ও কঠোর হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্তকাল পরে জীবানন্দ পুনশ্চ যখন সেই এক প্রশ্নই করিল, তখন, ষোড়শী কণ্ঠস্বর সংযত করিয়া লইয়া কহিল, তাঁর নামে আপনার প্রয়োজন?

জীবানন্দ কহিল, প্রয়োজন আছে বই কি। আগে থেকে জান্‌তে পারলে হয়ত আত্মরক্ষার একটা উপায় করতেও পারি।

ষোড়শী তাহার মুখের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, আর, আত্মরক্ষায় কি শুধু আমারই অধিকার নেই?

জীবানন্দ বলিয়া ফেলিল, আছে বই কি।

ষোড়শী কহিল, তা হলে সে নাম আপনি পেতে পারেননা। আমার ও আপনার একই সঙ্গে রক্ষা পাবার উপায় নেই।

জীবানন্দ একটুখানি স্থির থাকিয়া বলিল, তাই যদি হয়, রক্ষা পাওয়া আমারই দরকার, এবং তাতে লেশমাত্র ত্রুটি হবেনা জেনো।

ষোড়শীর মুখে আসিল বলে, তা জানি, একদিন জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে এ প্রশ্নের মীমাংসা হইয়াছিল। সেদিন নিরপরাধা নারীর স্কন্ধে অপরাধের বোঝা চাপাইয়া তোমার প্রাণ বাঁচিয়াছিল, এবং তোমার আজিকার বাঁচিয়া থাকিবার দামটাও হয়ত ততবড়ই আর একজনকে

দিতে হইবে, কিন্তু সে কোন কথাই কহিলনা। তাহার মনে হইল এত-বড় নর-পশুর কাছে অতবড় দানের উল্লেখ করার মত ব্যর্থতা আর ত কিছু হইতেই পারেনা।

জীবানন্দর হুঁস হইল। তাহার এতবড় ঔদ্ধত্যের যে জবাব দিলনা, তাহার কাছে গলাবাজির নিষ্ফলতা তাহার নিজের মনেই বাজিল। তাহার উত্তেজনা কমিল, কিন্তু ক্রোধ বাড়িয়া গেল। কহিল, অলকা, তোমার এই বীরপুরুষটির নাম যে আমি জানিনে তা' নয়।

ষোড়শী তৎক্ষণাৎ কহিল, জানবেন বই কি, নইলে উদ্দেশে তাঁর ঝগড়া করবেন কেন? তা'ছাড়া পৃথিবীর বীরপুরুষদের মধ্যে পরিচয় থাকবারই ত কথা।

জীবানন্দ শক্ত হইয়া কহিল, সে ঠিক। কিন্তু, এই কাপুরুষকে বার বার অপমান করার ভারটা তোমার বীরপুরুষটি সইতে পারলে হয়। যাক্, এ চিঠি ছিঁড়লে কেন?

ষোড়শী বলিল, আর একখানা পাঠিয়েছিলাম বলে।

কিন্তু সোজা তাঁকে না লিখে তাঁর স্ত্রীকে লেখা কেন? এই শব্দভেদী বাণ কি সেই বীরপুরুষের শিক্ষা না কি?

ষোড়শী কহিল, তার পরে?

জীবানন্দ বলিল, তার পরে, আজ আমার সন্দেহ গেল। বন্ধুর সম্বাদ আমি অপরের কাছে শুনেচি, কিন্তু রায় মশায়কে যতই প্রশ্ন করেছি, ততই তিনি চুপ করে গেছেন! আজ বোঝা গেল তাঁর আক্রোশটাই সবচেয়ে কেন বেশি।

ষোড়শী চমকিয়া গেল। কলঙ্কের ঘূর্ণী হাওয়ার মাঝখানে পড়িয়া তাহার দেহের কোথাও দাগ লাগিতে আর বাকি ছিলনা, কিন্তু, ইহার বাহিরে দাঁড়াইয়াও যে আর একজন অব্যাহতি পাইবেনা, ইহা সে

ভাবে নাই। আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, তাঁর সম্বন্ধে আপনি কি শুনেচেন ?

জীবানন্দ কহিল, সমস্তই। একটু থামিয়া বলিল, তোমার চমক আর গলার মিঠে আওয়াজে আমার হাসি পাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হাস্‌তে পারলামনা,—আমার আনন্দ করবার কথা এ নয়। সেই ঝড় জলের রাত্রির কথা মনে পড়ে? তার সাক্ষী আছে। সাক্ষী ব্যাটারা যে কোথায় লুকিয়ে থাকে আগে থেকে কিছুই বলবার যো নেই। আমি যখন গাড়ী থেকে ব্যাগ নিয়ে পালাই, ভেবেছিলাম কেউ দেখেনি।

ষোড়শী কহিল, যদি সত্যিই তাই হয়ে থাকে সে কি এতবড় দোষের ?

জীবানন্দ বলিল, কিন্তু তাকে গোপন করাটা ? এই চিঠির টুক্‌রোটা ? নিজেই একবার পড়ে দেখ ত কি মনে হয় ? এ আমি সঙ্গে নিয়ে চল্‌লাম, আবশ্যক হয় ত যথাস্থানে পৌছে দেব। আমার মত ইনিও তোমার একবার বিচার করতে বসেছিলেন না ? দেখ্‌চি তোমার বিচার করবার বিপদ আছে। এই বলিয়া সে মুচকিয়া হাসিল।

ষোড়শী চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। বিপদের বার্ত্তা জানাইয়া বাস্তবিক সে যে একজনকে উপলক্ষ মাত্র করিয়া আর একজনকে পত্র লিখিয়াছে, একজনের নাম করিয়া আর একজনকে আসিতে ডাকিয়াছে,—সেই ডাকটা যখন এই ছেঁড়া চিঠির টুক্‌রা হইতে এই লোকটাকে পর্য্যন্ত ফাঁকি দিতে পারিলনা, তখন সম্পূর্ণ পত্রটা কি হৈমর চক্ষুকেই ঠকাইতে পারিবে ? এবং ঠিক সেই দিকে কেহ যদি আজ আঙুল তুলিয়া হৈমর দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে চাহে ত লজ্জার কিছু আর বাকি থাকিবেনা।

তাহার চক্ষের পলকে হৈমর ঘর-সংসারের চিত্র,—তাহার স্বামী, তাহার ছেলে, তাহার বহু দাসদাসী, তাহার ঐশ্বর্য্য, তাহার সুন্দর স্বচ্ছন্দ

জীবনযাত্রার ধারা,—যে ছবি সে দিনের পর দিন কল্পনায় দেখিয়াছে,—সমস্ত এক নিমিষে কলুষের বাষ্পে সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিবে মনে করিয়া সে নিজের কাছেই যেন মুখ দেখাইতে পারিলনা। আর এই [illegible] তাহারই ঘরে বসিয়া তাহাকে ভয় দেখাইতেছে, যাহার কুকার্য্যের অবধি নাই, যে মিথ্যার জাল বুনিয়া অপরিচিত, নিরপরাধ একজন রমণীর সর্ব্বনাশ করিতে কোন কুণ্ঠা মানিবেনা, ষোড়শীর মনে হইল, এ জীবনে এত বড় ঘৃণা সে আর কখনো কাহাকেও করে নাই, এবং, এ বিষ যে হৃদয় মথিত করিয়া উঠিল, তাহার সমস্ত গর্ভতল সেই দহনে যেন অনলকুণ্ডের ন্যায় জ্বলিতে লাগিল।

নির্ম্মল আসিবেই। তাহার যত অসুবিধাই হোক, এই দুঃখের আহ্বান সে যে উপেক্ষা করিতে পারিবেনা,—নিজের মনের এই স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসের লজ্জায় সে যেন পুড়িতে লাগিল। ত[illegible] তাহারই কলঙ্ককে কেন্দ্র করিয়া শ্বশুর ও জামাতায়, পিতা ও কন্যায়, জমিদার ও প্রজায় সমস্ত গ্রাম ব্যাপিয়া যে লড়াইয়ের আবর্ত্ত উঠিবে তাহার বীভৎসতার কালোছায়া তাহার সাংসারিক দুঃখ কষ্টকে কোথায় যে ঢাকিয়া ফেলিবে সে কল্পনা করিতেও পারিলনা।

বোধকরি মিনিট পাঁচ-ছয় নিস্তব্ধতার পরে ঠিক এই সময়ে জীবানন্দ তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, কেমন, অনেক কথাই জানি, না?

ষোড়শী অভিভূতের ন্যায় তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, হাঁ।

এ সব তবে সত্য বল?

ষোড়শী তেমনি অসঙ্কোচে কহিল, হাঁ, সত্যি।

জীবানন্দ অবাক্ হইয়া গেল। এই অপ্রত্যাশিত সংক্ষিপ্ত উত্তরের পরে তাহার নিজের মুখেও সহসা কথা যোগাইলনা। শুধু কহিল, ওঃ—

সত্যি! তাহার পরে হাত বাড়াইয়া স্তিমিত দীপশিখাটা উজ্জ্বল করিয়া দিতে দিতে ক্ষণে ক্ষণে তাহার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অবশেষে জিজ্ঞাসা করিল, এখন তা'হলে তুমি কি করবে মনে কর?

কি আমাকে আপনি করতে বলেন?

তোমাকে? এই বলিয়া জীবানন্দ স্তব্ধ নতমুখে বসিয়া তৈলবিরল প্রদীপের বাতিটা অকারণে শুধু শুধু কেবল উস্কাইতে লাগিল। খানিক পরে যখন সে কথা কহিল তখনও তাহার চক্ষু সেই দীপ্তশিখার প্রতি। কহিল, তাহলে এঁরা সকলে তোমাকে যে অসতী বোলে—

এতক্ষণ পরে সে কথার মাঝখানে বাধা দিল, কহিল, সে কথা এখানে কেন? এঁদের বিরুদ্ধে আপনার কাছে ত আমি নালিশ জানাইনি। আমাকে কি করতে হবে তাই বলুন। কোন কারণ দেখাবার দরকার নেই।

জীবানন্দ বলিল, তা' বটে। কিন্তু সবাই মিথ্যে কথা বলে আর তুমি একাই সত্যবাদী এই কি আমাকে তুমি বোঝাতে চাও অলকা?

প্রত্যুত্তরে ষোড়শী তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া কি একটা বলিতে গিয়াও হঠাৎ চুপ করিয়া গেল দেখিয়া জীবানন্দ আপনাকে আর একবার অপমানিত জ্ঞান করিল। বলিল, একটা উত্তর দিতেও চাওনা?

ষোড়শী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

জীবানন্দ কহিল, অর্থাৎ, আমার কাছে কৈফিয়ৎ দেওয়ার চেয়ে দুর্নামও ভাল। বেশ! কিন্তু, সমস্ত স্পষ্টই বোঝা গেছে। এই বলিয়া সে ব্যঙ্গ করিয়া হাসিল। কিন্তু ইহাতেও ষোড়শীর কণ্ঠস্বরের স্বাভাবিকতা নষ্ট হইলনা, কহিল, স্পষ্ট বোঝা যাবার পরে কি করতে হবে বলুন?

তাহার প্রশ্ন ও অচঞ্চল কণ্ঠস্বরের গোপন আঘাতে জীবানন্দর ক্রোধ

ও অধৈর্য্য শতগুণ বাড়িয়া গেল, কহিল, তোমাকে কি করতে হবে সে তুমি জানো, কিন্তু আমাকে দেবমন্দিরের পবিত্রতা বাঁচাতেই হবে। সত্যকার অভিভাবক তুমি নয়, আমি। পূর্ব্বে কি হোতো আমি জানিনে, কিন্তু এখন থেকে ভৈরবীকে ভৈরবীর মতই থাক্‌তে হবে, না হয় তাকে যেতে হবে। এ রকম চিঠি তার লেখা চল্‌বেনা! এই বলিয়া সে মুখ তুলিতেই তাহার ঈর্ষার ক্রূর দৃষ্টি ষোড়শীর চোখে পড়িতে তাহার নিজের দৃষ্টি একমুহূর্ত্তে যেমন যোজন বিস্তৃত হইয়া গেল, তেমনি লালসার তপ্ত নিঃশ্বাস নিজের সর্ব্বাঙ্গে অনুভব করিয়া বিশ্ব-সংসারে যেন তাহার অরুচি ধরিয়া গেল। মনে হইল হৈম, তাহার সংসার, এই দেবমন্দির, তাহার অসহায় প্রজাদের দুঃখ, তাহার নিজের ভবিষ্যৎ কিছুতেই আর তাহার কাজ নাই,—সকল বন্ধন হইতে অব্যাহতি পাইয়া অজানা কোথাও গিয়া লুকাইতে পারিলে যেন বাঁচে। সকলের চেয়ে বেশি মনে হইল নির্ম্মল যেন না আসে। অনেকক্ষণ নীরবে স্থির থাকিয়া শেষে আস্তে আস্তে বলিল, বেশ, তাই হবে। যথার্থ অভিভাবক কে সে নিয়ে আমি ঝগড়া কোরবনা, আপনারা যদি মনে করেন আমি গেলে মন্দিরের ভাল হবে, আমি যাবো।

ইহাকে বিদ্রূপ মনে করিয়া জীবানন্দ জ্বালার সহিত কহিল, তুমি যে যাবে সে ঠিক। কারণ, যাতে যাও তা আমি দেখ্‌ব।

ষোড়শী তেমনি নম্র কণ্ঠে বলিল, আমি যখন যেতে চাচ্চি, তখন কেন আপনি রাগ করচেন? কিন্তু আপনার উপর এই ভার রইল যেন মন্দিরের সত্যিই ভাল হয়।

জীবানন্দ জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কবে যাবে?

ষোড়শী উত্তর দিল, আপনারা যখনই আদেশ করবেন। কাল, আজ, এখন,—যখনি বল্‌বেন।

জীবানন্দর ক্রোধ বাড়িল বই কমিলনা, কহিল, কিন্তু নির্ম্মলবাবু? জামাই সাহেব ?

ষোড়শী কাতর হইয়া বলিল, তাঁর নাম আর করবেননা।

জীবানন্দ কহিল, আমার মুখে তাঁর নামটা পর্য্যন্ত সহ্য হয়না ? ভাল। কিন্তু তোমাকে কি দিতে হবে ?

আমাকে কিছুই দিতে হবেনা।

জীবানন্দ কহিল, এ ঘরখানা পর্য্যন্ত ছাড়তে হবে জানো ? এও দেবীর।

ষোড়শী ঘাড় নাড়িয়া সবিনয়ে কহিল, জানি। যদি পারি ত কালই ছেড়ে দেব।

কালই ? ভাল, কোথায় থাকবে ঠিক করেচ ?

ষোড়শী কহিল, এখানে থাকবনা এর বেশি কিছুই ঠিক করিনি। একদিন কিছু না জেনেই আমি ভৈরবী হয়েছিলাম, আজ বিদায় নেবার সময়েও আমি এর বেশি কিছুই চিন্তা কোরবনা।

জীবানন্দ চুপ করিয়া রহিল। তাহার হঠাৎ মনে হইল এতক্ষণ কোথায় যেন তাহার ভুল হইতেছিল।

ষোড়শী বলিল, আপনি দেশের জমিদার, চণ্ডীগড়ের ভালমন্দের বোঝা আপনার উপর রেখে যেতে শেষ সময়ে আর আমি দুশ্চিন্তা কোরবনা। কিন্তু আমার বাবা বড় দুর্ব্বল, তাঁর ভার দিয়ে আপনি যেন নিশ্চিন্ত হবেননা।

তাহার কণ্ঠস্বর ও কথায় বিচলিত হইয়া জীবানন্দ জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি সত্য সত্যই চলে যেতে চাও না কি ?

ষোড়শী তাহার পূর্ব্বকথার অনুবৃত্তি স্বরূপে কহিতে লাগিল, আর

আমার দুঃখী, দরিদ্র ভূমিজ প্রজারা,—এদের সুখ-দুঃখের ভারও আমি আপনাকেই দিয়ে চল্‌লাম।

জীবানন্দ তাড়াতাড়ি কহিল,—আচ্ছা তা হবে হবে। কি তারা চায় বল ত?

ষোড়শী কহিল, সে তারাই আপনাকে জানাবে। কেবল আমি শুধু আপনার কথাটাই যাবার আগে তাদের জানিয়ে যাবো। হঠাৎ সে বাহিরের দিকে উঁকি মারিয়া কহিল, কিন্তু এখন আমি চোললাম,—আমার স্নান করতে যাবার সময় হল। এই বলিয়া সে তাহার কাপড় ও গাম্‌ছা আলনা হইতে তুলিয়া লইয়া কাঁধে ফেলিল।

জীবানন্দ বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া কহিল, স্নানের সময়? এই রাত্রে?

রাত্রি আর নেই। আপনি এবার বাড়ী যান—বলিতে বলিতেই ষোড়শী ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল। তাহার এই অকারণ আকস্মিক ব্যগ্রতায় জীবানন্দ নিজেও ব্যগ্র হইয়া উঠিল, কহিল, কিন্তু আমার সকল কথাই যে বাকি রয়ে গেল অলকা?

ষোড়শী কহিল,—আপনি বাড়ী যান।

জীবানন্দ জিদ্ করিয়া কহিল, না। কথা আমার শেষ না হওয়া পর্যান্ত আমি এইখানেই তোমার প্রতীক্ষা করে রইলাম।

প্রত্যুত্তরে ষোড়শী থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, না, আপনার পায়ে পড়ি আমার জন্যে আর আপনি অপেক্ষা করবেননা। এই বলিয়া সে বামদিকের বনপথ ধরিয়া দ্রুতপদে অদৃশ্য হইয়া গেল।

সেদিন প্রাতঃকালটা হঠাৎ একটা ঘন কুয়াশায় সমস্ত অস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল; রায় মহাশয় সেইমাত্র শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়াছিলেন; একজন ভদ্র ব্যক্তিকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া কহিলেন, কে ও?

আমি নির্ম্মল, বলিয়া জামাতা কাছে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। এই আকস্মিক আগমনে তিনি কোনরূপ বিস্ময় বা হর্ষ প্রকাশ করিলেন না। চাকরদের ডাকিয়া বলিলেন, কে আছিস্ রে, নির্ম্মলের জিনিষপত্রগুলো সব হৈমর ঘরে রেখে আয়। তা' গাড়ীতে কষ্ট হয়নি ত বাবা? খোকা, হৈম, এরা সব ভাল আছে ত?

নির্ম্মল ঘাড় নাড়িয়া জানাইল সকলে ভাল আছে।

রায় মহাশয় কহিলেন, কিন্তু, একা এলে কেন নির্ম্মল, মেয়েটাকে সঙ্গে আন্‌লে ত আর একবার দেখা হোতো।

নির্ম্মল বলিল, দু'চার দিনের জন্যে আবার—

রায় মহাশয় ঈষৎ হাস্য করিলেন, বলিলেন, এ কি দু'চার দিনের ব্যাপার বাবা, দু'চার মাসের দরকার। যাও, ভেতরে যাও,—মুখ হাত ধোওগে।

নির্ম্মল ভিতরে আসিয়া দেখিল এখানেও সেই একই ভাব। যে প্রকারেই হোক তাহার আসার সম্ভাবনা কাহারও অবিদিত নয়, এবং, সেজন্য কেহই প্রসন্ন নহেন। মুখ হাত ধোয়া, কাপড় ছাড়া প্রভৃতি সমাধা হইলে গরম চা এবং কিছু জলখাবার শ্বশ্রুঠাকুরাণী স্বহস্তে আনিয়া জামাতাকে নিজে খাওয়াইতে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হৈম কি আস্‌তে চাইলেনা?

নির্ম্মল কহিল, না।

তারা জানে তুমি কেন আস্‌চ?

নির্ম্মল মাথা নাড়িয়া বলিল, জানে বই কি, সমস্তই জানে।

তবু মানা করলেনা ?

তাঁহার প্রশ্ন ও কণ্ঠস্বরে নির্ম্মল পীড়া অনুভব করিয়া বলিল, মানা কেন করবে মা ? সে তো জানে আমি অন্যায় কাজে কোন দিনই হাত দিইনে।

আর তার বাপই কেবল অন্যায় কাজে হাত দিয়ে বেড়ায়, এই কি সে জানে নির্ম্মল ? এই বলিয়া তিনি ক্ষণকাল নতমুখে স্থির থাকিয়া অকস্মাৎ আবেগের সহিত বলিয়া উঠিলেন, তা সে যাই কেন না জানুক, বাছা, এ তুমি করতে পারবেনা,—এ কাজে তোমাকে আমি কোনমতেই নামতে দিতে পারবনা। শ্বশুর-জামাইয়ে লড়াই করবে, গাঁয়ের লোক তামাসা দেখবে, তার আগে আমি জলে ডুব দিয়ে মরব তোমাকে বলে রাখলাম বাবা।

নির্ম্মল আস্তে আস্তে বলিল, কিন্তু, যে পীড়িত, যে অসহায়, তাকে রক্ষা করাই ত আমাদের ব্যবসা মা।

শ্বাশুড়ী কহিলেন, কিন্তু ব্যবসাই ত মানুষের সমস্ত নয় বাছা। উকিল-ব্যারিষ্টারেরও মা-বোন আছে, স্ত্রী আছে, শ্বশুর-শ্বাশুড়ী আছে—গুরুজনের মান-মর্য্যাদা রাখবার ব্যবস্থা সংসারে তাদের জন্যেও তৈরি হয়েছে।

নির্ম্মল ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হয়েছে বই কি মা, নিশ্চয় হয়েছে। তাহার পরে সমস্ত ব্যাপারটা লঘু করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে একটু হাসিয়া বলিল, আর শেষ পর্য্যন্ত হয়ত লড়াই-ঝগড়া কিছুই না হতে পারে।

গৃহিণীর মুখ তাহাতে প্রসন্ন হইলনা, কহিলেন, পারে, কিন্তু সে শুধু তোমার শ্বশুরের সর্ব্ব রকমে হার হলেই পারে। কিন্তু, তার

পরে আর তাঁর রায় মশাই হয়ে এ গ্রামে বাস করা চলবেনা। তা ছাড়া ষোড়শী দুর্ব্বলও নয়, অসহায়ও নয়। তার ঠ্যাঙাড়ে ডাকাতের দল আছে, তাকে জমিদার ভয় করে। একখানা চিঠির জোরে তার মানুষ পাঁচশ ক্রোশ দূর থেকে ঘর-দোর ছেলেপুলে ফেলে চলে আসে, আমরা যা একশখানা চিঠিতে পারিনে। তারা হল ভৈরবী, তুক-তাক, মন্ত্র তন্ত্র কত কি জানে। তা' সে থাক্ ভাল, যাক্ ভাল আমার ক্ষতি নেই,—তার পাপের ভরা সেই বইবে, কিন্তু চোখের ওপর আমার নিজের মেয়ের সর্ব্বনাশ আমি হতে দেবনা নির্ম্মল, তা লোকে যাই বলুক আর যাই করুক।

নির্ম্মল স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। যে ভাবেই হোক, এ দিকে জানাজানি হইতেও কিছু বাকি নাই, এবং ষড়যন্ত্রেরও কোন ত্রুটী ঘটে নাই। তাহার শ্বশুর সকল আটঘাট বাঁধিয়া রাখিয়াছেন, ছিদ্র বাহির করিবার যো নাই। তাহার চুপ-চাপ প্রকৃতির শ্বাশুড়ীঠাকুরাণী যে এমন মজবুত করিয়া কথা কহিতে জানেন, ইহা সে মনে করে নাই, এবং যাহা কিছু কহিলেন সে যে তাঁহার নিজের কথা তাহাও সে মনে করিলনা, কিন্তু জবাব দিবারও কিছু খুঁজিয়া পাইলনা। এই আর্জ্জি যিনি মুসাবিদা করিয়া আর একজনের মুখে গুঁজিয়া দিয়াছেন, তিনি সকল দিক চিন্তা করিয়াই দিয়াছেন, এবং ইহাও তাঁহার অবিদিত নাই, যে নিছক পরোপকার মানসেই সে যে পশ্চিমের একপ্রান্ত হইতে স্ত্রী-পুত্র ফেলিয়া চলিয়া আসিয়াছে, এ উত্তর সে কোনমতেই মুখ দিয়া বাহির করিতে পারিবেনা।

ঘণ্টা দুই বিশ্রাম করার পরে নির্ম্মল যখন বাটীর বাহির হইল, তখন কর্ত্তা সদরে বসিয়া ছিলেন। তিনি কোথায়, কি বৃত্তান্ত ইত্যাদি নিরর্থক

প্রশ্নে সময় নষ্ট করিলেননা, শুধু, একটু সকাল সকাল ফিরিবার অনুরোধ করিয়া বলিয়া দিলেন যে, এই শ্রান্ত দেহে অধিক বেলায় স্নানাহার করিলে অসুখ করিতে পারে।

শিরোমণি মহাশয় পাশে বসিয়া কি বলিতেছিলেন, উঁকি মারিয়া দেখিয়া সবিস্ময়ে কহিলেন, বাবাজী—না?

রায় মহাশয় বলিলেন, হাঁ। শিরোমণি ডাকিয়া আলাপ করিবার উদ্যম করিতেই জনার্দ্দন বাধা দিয়া বলিলেন, নির্ম্মল পালাচ্চেনা, তোমার কথাটা শেষ কর, আমাকে উঠ্‌তে হবে।

নির্ম্মল নিঃশব্দে বাহির হইয়া আসিল। তাহার শ্বশুর যে তাহাকে অতি-কৌতূহলী প্রতিবেশীর অপ্রিয় জেরার দায় হইতে দয়া করিয়া অব্যাহতি দিলেন, ইহা অনুভব করিয়া তাহার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল।

যোড়শীর সহিত সে দেখা করিতে চলিয়াছিল। দিন দুই পূর্ব্বে যে উৎসাহ লইয়া, মনের ভিত্তিগাত্রে যে ছবি আঁকিয়া লইয়া সে তাহার প্রবাস-গৃহ ত্যাগ করিয়াছিল, সে আর ছিলনা। যে স্বপ্ন সুদীর্ঘ যাত্রা-পথের সকল দুঃখ তাহার হরণ করিয়াছিল, শ্বশুর ও শ্বাশুড়ীর অব্যক্ত ও ব্যক্ত অভিযোগের আক্রমণে এইমাত্র তাহা লণ্ডভণ্ড হইয়া গিয়াছিল। সমবেত ও প্রবল শক্তি সমূহের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া তাহার একক পৌরুষ নিরাশ্রয়ের অবলম্বন, দুর্ব্বল, পরিত্যক্ত, নির্জ্জীত নারীর নিঃস্বার্থ বন্ধুরূপে এই গ্রামে পদার্পণ করিতে চাহিয়াছিল। তাহার কত না বল, কত না শোভা, কিন্তু আসিয়া দেখিল তাহার সকল কার্য্যেরই ইতিমধ্যে একটা কারণ প্রকাশ হইয়া গেছে। তাহা যেমন কদর্য্য, তেমনি কালো। কালিতে লেপিয়া একাকার হইতে আর বাকি কিছু নাই। শ্বশুরকে সে কোনদিনই আদর্শপুরুষ মনে করে নাই; তিনি পল্লীগ্রামের বিষয়ী লোক,

সামান্য অবস্থা হইতে যথেষ্ট সঞ্চয় করিয়াছেন—অতএব, পরলোকের খরচের পাতাটাও শাদা পড়িয়া থাকিবার কথা নয়, ইহা সে বেশ জানিত, এবং মনে মনে ক্ষমাও করিত; কিন্তু আজ যখন সে মন্দিরের প্রাচীর ঘুরিয়া পায়ে হাঁটা সেই সরু পথ ধরিয়া ষোড়শীর কুটীর অভিমুখে পা বাড়াইল, তখন সংলুব্ধ চিত্ততলে তাহার একদিকে শ্বশুরের বিরুদ্ধে যেমন বিদ্বেষ ও ঘৃণা নিবিড় হইয়া দেখা দিল, তেম্‌নি অন্যদিকে বিশেষ কিছু না জানিয়াও ষোড়শীর প্রতি অভিমান ও বিরক্তিতে মন তিক্ত হইয়া উঠিল। মনে মনে বারবার করিয়া বলিতে লাগিল, যে স্ত্রী অনাত্মীয় অপরিচিত প্রায় পুরুষের কৃপাভিক্ষা করিয়া পত্রদ্বারা আহ্বান করিবার সঙ্কোচ অনুভব করেনা, এবং সে কথা নিলজ্জ দাম্ভিকার ন্যায় পথে ঘাটে প্রচার করিয়া বেড়ায়, তাহাকে আর যাহাই হোক সম্মানের উচ্চ আসনে বসানো চলেনা। কিন্তু অকস্মাৎ চিন্তা তাহার এইখানে বাধা পাইয়া থামিল। পত্রবহুল মনসা গাছের বাঁক ফিরিতেই তাহার উৎসুক দৃষ্টি সন্নিকটবর্ত্তিনী ষোড়শীর আনত মুখের উপরে গিয়া পড়িল। সে প্রাঙ্গণের বাহিরে দাঁড়াইয়া একমনে বেড়ার দড়ি বাঁধিতেছিল, আগন্তুকের পদশব্দ শুনিতে পাইলনা, এবং ক্ষণকালের জন্য নির্ম্মল না পারিল নড়িতে, না পারিল চোখ ফিরাইতে। এই ত সেদিন, তবুও তাহার মনে হইল এ সে ভৈরবী নয়। অথচ পরিবর্ত্তন যে কোন খানে তাহাও ধরিতে পারিলনা। সেই রাঙা-পাড়ের গৈরিক শাড়ীপরা, তেম্‌নি রুক্ষ এলো চুল, গলায় তেম্‌নি রুদ্রাক্ষের মালা, তেম্‌নি মুখের উপরে উপবাসের একটি শীর্ণ ছায়া,—সিঁদূর মাখানো ত্রিশূলটি পর্য্যন্ত তেম্‌নি হাতের কাছে ঠেস দিয়া রাখা,—কিছু বদ্‌লায় নাই,—তবুও অপরিচিত, অজানা মোহে তাহাকে মুহূর্ত্ত কয়েকের নিমিত্ত স্তম্ভিত করিয়া দিল।

দাঁড়র গ্রন্থি টানিয়া দিয়া ষোড়শী মুখ তুলিয়াই একটু চমকিত হইল, কিন্তু পরক্ষণেই দড়ি ছাড়িয়া দিয়া স্নিগ্ধমধুর হাসিয়া সুমুখে আসিয়া কহিল, আসুন, আমার ঘরে আসুন।

নির্ম্মল অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, কিন্তু আপনার কাজে যে বাধা দিলাম।

ষোড়শী সকৌতুকে মুচকিয়া হাসিয়া কহিল, বেড়া বাঁধা বুঝি আমার কাজ? আর, হোলই বা কাজ, কুটুম্বকে খাতির করাটা বুঝি কাজ নয়? শ্বশুরবাড়ীতে জামাইয়ের আদর হয়নি, কিন্তু শালীর কুঁড়ে ঘরে থেকে ভগিনীপতিকে অনাদরে ফির্‌তে দেবনা। আসুন ঘরে গিয়ে বস্‌বেন চলুন। খোকা, হৈম, চাকর-বাকর সব ভাল আছে?— আপনি নিজে ভাল আছেন?

নির্ম্মল কেমন যেন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। ঘাড় নাড়িয়া কহিল, সবাই ভাল আছে, কিন্তু আজ আর বোস্‌বনা।

ষোড়শী কহিল, কেন শুনি? তার পরে কণ্ঠস্বর নত করিয়া আরও একটু কাছে আসিয়া বলিল, একদিন হাত ধরে অন্ধকারে পার করে এনেছিলাম মনে পড়ে? দিনের বেলায় ওতে আর কাজ নেই, কিন্তু চলুন বল্‌চি। যে এত দূর থেকে টেনে আন্‌তে পারে, সে এটুকুও টেনে নিয়ে যেতে পার্‌বে।

নির্ম্মল লজ্জা বোধ করিল, আঘাত পাইল। এই আচরণ, এই কথা ষোড়শীর মুখে কেবল অপ্রত্যাশিত নয়, অচিন্তনীয়। বিদুষী, সন্ন্যাসিনী ভৈরবীকে সে শান্ত, সমাহিত, দৃঢ় এমন কি কঠোর বলিয়াই জানিত। সংসারে রমণীর পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া কল্পনা করিতেও যেন তাহার বাধিত। তাহাকে অনেকে ভাবিয়াছে,—কর্ম্মের মধ্যে, বিশ্রামের মধ্যে এই ষোড়শীকে সে চিন্তা করিয়াছে,—সমস্ত অন্তর রসে ভরিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু কখনও

চিন্তাকে সে পদ্ধতি দিবার, শৃঙ্খলিত করিবার সাহস পর্য্যন্ত করে নাই। কিন্তু সেই ষোড়শী আজ যখন অপ্রত্যাশিত আত্মীয়তার অতি-ঘনিষ্ঠতায় অকস্মাৎ নিজেকে ছোট করিয়া, মানবী করিয়া, সাধারণ মানবের কামনারি আয়ত্তাধীন করিয়া দিল, নির্ম্মল অন্তরের এক প্রান্তে যেমন বেদনা বোধ করিল, তেম্‌নি আর এক প্রান্ত তাহার কি এক প্রকার কলুষিত আনন্দে এক নিমিষে পরিপ্লুত হইয়া গেল।

নির্ম্মলকে ঘরে আনিয়া ষোড়শী কম্বল পাতিয়া বসিতে দিল, জিজ্ঞাসা করিল, পথে কষ্ট হয়নি ?

নির্ম্মল বলিল, না। কিন্তু মন্দিরে আজ আপনার কাজ নেই ?

ষোড়শী কহিল, অর্থাৎ আজ মন্দিরের রবিবার কি না ? তাহার পরে বলিল, কাজ আছে, সকালে একদফা করেও এসেচি। যেটুকু বাকি আছে, সেটুকু বেলাতে কর্‌লেও হবে। হাসিয়া কহিল, জামাই বাবু, এ আপনাদের কোর্ট কাছারী নয়, মন্দির। ঠাকুর দেবতারা তাঁদের দাস দাসীদের কখনো মুহূর্ত্তের ছুটি দেন না, কানে ধরে চব্বিশ ঘণ্টা সেবা করিয়ে নিয়ে তবে ছাড়েন।

কিন্তু এ চাক্‌রি ত আপনি ইচ্ছে করেই নিয়েছেন।

ইচ্ছে করে ? তা হবে। এই বলিয়া ষোড়শী সহসা একটুখানি হাসিয়া কহিল, আচ্ছা, আসার একটু খবর দিলেননা কেন ?

নির্ম্মল কহিল, সময় ছিলনা। কিন্তু তার শাস্তি স্বরূপ শ্বশুর বাড়ীতে যে খাতির পাইনি, অন্ততঃ, তাঁরা যে আমাকে দেখে খুসী হননি, এ কথা আপনি জান্‌লেন কি করে ? এবং আমার আসার সম্বাদ আসার পূর্ব্বেই কে প্রচার করে দিল বল্‌তে পারেন ?

ষোড়শী কহিল, বলতে পারিনে, কিন্তু আন্দাজ করতে পারি।

নির্ম্মল বলিল, আন্দাজ করতে ত আমিও পারি, কিন্তু সত্যি কে করেছে, এবং কোথায় সে খবর পেলে, জানেন ত আমাকে বলুন। আশা করি আপনার দ্বারা এ কথা প্রকাশ হয়নি ?

ষোড়শী হাসিল, কহিল, কোন আশা করতেই আমি কাউকে নিষেধ করিনে। কিন্তু, জেনে আপনার লাভ কি ? আপনি এসেছেন এ খবরও সত্যি, আমারই জন্যে এসেছেন এ কথাও ঠিক। তার চেয়ে বরঞ্চ বলুন—আসা সার্থক হবে কি না ? আমাকে উদ্ধার করতে পারবেন কি না ?

নির্ম্মল কহিল, প্রাণপণে চেষ্টা কোরব বটে।

যদি কষ্ট হয় তবুও ?

নির্ম্মল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, যদি কষ্ট হয় তবুও।

ষোড়শী হাসিয়া ফেলিল। নির্ম্মল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া নিজেও একটু হাসিয়া বলিল, হাস্‌লেন যে ?

ষোড়শী কহিল, হাস্‌চি—আগেকার দিনে ভৈরবীরা বিদেশী মানুষদের ভেড়া বানিয়ে রাখ্‌ত। আচ্ছা, ভেড়া নিয়ে তারা কি কোরত ? চরিয়ে বেড়াত, না, লড়াই বাধিয়ে দিয়ে তামাসা দেখ্‌ত ! বলিতে বলিতেই সে একেবারে ছেলেমানুষের মত উচ্ছ্বসিত হইয়া হাসিতে লাগিল।

নির্ম্মলের দেহ-মন পুলকে নৃত্য করিয়া উঠিল। এই কঠিন আবরণের নিচে যে রহস্যপ্রিয় কৌতুকময়ী চঞ্চল নারী প্রকৃতি চাপা দেওয়া আছে,—তাহার অপর্য্যাপ্ত হাসির প্রস্রবণ যে ব্রতোপবাসের সহস্রবিধ কৃচ্ছ্র-সাধনায় আজও শুখায় নাই,—ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় সে তেম্‌নি জীবন্ত—এই কথা স্মরণ করিয়া সর্ব্বশরীরে তাহার কাঁটা দিল। পরিহাসে নিজেও যোগ দিয়া হাসিয়া কহিল, হয় ত বা মাঝে মাঝে মায়ের স্থানে বলি দিয়ে

খেতো। অর্থাৎ, আমার শ্বশুর কিম্বা শাশুড়ী ঠাকুরুণ ইতিমধ্যে আপনার কাছে এসেছিলেন, এবং অনেক অপ্রিয় অসত্য শুনিয়ে গেছেন।

ষোড়শী কহিল, না, তাঁরা কেউ আসেননি। আমি যে মন্ত্রে-তন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করেচি, এটা অসত্য হতে পারে, কিন্তু অপ্রিয় হবে কেন নির্ম্মল বাবু? তা ছাড়া আপনার আসার ধরণ দেখে নিজেরই সন্দেহ হচ্চে হয়ত বা নিতান্ত মিথ্যা না হতেও পারে। তাহার মুখে হাসির আভাস লাগিয়াই রহিল, কিন্তু গলার শব্দ বদ্‌লাইয়া গেল। ওষ্ঠপ্রান্তে ও কণ্ঠস্বরে সহসা যেন আর সঙ্গতি রহিলনা।

নির্ম্মল আশ্চর্য্য, অবাক্ হইয়া রহিল। ইহার কতটুকু পরিহাস এবং কতখানি তিরস্কার, এবং কিসের জন্য তাহা সে কিছুতে ভাবিয়া পাইলনা। ষোড়শী নিজেও আর কিছু কহিলনা, কিন্তু তাহার আনত মুখের পরে যে অপ্রত্যাশিত লজ্জার আরক্ত আভা পলকের নিমিত্ত ছায়া ফেলিয়া গেল, ইহা তাহার চোখে পড়িল। কিন্তু, সে ঐ পলকের জন্যই। ষোড়শী আপনাকে সামলাইয়া লইয়া মুখ তুলিয়া হাসিমুখে কহিল, কুটুমের অভ্যর্থনা ত হ'ল। অবশ্য হাসি-খুসি দিয়ে যতটুকু পারি, ততটুকুই,—তার বেশি ত সম্বল নেই ভাই,—এখন আসুন, বরঞ্চ, কাজের কথা কওয়া যাক্।

তাহার ঘনিষ্ঠ সম্ভাষণকে এবার সে সংশয়ের সহিত গ্রহণ করিতে চাহিল, তবুও তাহার মন ভিতরে ভিতরে উল্লসিত হইয়া উঠিল। কহিল, বলুন।

ষোড়শী কহিল, দু'টি লোক দেবতাকে বঞ্চিত করতে চায়। একটি রায় মহাশয়, আর একটি জমিদার—

নির্ম্মল বলিল, আর একটি আপনার বাবা। এঁরাই ত আপনাকেও বঞ্চিত করতে চান্।

বাবা? হাঁ, তিনিও বটে। এই বলিয়া ষোড়শী চুপ করিয়া রহিল।

নির্ম্মল বলিল, আমার শ্বশুরের কথা বুঝি, আপনার বাবার কথাও কতক বুঝতে পারি, কিন্তু পারিনে এই জমিদার প্রভুটিকে বুঝতে। তিনি কিসের জন্য আপনার এত শত্রুতা করেন?

ষোড়শী বলিল, দেবীর অনেকখানি জমি তিনি নিজের বলে বিক্রী করে ফেলতে চান, কিন্তু আমি থাকতে সে কোনমতেই হবার যো নেই।

নির্ম্মল সহাস্যে কহিল, সে আমি সামলাতে পারব। এই বলিয়া সে কটাক্ষে ভৈরবীর মুখের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখিল ষোড়শী নীরব হইয়া আছে, কিন্তু তাহার মুখের কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। খানিক পরে মুখ তুলিয়া ধীরে ধীরে কহিল, কিন্তু আরও অনেক জিনিস আছে, যা আপনিও হয়ত সামলাতে পারবেননা।

কি সে সব? একটা ত আপনার মিথ্যে দুর্নাম?

ষোড়শী কোনরূপ উত্তেজনা প্রকাশ করিলনা; শান্তস্বরে বলিল, সে আমি ভাবিনে। দুর্নাম সত্যি হোক মিথ্যে হোক, তাই নিয়েই ত ভৈরবীর জীবন নির্ম্মলবাবু। আমি এই কথাটাই তাঁদের বলতে চাই।

নির্ম্মল বিস্মিত হইয়া কহিল, এই কথা নিজের মুখে বলতে চান? সে যে স্বীকার করার সমান হবে?

ষোড়শী চুপ করিয়া রহিল।

নির্ম্মল সসঙ্কোচে কহিল, ওরা যে বলে—

কারা বলে?

অনেকেই বলে সে সময়ে আপনি—

কোন্ সময়ে?

নির্ম্মল ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া অত্যন্ত-সঙ্কোচ সবলে দমন করিয়া বলিল, সেই ম্যাজিষ্ট্রেট আসার দিনে। তখন আপনার কোলের উপরেই নাকি—

ষোড়শী একটু আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, তারা কি দেখেছিল না কি? তা' হবে, আমার ঠিক মনে নাই,—যদি দেখে থাকে, তা সত্যি। জমিদারের মাথা আমিই কোলে করে বসেছিলাম।

নির্ম্মল স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে আস্তে আস্তে কহিল, তার পরে?

ষোড়শী শান্ত মুখখানি হাসির আভাসে একটু উজ্জ্বল করিয়া বলিল, তার পরে দিন কেটে যাচ্চে। কিন্তু কিছুতেই আর মন বসাতে পারিনে। সবই যেন মিথ্যে বলে ঠেকে।

কি মিথ্যে?

সব। ধর্ম্ম, কর্ম্ম, ব্রত, উপবাস, দেবসেবা, এতদিনের যা কিছু সমস্তই—

তবু ভৈরবীর আসন চাই?

চাই বই কি। আর আপনি যদি বলেন চাইনা—

না, না, আমি কিছুই বলিনে,—এই বলিয়া নির্ম্মল তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, বেলা হয়ে যাচ্চে,—এখন আমি চোল্‌লাম।

ষোড়শীও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল, আমারও মন্দিরে কাজ আছে। কিন্তু আবার কখন দেখা হবে?

নির্ম্মল অনিশ্চিত অস্ফুট কণ্ঠে কি একটা কহিল, ভাল শোনা গেলনা। ষোড়শী হঠাৎ বলিয়া উঠিল, ভাল কথা, সন্ধ্যার পর আজই ত আমাকে নিয়ে মন্দিরে একটা হাঙ্গামা আছে, আসবেন?

নির্ম্মল ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া বাহির হইয়া গেল। ষোড়শী মুচকিয়া একটু হাসিল, তার পরে কুটীরের দ্বারে শিকল তুলিয়া দিয়া মন্দিরের অভিমুখে বহির্গত হইল।

শ্বশুর জামাতা একত্রে আহারে বসিয়াছিলেন। শ্বাশুড়ীঠাকুরাণী দধি ও মিষ্টান্ন আনিতে স্থানান্তরে গেলে রায় মহাশয় কহিলেন, ষোড়শীর সঙ্গে তোমার দেখা হল নির্ম্মল ?

নির্ম্মল মুখ না তুলিয়াই কহিল, আজ্ঞে, হাঁ।

কি বলে সে ?

এরূপ একটা সাধারণ প্রশ্নের জবাব দেওয়া কঠিন। সে ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিসের সম্বন্ধে ?

মন্দিরের সম্বন্ধে। বেটি ভৈরবী-গিরী ছাড়বে, না, চণ্ডীগড়ের নাম পর্য্যন্ত ডোবাবে ? দেশের লোক ত আর বাইরের দশজনের কাছে মুখ দেখাতে পারে না এমনি হয়ে উঠেচে।

নির্ম্মল চুপ করিয়া রহিল। চণ্ডীগড়ের ভৈরবীদিগের বিরুদ্ধে এ অপবাদ আবহমান কাল প্রচলিত আছে। এবং, সে জন্য গ্রামের কেহ কোনদিন লজ্জায় প্রাণত্যাগ করিয়াছে বলিয়া প্রবাদ নাই। স্বয়ং চণ্ডীমাতাও কখনো আপত্তি করিয়াছেন বলিয়া লোকে জানেনা। ইহাদের রীতি-নীতি, আচার-অনাচার সমস্তই সে শুনিয়া গিয়াছিল বলিয়া এ সম্বন্ধে মন তাহার নিরপেক্ষ ভাবেই ছিল। বিশেষতঃ, ষোড়শীর অপবাদ সে বিশ্বাস করে নাই, সুতরাং ইহা মিথ্যা প্রমাণিত হইলেই সে খুসী হইত ; কিন্তু এই প্রমাণকেই তাহার ভৈরবী পদের একমাত্র দাবী বলিয়া সে একদিনও গ্রাহ্য করে নাই। তাহার শ্বশুরের ইঙ্গিত নূতনও নয়, ভীষণও নয়, অথচ এই কয়টা কথাতেই অকস্মাৎ আজ তাহার মন যখন চমকিয়া সজাগ হইয়া উঠিল, তখন

নিজের মনের বিক্ষিপ্ততা অনুভব করিয়া সে যথার্থই আশ্চর্য্য হইয়া গেল। তাহাকে নিস্তব্ধ দেখিয়া রায় মহাশয় পুনশ্চ কহিলেন, কি বল হে?

নির্ভুল ও সময়োপযোগী উত্তর দিবার সময় ও অবস্থা নির্ম্মলের ছিলনা, সে শুধু পূর্ব্ব কথারই পুনরুক্তি করিয়া কহিল, ভৈরবীদের দুর্নাম ত চিরদিনই আছে।

রায় মহাশয় অস্বীকার করিলেননা, বলিলেন, আছে। কিন্তু দুর্নাম জিনিসটা ত মন্দ, চিরকালের দোহাই দিয়েও মন্দটাকে চিরকাল চালানো চলেনা। কি বল?

কিন্তু সে যে মন্দ এ কি নিশ্চিত প্রমাণিত হয়ে গেছে?

রায় মহাশয় অসংশয়ে কহিলেন, গেছে।

নির্ম্মল ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া প্রশ্ন করিল, কি কোরে গেল! নিশ্চয় প্রমাণ কে দিলে?

রায় মহাশয় বলিলেন, যে দিয়েছে সে আজও দেবে। সন্ধ্যার পরে মন্দিরে যেয়ো, তারপরে বোধ হয় শ্বশুর-জামাই দু'জনকে দু'দিকে দাঁড়িয়ে আর সমস্ত গ্রামের হাসি তামাসা কুড়োতে হবেনা। এই ত তোমার ব্যবসা, অতএব, নিশ্চয় প্রমাণ যে কা'কে বলে সে আমাকে আর তোমাকে বলে দিতে হবেনা।

গৃহিণী পাথরের থালে মিষ্টান্ন ও বাটিতে দধি লইয়া প্রবেশ করিলেন, কহিলেন, কই বাবা, খাচ্চোনা যে?

এই যে খাচ্চি, বলিয়া নির্ম্মল আহারে মনোনিবেশ করিল। কর্ত্তা কহিলেন, নির্ম্মলকে দিয়ে আমার জন্যে একটু দুধ এনে দাও,—শরীরটা ভাল নেই, দই আর খাবোনা।

গৃহিণী প্রস্থান করিলে রায় মহাশয় বলিলেন, অন্ধকার দুর্য্যোগের রাত্রে

সে তোমাকে হাতে ধরে বাড়ী পৌঁছে দিয়েছিল, তার জন্যে শুধু তুমি কেন বাবা, আমরা পর্য্যন্ত কৃতজ্ঞ ;—যে উপকার করে, তার অপকার করতে মন চায়না—কিন্তু, এ তো আমাদের নিজের কথা নয় নির্ম্মল, এ গ্রামের কথা, সমাজের কথা, দেব-দেব্‌তার কথা,—সুতরাং যা বড় কর্ত্তব্য তা' আমাকে করতেই হবে।

সে রাত্রের ঘটনা যে অপ্রকাশ নাই তাহা সে শুনিয়াছিল, অথচ, নিজে গোপন করিয়াছিল বলিয়া লজ্জিত মুখে চুপ করিয়া রহিল। কর্ত্তা বলিতে লাগিলেন, দেব-দেবীরা ত কথা কননা, কিন্তু তাঁরা শোধ নেন। গ্রামের ভাল যে কখনো হয়নি, উত্তরোত্তর অবনতি হয়েই আস্‌চে, মনে হয় এও তার একটা কারণ। প্রমাণের কথা বল্‌ছিলে, কিন্তু, তুমি যে আস্‌চো এই বা আমরা জান্‌লাম কি করে? তুমি সন্তান-তুল্য, তোমারি কাছে সব কথা খুলে বল্‌তে আমার বাধে, কিন্তু না বল্‌লেও নয়। জমিদার বাবু সে রাত্রে বোধ করি খেয়ে যাবার ফুরসৎ পান্‌নি, ষোড়শী খাবার আন্‌তে ঘরের বাইরে যেতে তাঁর চোখ পড়ল একটা চিঠির টুক্‌রোর পরে। বোধ হয় তোমাকে লিখে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে শেষে হৈমকেই লিখেছিল। সেখানাও আজ দেখ্‌তে পাবে,—তিনি সকাল বেলা আস্‌বার সময় সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন।

নির্ম্মল ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল, বলিল, মিথ্যে কথা। যে নির্লজ্জ নিজে অপরাধী, সেই মাতাল পাজি বদমাইসটার কথা আপনারা বিশ্বাস করেন? হতেই পারেনা।

রায় মহাশয় শুধু একটু মৃদু হাসিলেন। অবিচলিত স্বরে কহিলেন, হতে পারে, এবং হয়েছে। জমিদার লোকটা যে নির্লজ্জ, মাতাল, পাজি, বদমাইস তাও জানি। বোধ হয় আরও ঢের বেশি, নইলে তার কলঙ্কের

কথাটা মুখে আন্‌তেও পারতনা। ওর নিষ্ঠুরতার অবধি নেই। গ্রামের মঙ্গলের জন্যও এ কাজে হাত দেয়নি, ঠাকুর দেব্‌তাও মানেনা। জোর করে মন্দিরে খাসি বলি দিয়ে খেয়েছিল। আবশ্যক হলে ও পাষণ্ড মুরগী শুয়োর এমন কি গো-বধ করেও খেতে পারে।

তবুও তাকে আপনি সাহায্য করতে চান?

না, আমি কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুল্‌তে চাই।

নির্ম্মল অনেকক্ষণ স্থির থাকিয়া কহিল, আপনার কাঁটা উঠ্‌বে কি না জানিনে, কিন্তু সে নিষ্কণ্টক হবে। দেবীর যে সম্পত্তিটা সে বিক্রী কর্‌তে চায়, ষোড়শী ভৈরবী থাক্‌তে তার সুবিধে হবেনা।

রায়মহাশয় কহিলেন, সে গেলেও সুবিধে হবেনা,—আমি আছি।

তিনি আছেন এতবড় ঘটনাটা নির্ম্মল বিস্মৃত হইয়াছিল, তাহার তৎক্ষণাৎ মনে হইল, জমিদারের সুবিধা না হইতে পারে, কিন্তু দেবীরও সুবিধা হইবেনা। তবে সে সুবিধাটা যে কাহার হইবে তাহাও মুখ দিয়া বাহির করিলনা।

রায়মহাশয় স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, বাবা নির্ম্মল, তুমি বড় আইন-ব্যবসায়ী, অনেক বোঝ, কিন্তু, সংসারে এসে খালি হাতে আমাকে যখন লড়াই সুরু কর্‌তে হয়েছিল, তখন শুধু কেবল বিষয়-সম্পত্তি জমা করেই কাটাইনি, মাথার ভেতরেও কিছু কিছু সঞ্চয় করবার সুযোগ পেয়েছিলাম। তোমাকে লোকে বলেচে ওই জমিটুকুর ওপরেই জমিদারের লোভ,—ষোড়শী কড়া মেয়ে, ও থাক্‌তে কিছু হবার নয়, তাই নিজেদের কলঙ্কটা রটিয়ে তাকে তাড়াতে চায়। আচ্ছা বাবাজী, বীজগাঁর জমিদারের কাছে ওটুকু কতটুকু সম্পত্তি? তার টাকার দরকার, একটা না হলে আর একটা বিক্রী কর্‌বে—আট্‌কাবে না। কিন্তু যেখানে তার সত্যিকার আট্‌কেচে, সে সম্পূর্ণ অন্য

জিনিস। এই জঙ্গলের মাঝে মাসের পর মাস সে আর পারেনা, সহরের মানুষ সহরে যেতে চায়। নির্ম্মল, হৈমর মত তুমিও আমার ছেলে, তোমাকে বল্‌তে সঙ্কোচ হয়, কিন্তু, ওই ছুঁড়িটার ভালই যদি কর্‌তে চাও ত বলে দিয়ো তার ভয় নেই। চণ্ডীগড়ের ভৈরবীগিরীর মুনাফা বেশি নয়,—যা তাঁর যাবে, জমিদার তার চতুর্গুণ পুষিয়ে দেবে, এ আমি শপথ করে বল্‌তে পারি। সে তাকে কষ্ট দিতেও চায়না—কষ্ট দেবেও না, দু' নৌকোয় পা' দিয়ে থাক্‌বার অসম্ভব লোভটা যদি সে একবার ত্যাগ করে।

নির্ম্মল নিরুত্তরে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। শ্বশুরকে সে অনেকটা জানিত,—এতটা জানিতনা। এই শ্বশুর ষোড়শীর কল্যাণের পথ যাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন তাহাতে তর্ক করিবার প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত আর তাহার রহিলনা।

শ্বাশুড়ীর দুধ গরম করিয়া আনিতে বিলম্ব হইল, তিনি ঘরে ঢুকিয়া স্বামীর পাতের কাছে বাটি নামাইয়া রাখিয়া আহারের স্বল্পতার জন্য জামাতাকে মৃদু ভৎর্সনা করিলেন, এবং এই ত্রুটি সংশোধন করিবার ভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়া অদূরে উপবেশন করিলেন।

কর্ত্তা দুধের বাটি মুখ হইতে নামাইয়া রাখিয়া কহিলেন, কিন্তু মেয়েটার একটা প্রশংসা না করে পারা যায়না,—বেটি বিদ্যের যেন সরস্বতী। জানেনা এমন শাস্ত্রই নেই।

গৃহিণী তৎক্ষণাৎ সায় দিয়া কহিলেন, তা' আর বল্‌তে। দেখেচ ত, কাজে কর্ম্মে সে দাঁড়িয়ে থাক্‌লে তোমার শিরোমণি ঠাকুর ভয়ে যেন কেঁচো হয়ে যান। চলে গেলে বুড়োর মুখ সহস্র ধারে ছোটে,—কিন্তু সুমুখে নিন্দে কর্‌বার ভরসা পাননা।

কর্ত্তা কহিলেন, না না নিন্দে কর্‌বেন কেন, তিনি বরঞ্চ সুখ্যাতিই করেন।

গৃহিণী নাকের মস্ত নথে একটা নাড়া দিয়া ততখানিই প্রতিবাদ করিলেন। বলিলেন, হাঁ, বুড়ো সেই পাত্র কি না! হিংসেয় ফেটে মরেন, আবার সুখ্যাতি করবেন! মনে নেই সেই অস্তর বোনের প্রাশ্চিত্তের ব্যবস্থা নিয়ে কি কাণ্ডই না দিন কতক করে বেড়ালেন! তা' ছাড়া ছুঁড়ি এদিকে যাই করে থাক্, শোকে দুঃখে, আপদে বিপদে গরীব দুঃখীর এমন মা-বাপও গ্রামে কেউ নেই। যখনি যে কাজেই ডাকো, মুখে হাসিটি যেন লেগে আছে, না বল্‌তে জানেনা।

কর্ত্তা খুসি হইলেননা, বলিলেন, হুঁ, সব ভৈরবীই ওসব করে থাকে।

গৃহিণী বলিলেন, সব? কেন, মাতঙ্গী ঠাকরুণকে কি আমি চোখে দেখিনি না কি?

দেখে থাক্‌লেও ভুলে গেছ।

গৃহিণী রাগ করিয়া জবাব দিলেন, ভুলিনি কিছুই। আজও তাঁর কাছে একশ' টাকা পাই,—না বলে উড়িয়ে দিলেন। ষোড়শী কখনো কাউকে ঠকিয়ে খায়নি, মিছে কথাও বলেনি।

কর্ত্তা অত্যন্ত অপ্রসন্ন হইয়া কহিলেন, না,—যুধিষ্ঠির। এই বলিয়া তিনি আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। গৃহিণী জামাতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আমি ত ভাবি এঁর কল্যাণেই নাতীর মুখ আমরা দেখ্‌তে পেলাম। না বাবা, যে যাই বলুক, ঠক জোচ্চোর সে মেয়ে নয়। তাইতে যখন শুন্‌তে পেলাম ঠাকুরের পূজো করাটি সে ছেড়ে দিয়েছে, তখনি সন্দেহ হল এ আবার কি! নইলে কারও কথায় আমি সহজে বিশ্বাস করিনি।

কর্ত্তা চৌকাটের বাহিরে পা বাড়াইয়াছিলেন, কান খাড়া করিয়া

দাঁড়াইয়া কহিলেন, বলি তার কল্যাণে ত নাতি পেলে, কিন্তু নাতির কল্যাণে মানস পূজোটি তিনি কেন অস্বীকার করলেন একবার ডেকে জিজ্ঞাসা করতে পারোনা। এই বলিয়া তিনি প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই চলিয়া গেলেন।

নির্ম্মলের খাওয়া শেষ হইয়াছিল, সেও উঠিয়া দাঁড়াইল; কহিল, ষোড়শীর ওপর থেকে দেখ্‌চি মায়ের ভক্তি আজও একেবারে যায়নি।

না বাবা, মিছে কথা কেন বল্‌ব, তার মুখখানি মনে হলেই আমার যেন কান্না পায়। এঁরা সকলে মিলে কেন যে তার বিপক্ষে এত লেগেছেন আমি ভেবেই পাইনে।

নির্ম্মল একটুখানি মৃদু হাসিয়া কর্ত্তার খোঁচার অনুসরণ করিয়া কহিল, কিন্তু মা তার মন্ত্রতন্ত্রের বিঘ্নের কথাটাও একটু ভেবো—

শ্বাশুড়ী কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, দাসী আসিয়া দ্বারের আড়ালে দাঁড়াইয়া কহিল, কে একজন জামাই বাবুকে ডাক্‌তে এসেছে,—বাবু খবর দিতে বল্‌লেন।

নির্ম্মল হাত মুখ ধুইয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল ইতিমধ্যে গ্রামের অনেকেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, এবং সন্ধ্যার পরে মন্দিরে যে বৈঠক বসিবে তাহারই আলোচনা শুরু হইয়া গেছে। শিরোমণি মহাশয়ের আজ অমাবস্যার উপবাস, তিনি নির্ম্মলকে ডাকিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, এবং বাবাজীকে হঠাৎ চিনিতে পারেন নাই বলিয়া নিজের বৃদ্ধত্বের প্রতি দোষারোপ করিলেন। যে লোকটা থামের পাশে দাঁড়াইয়া ছিল, সে নমস্কার করিয়া জানাইল যে, ভৈরবীঠাকরুণ অপেক্ষা করিয়া আছেন, তাঁহার সহিত বিশেষ কথা আছে।

নির্ম্মলের হঠাৎ অত্যন্ত লজ্জা করিয়া উঠিল; সে পিছনে না চাহিয়াও

স্পষ্ট অনুভব করিল সকলে উৎসুক কৌতুকে তাহার উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। ইহার অভ্যন্তরে যে গোপন বিদ্রূপ আছে, তাহা তাহাকে অপমানিত করিল ; অন্য সময়ে হয়ত সে ইহাকে অত্যন্ত সহজে অবহেলা করিতে পারিত, কিন্তু আজ সে নিজের মধ্যে সে জোর খুঁজিয়া পাইলনা, কিছুতেই মুখ দিয়া বাহির করিতে পারিলনা, চল, আমি যাচ্ছি। বরঞ্চ, যেন লজ্জিত হইয়াই লোকটাকে বলিয়া ফেলিল, বলগে, আমার এখন যাবার সুবিধে হবেনা।

শিরোমণি গায়ে পড়িয়া কহিলেন, ওকে জিরোবার একটু সময় দাও তোমরা,—কি বল হে ? এই বলিয়া তিনি চোখের একটা ইসারা করিয়া অকারণে হাঃ হাঃ করিয়া হাসিতে লাগিলেন। কেহ বা সে হাসিতে প্রকাশ্যে যোগ দিল, কেহ বা শুধু একটু মুচকিয়া হাসিল। নির্ম্মল সমস্ত অগ্রাহ্য করিয়া ভিতরে যাইতেছিল, শিরোমণি ডাকিয়া কহিলেন, বলি বাবাজীকে কি ও বেটি কৌঁসুলি খাড়া করেছে না কি ?

নির্ম্মল উদ্দীপ্ত ক্রোধ দমন করিয়া শান্তভাবে কহিল, মকদ্দমা বাধলে সে কাজ করতে হবে বোধ হয়।

শিরোমণি এ উত্তর আশা করেন নাই, একটু থতমত খাইয়া বলিলেন, তা' যেন করলে, কিন্তু, বলে রাখি বাবাজী, এ পুঁটি মাছের প্রাণ নয়, বাঘা-ভাল্‌কোর সঙ্গে লড়াই,—মকদ্দমা হাইকোর্টে না গড়িয়ে থাম্‌বেনা, তা নিশ্চয় জেনো।

নির্ম্মল কহিল, মাম্‌লা-মকদ্দমা কোথায় গিয়ে থামে এ তো আমার জান্‌বার কথা শিরোমণি মশায়।

শিরোমণি কহিলেন, সে তো বটেই, এ হোল তোমার ব্যবসা, তুমি আর জান্‌বেনা। কিন্তু, আরও ত ঢের খরচপত্র আছে, সে দেবে কে ?

এই বলিয়া তিনি মুখ টিপিয়া হাসিলেন। কিন্তু এ হাসিতে এবারে কেহ যোগ দিলনা।

নির্ম্মল কহিল, অভাব হলে আমি দেব।

তাহার জবাব শুনিয়া শুধু শিরোমণি নয়, উপস্থিত সকলেই অবাক হইয়া গেলেন, রায় মহাশয় নিজেও ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলেননা; রুক্ষকণ্ঠে বলিয়া ফেলিলেন, তোমাদের ঠাট্টা তামাসার সম্পর্ক নয় নির্ম্মল,—বিশেষতঃ শিরোমণি মশায় প্রাচীন এবং সম্মানিত ব্যক্তি,—উপহাস করা তোমার সাজেনা।

নির্ম্মল চুপ করিয়া রহিল; শিরোমণি সামলাইয়া লইয়া একটু হাসিবার প্রয়াস করিয়া কহিলেন, টাকা ত দেবে, কিন্তু দেবার গরজটা কি একটু শুন্‌তে পাইনে?

নির্ম্মল বলিল, আমার গরজ শুধু আপনাদের অন্যায় অত্যাচার। আমি যেখানে থাকি সেখানে যদি একবার খোঁজ নেন, ত শুন্‌তে পাবেন জীবনে এমন অনেক গরজই আমি মাথায় তুলে নিয়েচি।

যে লোকটা ডাকিতে আসিয়াছিল, সে তখনও যায় নাই; কহিল, আপনার কখন যাবার সুবিধে হবে তাঁকে জানাবো?

আমার সময় মত দেখা কোরব বোলো। এই বলিয়া সে বাটীর ভিতর প্রস্থান করিল।

সায়াহ্ন বেলায় জনার্দ্দন রায় প্রস্তুত হইয়া আসিয়া প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া ডাক দিয়া কহিলেন, মন্দিরে সকলে উপস্থিত হয়েছেন, তোমাকে তাঁরা ডাক্‌তে পাঠিয়েছেন, যদি যাও ত আর বিলম্ব কোরো না।

নির্ম্মল বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমার যাওয়া কি আপনি প্রয়োজন মনে করেন?

জনার্দ্দন কহিলেন, যাঁরা ডাকতে পাঠিয়েছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই করেন, এই বলিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন।

সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই দেবীর আরতি সুরু হইল। মাতার বহুবিধ গৌরবের বস্তুই কালক্রমে বিরল হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু তাঁহার শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁশর, ঢাক, ঢোল, সানাই প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ও যন্ত্রীর সংখ্যা প্রাচীনকাল হইতে অদ্যাবধি তেম্নি বজায় আছে। সেই সম্মিলিত তুমুল বাদ্যনিনাদ নির্ম্মল ঘরে বসিয়াই শুনিতে পাইল। কথা ছিল, আরতি শেষ হইলে পঞ্চায়েত বসিবে, অতএব সেই সুপবিত্র ধ্বনি থামিবার পরে সে গৃহ হইতে যাত্রা করিল। মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখিল আলোর বন্দোবস্ত বিশেষ কিছু নাই, প্রাঙ্গণ-মধ্যস্থিত নাট বাঙ্গালায় গোটা দুই লণ্ঠন মাঝখানে রাখিয়া একটা কোলাহল উঠিয়াছে এবং তাহাই বহুলোকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছে। সেই অন্ধকারে নির্ম্মলকে কেহ চিনিলনা, সে জন দুই লোকের কাঁধের উপর উঁকি মারিয়া দেখিল তথায় কে একজন বাবু-গোছের ভদ্রলোক হাত মুখ নাড়িয়া কি সব বলিতেছেন। কিছুই শুনা গেলনা, কিন্তু মানুষের আগ্রহ দেখিয়া এ কথা বুঝা গেল তিনি অত্যন্ত শ্রুতিমধুর কাহারও নিন্দা ও গ্লানি করিতেছেন। এই ব্যক্তিই যে জমিদার জীবানন্দ চৌধুরী তাহা সে আন্দাজ করিল, অতএব বক্তব্য বস্তু যে ষোড়শীর জীবন-চরিত তাহাতেও সন্দেহ রহিলনা। ভিড় ঠেলিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইতে যদিচ তাহার প্রবৃত্তি হইলনা, কিন্তু দুই-এক কথা শুনিবার লোভও সে সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে না পারিয়া পায়ের দুই আঙুলে ভর দিয়া উদ্‌গ্রীব হইয়া দাঁড়াইল। কয়েক মুহূর্ত্তেই মন লাগিয়া গেল,—তখনও জীবানন্দ চৌধুরী আসল বস্তুতে অবতীর্ণ হন নাই,—ষোড়শীর মায়ের ইতিবৃত্তেরই আখ্যান চলিতেছিল,—অবশ্য সমস্তই শোনা কথা, সাক্ষী তারাদাস অদূরে

বসিয়া—এই সকল অসচ্চরিত্র স্ত্রীলোকদিগের সংস্রবে কিরূপে এই পীঠ-স্থান ক্রমশঃ ধীরে ধীরে অপবিত্র হইয়া উঠিতেছে, এবং সমস্ত দেশের কল্যাণ তিরোহিত হইতেছে—

পিছনে পিঠের উপর একটু চাপ পড়িতে ফিরিয়া দেখিল কে একজন অন্ধকারে আগাগোড়া মুড়ি দিয়া তাহাকে বাহিরের দিকে ইসারা করিল, এবং তাহাকেই অনুসরণ করিয়া কয়েক পদ অগ্রসর হইতে নির্ম্মল স্পষ্ট বুঝিতে পারিল এই সুগঠিত দীর্ঘ ঋজু দেহ ষোড়শী ভিন্ন আর কাহারও নহে। সে দ্বারের বাহিরে আসিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল, এবং ঈষৎ একটু হাসিয়া অনুযোগের কণ্ঠে কহিল, ছি, কি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে যা'-তা শুন্‌চেন। কতকগুলো কাপুরুষ মিলে দু'জন অসহায় স্ত্রীলোকের কুৎসা রটনা করচে,—তাও আবার একজন মৃত, আর একজন অনুপস্থিত। চলুন আমার ঘরে, সেখানে ফকির-সাহেব বসে আছেন, আপনাকে পরিচিত করে দিইগে।

তিনি কবে এলেন?

কি জানি। বিকাল-বেলা ফিরে গিয়ে দেখি আমার ঘরের সম্মুখে দাঁড়িয়ে। আনন্দ আর রাখ্‌তে পারলামনা, প্রণাম করে নিয়ে গিয়ে আমার ঘরে বসালাম, সমস্ত ইতিহাস মন দিয়ে শুন্‌লেন।

শুনে কি বল্‌লেন?

শুধু একটুখানি হাস্‌লেন। বোধ হল যেন সমস্তই জান্‌তেন। কিন্তু, হাঁ নির্ম্মল বাবু, আপনি না কি বলেছেন আমার মামলা-মকদ্দমার সমস্ত ভার নেবেন? এ কি সত্যি?

নির্ম্মল ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হাঁ, সত্য।

কিন্তু কেন নেবেন?

নির্ম্মল একমুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, বোধ করি আপনার প্রতি অন্যায় অত্যাচার হচ্চে বলেই।

কিন্তু আর কিছু বোধ করেননা ত? বলিয়াই ষোড়শী ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, থাক্,—সব কথার যে জবাব দিতেই হবে এমন কিছু শাস্ত্রের অনুশাসন নেই। বিশেষ করে এই কূট-কচালে শাস্ত্রের,—না? আসুন, আমার ঘরে আসুন।

তাহার কুটীরে প্রবেশ করিয়া দেখিল ফকির-সাহেব নাই। কহিল, কোথায় গেছেন, বোধ হয় এখনি ফিরে আস্‌বেন। প্রদীপ স্তিমিত হইয়া আসিয়াছিল, উজ্জ্বল করিয়া দিয়া পাতা-আসনখানি দেখাইয়া দিয়া কহিল, বসুন। হাঙ্গামা, হৈ-চৈ, গণ্ডগোলের মাঝে এমন সময় পাইনে, যে বসে দুদণ্ড গল্প করি। আচ্ছা, মকদ্দমার যেন সকল ভারই নিলেন, কিন্তু, যদি হারি, তখন ভার কে নেবে? তখন পেছবেন না ত?

নির্ম্মল জবাব দিতে পারিলনা, তাহার কান পর্য্যন্ত রাঙা হইয়া উঠিল। খানিকক্ষণ পরে কহিল, হারবার কোন সম্ভাবনা আমাদের নেই।

তা' বটে। বলিয়া একবার একটুখানি যেন ষোড়শী বিমনা হইয়া পড়িল। কিন্তু, পলকমাত্র। সহসা চকিত হইয়া প্রশ্ন করিল, ছেলে কেমন আছে নির্ম্মল বাবু? কি করে তাকে ছেড়ে এলেন বলুন ত? আমি ত পারিনে।

অকস্মাৎ এই অসংলগ্ন প্রশ্নে নির্ম্মল আশ্চর্য্য হইল। ষোড়শী একবার এদিকে একবার ওদিকে বার দুই তিন মাথা নাড়িয়া হাসিমুখে বলিল, আমি কিন্তু হৈম হলে এই সমস্ত পরোপকার করা আপনার ঘুচিয়ে দিতাম। অত ভালমানুষ নই,—আমার কাছে ফাঁকি চল্‌তনা,—রাত্রিদিন চোখে চোখে রাখ্‌তাম।

ইঙ্গিত এত সুস্পষ্ট যে নির্ম্মলের বুকের মধ্যেটা বিস্ময়ে, ভয়ে ও আনন্দে

একই সঙ্গে ও একই কালে তরঙ্গিত করিয়া উঠিল। এবং সেই অসম্বৃত অবসরে মুখ দিয়া তাহার বাহির হইয়া গেল,—চোখে চোখে রাখ্‌লেই কি রাখা যায় ষোড়শী? এর বাঁধন যেখানে সুরু হয় চোখের দৃষ্টি যে সেখানে পৌঁছায়না, এ কথা কি আজও জান্‌তে তুমি পারোনি?

পেরেছি বই কি, বলিয়া ষোড়শী হাসিল। বাহিরে হঠাৎ একটা শব্দ শুনিয়া গলা বাড়াইয়া দেখিয়া কহিল, এই যে ইনি এসেছেন।

কে? ফকির সাহেব?

না, জমিদার বাবু। বলে পাঠিয়েছিলাম সভা ভাঙ্‌লে যাবার পথে আমার কুঁড়েতে একবার একটু পদধূলি দিতে। তাই দিতেই বোধ হয় আসচেন। সঙ্গে লোকজন বিস্তর, স্ত্রীলোকের ঘরে একাকী আস্‌তে বোধ করি সাধু পুরুষের ভরসায় কুলোয়নি। পাছে দুর্নাম হয়। এই বলিয়া হাসিতে লাগিল।

ব্যাপারটা নির্ম্মলের একেবারেই ভাল লাগিলনা। সে বিরক্তি ও সঙ্কোচে আড়ষ্ট হইয়া বলিল, এ কথা আমাকে আপনি বলেননি কেন?

বেশ! একবার তুমি একবার আপনি? বলিয়া সে হাসিয়া কহিল, ভয় নেই, উনি ভারি ভদ্রলোক; লড়াই করেননা। তা' ছাড়া আপনাদের ত পরিচয় নেই,—সেটাও ত একটা লাভ। এই বলিয়া সে দ্বারের বাহিরে অগ্রসর হইয়া অভ্যর্থনা করিয়া কহিল, আসুন,—আমার কুঁড়ে আর একবার পবিত্র হল।

জীবানন্দ চৌকাটে পা দিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, ইনি? নির্ম্মলবাবু বোধ হয়?

ষোড়শী হাসিমুখে জবাব দিল, হাঁ, আপনার বন্ধু বলে পরিচয় দিলে খুব সম্ভব অতিশয়োক্তি হবে না।

অনুমান কেভুল নয়, লোকটি যে সত্য সত্যই নির্ম্মল বসু, তাহা বুঝিতে পারিয়া জীবানন্দ প্রথমে চমকিত হইল, কিন্তু যে-কোন অবস্থায় নিজেকে মুহূর্ত্তে সামলাইয়া লইবার শক্তি তাহার অদ্ভুত। সে সামান্য একটু হাসিয়া বলিল, বিলক্ষণ! বন্ধু নয় ত' কি? ওঁদের কৃপাতেই ত' টিকে আছি, নইলে মামার জমিদারী পাওয়া পর্য্যন্ত যে সব কীর্ত্তি করা গেছে, তাতে চণ্ডীগড়ের শান্তিকুঞ্জের বদলে ত' এতদিন আণ্ডামানের শ্রীঘরে গিয়ে বসবাস করতে হোতো।

নির্ম্মলের গোড়া হইতেই ভাল লাগে নাই, কিন্তু নিজের দুষ্কৃতির এই লজ্জাহীন, অনাবৃত রসিকতার চেষ্টায় তাহার গা জ্বলিয়া গেল। মুখ লাল করিয়া কি একটা বলিতেও চাহিল, কিন্তু বলিতে হইলনা। ষোড়শী জবাব দিল, কহিল, চৌধুরী মশাই, উকিল-ব্যারিষ্টার বড়লোক বলে বাহবাটা কি একা ওঁরাই পাবেন? আণ্ডামান প্রভৃতি বড় ব্যাপারে না হোক্, কিন্তু ছোট বলে এ দেশের শ্রীঘরগুলোও ত মনোরম স্থান নয়,— দুঃখী বলে ভৈরবীরা কি একটু ধন্যবাদ পেতে পারেনা?

জীবানন্দ অপ্রস্তুত হইয়া হঠাৎ যাহা মুখে আসিল, কহিল। বলিল, ধন্যবাদ পাবার সময় হলেই পাবে।

ষোড়শী হাসিয়া কহিল, এই যেমন মন্দিরে দাঁড়িয়ে এইমাত্র এক দফা দিয়ে এলেন।

জীবানন্দ ইহার কোন জবাব দিলনা। নির্ম্মলের প্রতি চাহিয়া কহিল, আপনার শ্বশুর মশায়ের মুখে শুনলাম আপনি আস্‌চেন,—আশা করেছিলাম মন্দিরেই আলাপ হবে।

ষোড়শী বলিল, সে আমার দোষ চৌধুরী মশায়। উনি এসেও ছিলেন, এবং সদালাপে যোগ না দিন, ভিড়ের বাইরে দাঁড়িয়ে গলা বাড়িয়ে শোন-বার চেষ্টাও করেছিলেন, কিন্তু আমি দেখ্‌তে পেয়ে হাত ধরে টেনে নিয়ে এলাম। বোল্‌লাম, চলুন, নির্ম্মলবাবু, ঘরে বসে বরঞ্চ দুটো গল্প সল্প করা যাক্।

জীবানন্দ মনের উত্তাপ চাপিয়া কতকটা সহজ গলাতেই কহিল, তা'হলে আমি এসে পড়ে ত ব্যাঘাত দিলাম।

ষোড়শী বলিল, দিয়ে থাক্‌লেও আপনার দোষ নেই,—আমিই আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম।

জীবানন্দ কহিল, কিন্তু কেন? গল্প করতে নয় বোধ হয়।

ষোড়শী হাসিয়া ফেলিল। বলিল, না গো মশায় না,—বরঞ্চ, ঠিক তার উল্‌টো। আজ আপনাকে আমি ভারি বোক্‌বো। তাহার কণ্ঠস্বর ও কথা কহিবার ভঙ্গী দেখিয়া নির্ম্মল ও জীবানন্দ উভয়েই আশ্চর্য্য হইয়া চাহিয়া রহিল। ষোড়শী হঠাৎ একটুখানি গম্ভীর হইয়া বলিল, ছি ছি, ওখানে আজ কি কর্‌ছিলেন বলুন ত? একটা সভার আড়ম্বর করে মাঝখানে দাঁড়িয়ে দুজন অসহায় স্ত্রীলোকের কি কুৎসাই রটনা করছিলেন! এর মধ্যে একজন আবার বেঁচে নেই। এ কি কোন পুরুষের পক্ষেই সাজে? তা ছাড়া, কি প্রয়োজন ছিল বলুন ত? সেদিন এই ঘরে বসেই ত আপনাকে বলেছিলাম আপনি আমাকে যা আদেশ করবেন আমি পালন কোরব। আপনিও আপনার হুকুম স্পষ্ট করে জানিয়েছিলেন, আমিও আমার প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার করিনি। এই নিন্ মন্দিরের চাবি, এবং এই নিন্ হিসাবের খাতা। এই বলিয়া সে অঞ্চল হইতে চাবির গোছা খুলিয়া এবং তাকের উপর হইতে একখানা খেরো-বাঁধানো মোটা খাতা

পাড়িয়া জীবানন্দর পায়ের কাছে রাখিয়া দিয়া কহিল, মায়ের যা' কিছু অলঙ্কার, যত কিছু দলিল-পত্র সিন্দুকের ভিতরেই পাবেন, এবং আরও একখানা কাগজ পাবেন যাতে ভৈরবীর সকল দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য ত্যাগ করে আমি সই করে দিয়েছি।

জীবানন্দ বোধ করি ঠিক বিশ্বাস করিতে পারিলনা, কহিল, বল কি। কিন্তু ত্যাগ করলে কার কাছে?

ষোড়শী বলিল, তাতেই লেখা আছে দেখ্‌তে পাবেন।

তাই যদি হয় ত, এই চাবিটাবিগুলো তাঁকেই দিলে না কেন?

তাঁকেই যে দিলাম। এই বলিয়া ষোড়শী মুখ টিপিয়া একটু হাসিল। কিন্তু সেই হাসি দেখিয়া এইবার জীবানন্দর মুখ মলিন হইয়া উঠিল; সে ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া সন্দিগ্ধ-কণ্ঠে কহিল, কিন্তু এ তো আমি নিতে পারিনে। খাতায় লেখা নামগুলোর সঙ্গে যে সিন্দুকে রাখা জিনিসগুলোও এক হবে, সে আমি কি করে বিশ্বাস কোরব? তোমার আবশ্যক থাকে তুমি পাঁচজনের কাছে বুঝিয়ে দিয়ো।

ষোড়শী ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আমার সে আবশ্যক নেই। কিন্তু চৌধুরী মশায়, আপনার এ অজুহাতও অচল। একদিন চোখ বুজে যার হাত থেকে বিষ নিয়ে খাবার ভরসা হয়েছিল, তার হাত থেকে আজ এটুকু চোখবুজে নেবার সাহস হওয়া আপনার উচিত। অপরকে বিশ্বাস করবার শক্তি আপনার সত্যসত্যই এত কম, এ কথা আমি কোনমতে স্বীকার করতে পারিনে। নিন্, ধরুন—এই বলিয়া সে খাতা এবং চাবির গোছা মাটি হইতে তুলিয়া একরকম জোর করিয়া জীবানন্দর হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিল, আজ আমি বাঁচ্‌লাম। আমার কোন ভারই ত কোন দিন নেন্‌নি, এতটুকুও না নিলে যে ধর্ম্মে পতিত হবেন। তা'ছাড়া পরকালে

জবাব দেবেন কি ? এই বলিয়া সে হাসিতে হাসিতে কহিল, পরকালের চিন্তায় ত আপনার ঘুম হয়না, সে আমি জানি, কিন্তু যা হয়ে গেছে তা গেছে, ভবিষ্যতে কিছু কিছু চিন্তা করতে হবে, তা বলে দিচ্চি। তাহার মুখের হাসি সত্ত্বেও কণ্ঠস্বর যেন ইহার শেষ দিকে কোমলতায় বিগলিত হইয়া উঠিল। কহিল, আর একটিমাত্র ভার আপনাকে দিয়ে যাবো, সে আমার গরীব দুঃখী প্রজাদের ভার। আমি শত ইচ্ছে করেও তাদের ভাল করতে পারিনি,—কিন্তু আপনি অনায়াসে পারবেন। নির্ম্মলের প্রতি চাহিয়া কহিল, আমার কথাবার্ত্তা শুনে আপনি আশ্চর্য্য হ'য়ে গেছেন, না নির্ম্মল বাবু ?

নির্ম্মল মাথা নাড়িয়া বলিল, শুধু আশ্চর্য্য নয়, আমি প্রায় অভিভূত হয়ে পড়েচি। ভৈরবীর আসন ত্যাগ করে যে আপনি ইতিমধ্যে ছাড়-পত্র পর্য্যন্ত সই করে রেখেছেন, এ খবর ত আমাকে ঘুণাগ্রে জানান্‌নি ?

ষোড়শী হাসিমুখে কহিল, আমার অনেক কথাই আপনাকে জানানো হয়নি, কিন্তু একদিন হয় ত সমস্তই জান্‌তে পারবেন কেবল একটিমাত্র মানুষ সংসারে আছেন যাঁকে সকল কথাই জানিয়েচি, সে আমার ফকির সাহেব।

এ সকল পরামর্শ বোধ করি তিনিই দিয়েছেন ?

ষোড়শী তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, না, তিনি আজ সকালে পর্য্যন্ত কিছুই জানতেননা, এবং ওই যাকে ছাড়পত্র বলচেন সে আমার কাল রাত্রের রচনা। যিনি এ কাজে আমাকে প্রবৃত্তি দিয়েছেন, শুধু তাঁর নামটিই আমি সংসারে সকলের কাছে গোপন রাখবো :

জীবানন্দ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, মনে হচ্চে যেন বাড়ীতে ডেকে এনে আমার সঙ্গে কি একটা

প্রকাণ্ড তামাসা কোরচ ষোড়শী। এ বিশ্বাস করা যেন সেই মরফিয়া খাওয়ার চেয়েও শক্ত ঠেক্‌চে।

এতক্ষণ পরে নির্ম্মল তাহার পানে চাহিয়া একটু হাসিল, কহিল, আপনি ত তবু এই কয়েক পা মাত্র হেঁটে এসে তামাসা দেখ্‌ছেন, কিন্তু আমাকে কাজ-কর্ম্ম বাড়ীঘর ফেলে রেখে এই তামাসা দেখ্‌তে আটশ মাইল ছুটে আস্‌তে হয়েছে। এ যদি সত্য হয় ত, আপনি যা' চেয়েছিলেন অন্ততঃ সেটা পেয়ে গেলেন, কিন্তু আমার ভাগ্যে ষোলো আনাই লোক্‌সান। একে তামাসা বোল্‌ব কি উপহাস বোল্‌ব ভেবেই পাচ্চিনে। এই বলিয়া সে লোকটার মুখের প্রতি আর একবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিতে, দেখিতে পাইল তাহার দুই চক্ষু আকস্মিক বেদনার ভারে যেন ভারাক্রান্ত। সে জবাব কিছুই দিলনা, শুধু একটু-খানি হাসিবার চেষ্টা করিল।

নির্ম্মল ষোড়শীকে প্রশ্ন করিল, এ সকল ত আপনার পরিহাস নয়?

ষোড়শী বলিল, না নির্ম্মলবাবু, আমার এবং আমার মায়ের কুৎসায় দেশ ছেয়ে গেল, এই কি আমার হাসি-তামাসার সময়? আমি সত্য-সত্যই অবসর নিলাম।

নির্ম্মল কহিল, তা'হলে বড় দুঃখে পড়েই এ কাজ আপনাকে করতে হোলো।

ষোড়শী উত্তর দিলনা, নির্ম্মল নিজেও একটু স্থির থাকিয়া বলিল, আমি বাঁচাতে আপনাকে এসেছিলাম, বাঁচাতেও হয় ত পারতাম, তবু কেন যে তা হতে দিলেন না তা' আমি বুঝেচি। বিষয় রক্ষা হোতো, কিন্তু কুৎসার ঢেউ তাতে তেমনি উত্তাল হয়ে উঠ্‌ত। এবং সে থামাবার সাধ্য আমার ছিলনা। এই বলিয়া সে যে কাহাকে কটাক্ষ করিল তাহা উপস্থিত

সকলেই বুঝিল। কিন্তু জীবানন্দ নীরব হইয়াই রহিল এবং ষোড়শী নিজেও ইহার কোন প্রতিবাদ করিলনা।

নির্ম্মল জিজ্ঞাসা করিল, এখন তা'হলে কি করবেন স্থির করেছেন?

ষোড়শী বলিল, সে আপনাকে আমি পরে জানাবো।

কোথায় থাকবেন?

এ সম্বাদও আপনাকে আমি পরে দেবো।

বাহিরে হইতে সাড়া আসিল, মা? ষোড়শী গলা বাড়াইয়া দেখিয়া কহিল, ভূতনাথ? আয় বাবা, ঘরে নিয়ে আয়। মন্দিরের ভৃত্য আজ একটা বড় ঝুড়ি ভরিয়া দেবীর প্রসাদ নানাবিধ ফলমূল ও মিষ্টান্ন আনিয়াছিল। ষোড়শী হাতে লইয়া জীবানন্দর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া স্নিগ্ধ হাসিমুখে কহিল, সেদিন আপনাকে পেট ভরে খেতে দিতে পারিনি, কিন্তু আজ সে ত্রুটি সংশোধন করে তবে ছাড়্‌বো। নির্ম্মলের প্রতি চাহিয়া বলিল, আর আপনি ত ভগিনীপতি, কুটুম্ব,—আপনাকে শুধু শুধু যেতে দিলে ত অন্যায় হবে। অনেক তিক্ত কটু আলোচনা হয়ে গেছে, এখন বসুন দিকি দুজনে খেতে। মিষ্টিমুখ না করিয়ে ছেড়ে দিলে আমার ক্ষোভের সীমা থাক্‌বেনা।

নির্ম্মল কহিল, দিন্; কিন্তু জীবানন্দ অস্বীকার করিয়া বলিল, আমি খেতে পারবনা।

পারবেননা? কিন্তু পারতেই যে হবে।

জীবানন্দ তথাপি মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

ষোড়শী হাসিয়া কহিল, মিথ্যে মাথা নাড়া চৌধুরী মশায়। যে সুযোগ জীবনে আর কখনো পাবোনা, তা' যদি হাতে পেয়ে ছেড়ে দিই ত মিছেই এতকাল ভৈরবীগিরী করে এলাম। এই বলিয়া সে

জলহাতে উভয়েরই সম্মুখের স্থানটা মুছিয়া লইয়া সালপাতা পাতিয়া মিষ্টান্ন পরিবেশন করিয়া খাওয়াইতে বসিল।

মিষ্টান্ন যে আজ যথার্থই জীবানন্দর গলায় বাধিতেছিল, ইহা লক্ষ্য করিতে ষোড়শীর বিলম্ব হইলনা। সে গলা খাটো করিয়া কহিল, তবে থাক্, এগুলো আর আপনার খেয়ে কাজ নেই, আপনি শুধু দুটো ফল খান্। এই বলিয়া নিজেই হাত বাড়াইয়া তাঁহার পাতার একধারে উচ্ছিষ্ট খাবারগুলা সরাইয়া দিয়া বলিল, কি হোলো আজ? সত্যিই ক্ষিদে নেই না কি? না থাকে ত জোর করে খাবার দরকার নেই। দেহের মধ্যে যে অসুখের সৃষ্টি করে রেখেছেন, সে মনে হলেও আমার ভয় হয়।

নির্ম্মল একমনে খাইতেছিল, সে মুখ তুলিয়া চাহিল। এই কণ্ঠস্বরের অনির্ব্বচনীয়তা খট্ করিয়া তাহার কানে বাজিয়া অকারণে বহুদূরবর্ত্তিনী হৈমকে তাহার স্মরণ করাইয়া দিল। দুজনের অনেকহাস্য-পরিহাসের বিনিময় হইয়া গেছে, আজ সকালেও এই ষোড়শীর কথায় ও ইঙ্গিতে সর্ব্বশরীরে তাহার পুলকের বিদ্যুৎ শিহরিয়া গেছে; কিন্তু এ গলা ত' সে নয়। মাধুর্য্যের এরূপ নিবিড় রসধারা ত' তাহাতে ঝরে নাই। মিষ্টান্নের মিষ্ট তাহার মুখে বিস্বাদ এবং ফলের রস তিতো লাগিয়া আহারের সমস্ত আনন্দ যেন মুহূর্ত্তে তিরোহিত হইয়া গেল। খানিক পরে লক্ষ্য করিয়া ষোড়শী সবিস্ময়ে কহিল, আপনারও যে ওই দশা হ'ল নির্ম্মল বাবু, খেলেন কুই?

নির্ম্মল বলিল, যা' খেতে পারি তা' আপনার বলবার আগেই খেয়েচি, অনুরোধের অপেক্ষা করিনি।

খাবারগুলো আজ বুঝি তা'হলে ভাল দেয়নি?

তা' হবে। অন্যদিন কেমন দেয় সে তো জানিনে। এই বলিয়া সে হাত ধুইবার উপক্রম করিল। এ বিষয়ে তাহার কৌতূহলের একান্ত অভাব

শুধু ষোড়শীর নয়, জীবানন্দরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিল ; কিন্তু এ লইয়া কেহ আর আলোচনা তুলিলনা। বাহিরে আসিয়া ষোড়শী মুখ-হাত ধুইবার জল দিয়া এবং সাজা পান হাতে দিয়া তাহা ঠিক আছে কি না দেখিয়া লইতে অনুরোধ করিল, কিন্তু নিজের বা তাহার সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করিলনা।

নির্ম্মল কহিল, আমি এখন তা'হলে যাই—

আপনি বাড়ী ফির্‌বেন কবে ?

আমার আর ত' কোন প্রয়োজন নেই, হয় ত কালই ফির্‌তে পারি। ছেলেকে, হৈমকে আমার আশীর্ব্বাদ দেবেন।

নির্ম্মল এক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আমাকে আর বোধ হয় কোন আবশ্যক নেই ?

ষোড়শী নিজেও ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, এত বড় অহঙ্কারের কথা কি আমি বল্‌তে পারি নির্ম্মল বাবু? তবে মন্দির নিয়ে আর বোধ হয় আমার কখনো আপনাকে দুঃখ দেবার আবশ্যক হবেনা।

নির্ম্মল ম্লান মুখে হাসির প্রয়াস করিয়া কহিল, আমাদের শীঘ্র ভুলে যাবেন না আশা করি ?

ষোড়শী মাথা নাড়িয়া শুধু কহিল, না।

নির্ম্মল নমস্কার করিয়া কহিল, আমি চো'ল্লাম। যদি সকালের গাড়ীতেই যাওয়া হয় ত' আর বোধ হয় দেখা করবার সময় পাবোনা। হৈম আপনাকে বড় ভালবাসে ; যদি অবকাশ পান, মাঝে মাঝে একটা খবর দেবেন। এই বলিয়া সে আর কোন প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়া বাহির হইয়া গেল। প্রবঞ্চিতের লজ্জা ও জ্বালা অত্যন্ত সংগোপনে তাহার বুকের মধ্যে ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। এবং বিফল-মনোরথ মাতাল যেমন করিয়া তাহার মদের দোকানের রুদ্ধ দুয়ার হইতে ফিরিবার পথে নিজেকে

সান্ত্বনা দিতে থাকে, তেম্‌নি করিয়া সে সমস্ত পথটা মনে মনে বলিতে লাগিল, আমি বাঁচিয়া গেলাম, আমি বাঁচিয়া গেলাম—স্বেচ্ছাচারিণীর মোহের বেষ্টন হইতে বাহির হইতে পারিয়া আমার হৈমকে আবার ফিরিয়া পাইলাম। কথাগুলা কেবলমাত্র বারংবার আবৃত্তি করিয়াই সে তাহার পীড়িত, আহত হৃদয়ের কাছে যেন সপ্রমাণ করিতে চাহিল, যে এ ভালই হইল যে ষোড়শীর গৃহের দ্বার তাহার মুখের উপর চিরদিনের মত বন্ধ হইয়া গেল।

মিনিট দুই তিন পরে জীবানন্দ বাহিরে আসিয়া দেখিল অন্ধকারে একটা খুঁটি ঠেস দিয়া ষোড়শী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে; কাছে আসিয়া আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, নির্ম্মল বাবু কি চলে গেলেন?

এ প্রশ্নের উত্তর দিবার প্রয়োজন ছিলনা, ষোড়শী তেম্‌নি চুপ করিয়াই রহিল। জীবানন্দ কহিল, ভদ্রলোকটিকে ঠিক বুঝ্‌তে পারলামনা।

ষোড়শী পথের দিকে চাহিয়া ছিল, সেই দিকেই চক্ষু রাখিয়া বলিল, তাতে আপনার ক্ষতি কি?

আমার ক্ষতি? তা' বোধ করি কিছু নেই, কিন্তু তোমার ত' থাক্‌তে পারে? তুমি কি তাঁকে বুঝ্‌তে পেরেছ?

ষোড়শী কহিল, আমার যতটুকু দরকার তা' পেরেছি বই কি।

তা'হলে ভাল। এই বলিয়া সে ক্ষণকাল নিঃশব্দে থাকিয়া যেন নিজের মনেই কহিল, তাঁকে মনে রাখবার জন্যে কি রকম ব্যাকুল প্রার্থনা জানিয়ে গেলেন। দরখাস্ত মঞ্জুর করলে ত'? বলিয়া মুখ তুলিয়া চাহিতে সেই অন্ধকারেও দুজনের চোখে চোখে মিলিল। ষোড়শী দৃষ্টি অবনত করিলনা, বলিল, আমি তাঁকে যতখানি জানি, তার অর্দ্ধেকও যদি আমাকে জান্‌বার তাঁর সময় হোতো, এত বড় বাহুল্য আবেদন আমার কাছে তিনি মুখে উচ্চারণ করতেও পার্‌তেননা। আমার যা কিছু কল্পনা, যত কিছু আনন্দের

ভাবনা, সে তো কেবল তাঁদের নিয়েই। তাঁদের দেখেই ত' আমি সে ষোড়শী আর নেই। এই যে চণ্ডীগড়ের ভৈরবী পদ, যা ভাগ করে নেবার লোভে আপনাদের ছেঁড়া-ছিঁড়ির অবধি নেই,—যে জন্যে কলঙ্কে দেশ আপনারা ছেয়ে দিলেন, সে যে আজ জীর্ণ বস্ত্রের মত ত্যাগ করে যাচ্চি, সে শিক্ষা কোথায় পেয়েছি জানেন? সে ওইখানে। মেয়ে মানুষের কাছে এ যে কত ফাঁকি, কত মিথ্যে, সে কথা ওঁদের দেখেই বুঝ্‌তে পেরেছি। অথচ এর বাষ্পও তিনি জানেননা, কোনদিন হয় ত' জান্‌তেও পারবেননা।

জীবানন্দ অবাক্ হইয়া চাহিয়া ছিল, সহসা সেই দিকে দৃষ্টি পড়ায় ষোড়শী নিজের উচ্ছ্বসিত আবেগে লজ্জিত হইয়া নীরব হইল। কিছুক্ষণ উভয়েই মৌন থাকার পরে জীবানন্দ ধীরে ধীরে কথা কহিল। বলিল, একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে আমার ভারি লজ্জা করে, কিন্তু যদি পারতাম, তুমি কি তার সত্যি জবাব দিতে পারতে অলকা?

জীবানন্দর মুখে এই অলকা নামটা ষোড়শীর সব চেয়ে বড় দুর্ব্বলতা। তিন অক্ষরের এই ছোট্ট কথাটি তাহার কোন্ খানে গিয়া যে আঘাত করিত, সে ভাবিয়া পাইতনা। বিশেষ করিয়া তাহার প্রশ্ন করার এই কৌতুককর ভঙ্গীতে ষোড়শীর হাসি পাইল; কহিল, আপনি যদি কোন একটা আশ্চর্য্য কাজ করতে পারতেন, তার পরে আমি আর কোন একটা তেম্‌নি অদ্ভুত কাজ করতে পারতাম কি না, এত বড় সত্য করবার শক্তি আমার নেই। কিন্তু সে কাজ করবার আপনার আবশ্যক নেই,—আমি বুঝেচি। অপবাদ আপনারা দিয়েছেন বলেই তাকে সত্যি করে তুল্‌তে হবে, তার অর্থ নেই। আমি কিছুর জন্যেই কখনো কারও আশ্রয় গ্রহণ কোরবনা। আমার স্বামী আছেন, কোন লোভেই সে কথাটা আমি ভুলে যেতে পারবনা। এই ভয়ানক প্রশ্নটাই না আপনাকে লজ্জা দিচ্ছিল চৌধুরী মশায়?

তুমি আমাকে চৌধুরী মশায় বল কেন?

তবে কি বোলব? হুজুর?

না। অনেকে য়া' বলে ডাকে,—জীবানন্দবাবু।

ষোড়শী বলিল, বেশ, ভবিষ্যতে তাই হবে।

জীবানন্দ কহিল, ভবিষ্যতে কেন, আজই বল না?

ষোড়শী ইহার কোন উত্তর দিলনা। ভিতরে প্রদীপ স্তিমিত হইয়া আসিতেছিল। সে ঘরে আসিয়া তাহা উজ্জ্বল করিয়া দিল। জীবানন্দ ফিরিয়া আসিয়া বসিতেই ষোড়শী বিস্মিত হইয়া কহিল, রাত্রি হয়ে যাচ্চে, আপনি বাড়ী গেলেননা? আপনার লোকজন কই?

আমি তাদের পাঠিয়ে দিয়েচি।

একলা বাড়ী যেতে আপনার ভয় করবেনা?

না, আমার পিস্তল সঙ্গে আছে।

তবে তাই নিয়ে বাড়ী যান, আমার ঢের কাজ আছে।

জীবানন্দ কহিল, তোমার থাক্‌তে পারে, কিন্তু আমার নেই। আমি এখন যাবোনা।

ষোড়শীর চোখের দৃষ্টি প্রখর হইয়া উঠিল, কিন্তু শান্তভাবে বলিল, রাত হয়েছে, আমি লোক ডেকে আপনার সঙ্গে দিচ্চি, তারা বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আস্‌বে।

জীবানন্দ বুঝিল কথাটা তাহার ভাল হয় নাই। অপ্রতিভ হইয়া কহিল, ডাক্‌তে কাউকে হবেনা, আমি আপনিই যাচ্চি। যেতে আমার ইচ্ছে হয়না, তাই শুধু আমি বল্‌ছিলাম। তুমি কি সত্যই চণ্ডীগড় ছেড়ে চলে যাবে অলকা?

আবার সেই নাম! জীবানন্দর মুখের পানে চাহিয়া তাহার ক্লেশ বোধ হইল, ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে সত্যই সে চলিয়া যাইবে।

কবে যাবে?

কি জানি, হয় ত কালই যেতে পারি।

কাল? কালই যেতে পারো? এই বলিয়া জীবানন্দ একেবারে স্তব্ধ হইয়া বসিল। অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, আশ্চর্য্য! মানুষের নিজের মন বুঝ্‌তেই কি ভুল হয়। যাতে তুমি যাও, সেই চেষ্টাই প্রাণপণে করেছি,—অথচ, তুমি চলে যাবে শুনে চোখের সাম্‌নে সমস্ত দুনিয়াটা যেন শুক্‌নো হয়ে গেল। নির্ম্মলবাবু মস্ত লোক, মস্ত বড় ব্যারিষ্টার,—তিনি আসছেন তোমার পক্ষ নিয়ে,—হাঙ্গামা বাধবে, লড়াই স্থরু হবে,—আমরাই জিতবো, ওই যে জমিটা দেনার দায়ে বিক্রী করেচি, ও নিয়ে আর কোন গোলমাল হবেনা—কতকগুলো নগদ টাকাও হাতে এসে পড়বে, আর তোমাকে ত যা বল্‌বো তাই কর্‌তে হবে, এই দিক্‌টাই কেবল দেখতে পেয়েচি,—কিন্তু আরও যে একটা দিক আছে,—তুমি নিজেই সমস্ত ছেড়েছুড়ে দিয়ে বিদায় নিলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াবে, তামাসাটা কোথায় গিয়ে গড়াবে, এ আমার স্বপ্নেও মনে হয়নি;—আচ্ছা অলকা, এমন ত হতে পারে, আমার মত তোমারও ভুল হচ্চে,—তুমিও নিজের মনের ঠিক খবরটি পাওনি।

কথাগুলি এত চমৎকার এবং এমন নূতন যে হঠাৎ বিস্ময় লাগে ইহা জীবানন্দর মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে। জবাব দিতে ষোড়শীকে একটু থামিতে হইল। শেষে সায় দিয়া বলিল, হতে পারে বই কি। শুধু এই খবরটা নিশ্চয় জানি, যা' আমি স্থির করেছি, সে আর অস্থির হবেনা।

জীবানন্দ বলিয়া উঠিল, বাপ্‌রে বাপ! তোমার পুরুষ মানুষ, আর আমার মেয়ে-মানুষ হওয়া উচিত ছিল,—আচ্ছা সেখানেই বা তোমার চল্‌বে কি করে?

ষোড়শী পূর্ব্বের মতই সহজ গলায় উত্তর দিল, এ আলোচনা আমি আপনার সঙ্গে কোনমতে করতে পারিনে।

জীবানন্দ রাগ করিয়া বলিল, তুমি কিছুই পারোনা, তুমি পাথর। চুলে আমার পাক ধরে এলো, আমি বুড়ো হয়ে গেলাম,—তোমার কাছে কি এখন আমি হাত-জোড় করে কাঁদতে পারি তুমি ভেবেচ!

ষোড়শী কহিল, দেখুন অনেক রাত্রি হোলো এখনো আমার আহ্নিক পর্য্যন্ত সারা হয়নি—

পুরোহিতের কাশি এবং পায়ের শব্দ বাহিরে শোনা গেল; সে দ্বারের কাছে আসিয়া বলিল, মা, সকলের সম্মুখে মন্দিরের দোর বন্ধ করে চাবিটা আমি তারাদাস ঠাকরের হাতেই দিলাম। রায় মশায়, শিরোমণি—এঁরা দাঁড়িয়ে ছিলেন।

ষোড়শী কহিল, ঠিকই হয়েছে। তুমি একটু দাঁড়াও আমি সাগরের ওখানে একবার যাবো বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

জীবানন্দ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল, এগুলোও তা হলে তুমি রায় মশায়ের কাছেই পাঠিয়ে দিয়ো।

ষোড়শী ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না, সিন্দুকের চাবি আর কারও হাতে দিয়েই আমার বিশ্বাস হবেনা।

শুধু আমাকেই হবে?

ষোড়শী ইহার কোন উত্তর না দিয়া ঘরের তালাটা হাতে লইয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং জীবানন্দ বাহিরে আসিতেই কবাট বন্ধ করিয়া তাহার পায়ের কাছে গড় হইয়া প্রণাম করিয়া পুরোহিতের পিছনে পিছনে নিঃশব্দে প্রস্থান করিল। শুধু একাকী জীবানন্দ সেই অন্ধকার বারান্দায় ভূতের মত নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

২৩

ব্যারিষ্টার সাহেব চলিয়া গেছেন, ষোড়শী চলিয়া যাইতেছে,—মন্দিরের চাবি-তালা সরঞ্জাম প্রভৃতি যাহা কিছু মূল্যবান সমস্ত আদায় হইয়া গেছে,—ইত্যাদি সম্বাদ রাষ্ট্র হইয়া পড়িতে কিছুমাত্র বিলম্ব ঘটিলনা। শিরোমণি আনন্দের আবেগে মুক্ত-কচ্ছ আলু-থালু বেশে রায় মহাশয়ের সদরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

নির্ম্মলের যাবার সময়ে বিদায়ের পালাটা বিশেষ প্রীতিকর হয় নাই। মনে মনে বোধ করি এই সকল আলোচনাতেই জনার্দ্দনের মুখ-মণ্ডল গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়াছিল; কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য করিবার অবস্থা শিরোমণির ছিলনা, তিনি আশীর্ব্বাদের ভঙ্গীতে ডান হাত তুলিয়া গদ্গদ কণ্ঠে কহিলেন, দীর্ঘজীবী হও, ভায়া, সংসারে এসে বুদ্ধি ধরেছিলে বটে!

জনার্দ্দন মুখ তুলিয়া কহিলেন, ব্যাপার কি?

শিরোমণি বলিলেন, ব্যাপার কি! দশখানা গাঁয়ে রাষ্ট্র হ'তে বাকি আছে না কি? বেটি চাবি-পত্র যা কিছু সমস্ত দিয়ে চলে যাচ্চে যে। বলি, শোন্-নি না কি?

যে ভদ্রলোক সকাল হইতে বসিয়া এ মাসে সুদের কিছু টাকা মাপ করিতে অনুনয় বিনয় করিতেছিল, সে কহিল, বেশ! যজ্ঞেশ্বর জানলেন না, আর খবর পেলেন ঘেঁটু-মনসা? এ সব করলে কে, শিরোমণি খুড়ো, সমস্তই ত' রায় মশায়।

শিরোমণি আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, কিন্তু আসল চাবিটা শুন্‌চি না কি গিয়ে পড়েছে জমিদারের হাতে? ব্যাটা পাঁড় মাতাল,—দেখো

ভায়া, শেষকালে মায়ের সিন্দুকের সোনারূপো না ঢুকে যায় শুঁড়ির সিন্দুকে। পাপের আর অবধি থাক্‌বেনা।

ক্রমশঃ একে একে গ্রামের অনেকেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন, স্থির হইল, জমিদারের হাত হইতে চাবিটা অবিলম্বে উদ্ধার করা চাই। বেলা তৃতীয় প্রহরে ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া হুজুর যখন মদ খাইতে আরম্ভ করিবেন, তাঁহার মাতাল হইয়া পড়িবার পূর্ব্বেই সেটা হস্তগত করা প্রয়োজন। সেটা তাঁহার হাতে যাওয়ার সম্বন্ধে জনার্দ্দন নিজের সামান্য একটু ত্রুটি ও অবিবেচনা স্বীকার করিয়া লইয়াই কহিলেন, সমস্তই স্থির কোরে রেখেছিলাম, হঠাৎ উনি যে মাঝে থেকে চাবি হাত করবেন সেটা আর খেয়াল করিনি। এখন, সহজে দিলে হয়। দশ দিন পরে হয় ত বলে বস্‌বে, কই কিছুই ত সিন্দুকে ছিলনা! কিন্তু আমরা সবাই জানি, ভায়া, ষোড়শী আর যাই কেন না করুক, মায়ের সম্পত্তি অপহরণ কর্‌বেনা,—একটি পাই পয়সা না।

সকলেই একথা স্বীকার করিল। অনেকের এমনও মনে হইল, ইহার চেয়ে বরঞ্চ সে-ই ছিল ভাল।

এই দল যথাসময়ে এবং যথোচিত সমারোহে যখন জমিদারের শান্তি-কুঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হইল, জমিদার তখন বাহিরের ঘরে বসিয়া। মদের বোতল ও গ্লাসের পরিবর্ত্তে জমিদারীর মোটা মোটা খাতা-পত্র তাঁহার সম্মুখে। একধারে বসিয়া তাঁহার সহচর প্রফুল্লচন্দ্র খবরের কাগজ পড়িতেছিল, সেই সকলকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল।

শিরোমণি সকলের অগ্রে কথা কহেন, এবং সকলের শেষে অনুতাপ করেন, এ ক্ষেত্রেও তিনিই কথা কহিলেন; বলিলেন, হুজুরের পাছে নিদ্রার ব্যাঘাত হয়, তাই একটু বিলম্ব ক'রেই আমরা সকলে—

জীবানন্দ খাতা-পত্র একপাশে ঠেলিয়া রাখিয়া সহাস্যে কহিলেন, বিলম্ব

না ক'রে এলেও হুজুরের নিদ্রার ব্যাঘাত হোত না শিরোমণি মশায়, কারণ, দিনের বেলা তিনি নিদ্রা দেননা।

কিন্তু আমরা যে শুনি হুজুর—

শোনেন? তা' আপনারা অনেক কথা শুনেন যা সত্য নয়, এবং অনেক কথা বলেন যা মিথ্যে। এই যেমন আমার সম্বন্ধে ভৈরবীর কথাটা—বলিয়া বক্তা হাস্য করিলেন, কিন্তু শ্রোতার দল থতমত খাইয়া একেবারে মুসড়িয়া গেল। জীবানন্দ কহিলেন, কিন্তু যে জন্যে ত্বরা করে আস্‌তে চেয়েছিলেন তার হেতুটা শুনি?

জনার্দ্দন রায় নিজেকে কথঞ্চিৎ সামলাইয়া লইলেন, মনে মনে কহিলেন, এত ভয়ই বা কিসের? প্রকাশ্যে বলিলেন, মন্দির সংক্রান্ত গোলযোগ যে এত সহজে নিষ্পত্তি কর্‌তে পারা যাবে তা আশা ছিলনা। নির্ম্মল যে রকম বেঁকে দাঁড়িয়েছিল—

জীবানন্দ কহিলেন, তিনি সোজা হ'লেন কি করে?

এই ব্যঙ্গ জনার্দ্দন অনুভব করিলেন, কিন্তু শিরোমণি তাহার ধার দিয়াও গেলেননা, খুসি হইয়া সদর্পে কহিলেন, সমস্তই মায়ের ইচ্ছা, হুজুর, সোজা যে হতেই হবে। পাপের ভার তিনি আর বইতে পারছিলেননা।

জীবানন্দ ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, তাই হবে। তারপরে?

শিরোমণি বলিলেন, কিন্তু পাপ ত দূর হল, এখন,—বলনা জনার্দ্দন, হুজুরকে সমস্ত বুঝিয়ে বলনা? এই বলিয়া তিনি রায় মহাশয়কে হাত দিয়া ঠেলিলেন। জনার্দ্দন চকিত হইয়া কহিলেন, মন্দিরের চাবি ত আমরা দাঁড়িয়ে থেকেই তারাদাস ঠাকুরকে দিইয়েচি। আজ তিনিই সকালে মায়ের দোর খুলেচেন, কিন্তু সিন্দুকের চাবিটা শুন্‌তে পেলাম ষোড়শী হুজুরের হাতে সমর্পণ করেছে।

জীবানন্দ সায় দিয়া কহিলেন, তা' করেচে। জমাখরচের খাতাও একখানা দিয়েচে।

শিরোমণি বলিলেন, বেটি এখনও আছে, কিন্তু কখন্ কোথায় চলে যায় সে তো বলা যায়না।

জীবানন্দ মুহূর্ত্তকাল বৃদ্ধের মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু সে জন্যে আপনাদের এত উদ্বেগ কেন?

উত্তরের জন্য তিনি জনার্দ্দনের প্রতি চাহিলেন; জনার্দ্দন সাহস পাইয়া কহিলেন, দলিলপত্র, মূল্যবান তৈজসাদি, দেবীর অলঙ্কার প্রভৃতি যা' কিছু আছে গ্রামের প্রাচীন ব্যক্তিরা সমস্তই জানেন। শিরোমণি মশায় বল্‌ছেন যে ষোড়শী থাক্‌তে থাক্‌তেই সেগুলো সব মিলিয়ে দেখ্‌লে ভাল হয়। হয়ত—

হয়ত নেই? এই না? কিন্তু না থাক্‌লেই বা আপনারা আদায় কর্‌বেন কি করে?

জনার্দ্দন সহসা জবাব খুঁজিয়া পাইলেননা, শেষে বলিলেন, তবু ত জানা যাবে হুজুর।

কিন্তু আজ আমার সময় নাই রায় মশায়।

জনার্দ্দন মনে মনে উল্লসিত হইয়া উঠিলেন, প্রায় এই প্রকার ফন্দি করিয়াই তাঁহারা আসিয়াছিলেন। শিরোমণি ব্যগ্র হইয়া কহিলেন, চাবিটা জনার্দ্দন ভায়ার হাতে দিলে আজই সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমরা সমস্ত মিলিয়ে দেখ্‌তে পারি। হুজুরেরও আর কোন দায়িত্ব থাকে না,—কি আছে না আছে সে পালাবার আগেই সব জানা যায়। কি বল ভায়া? কি বল হে তোমরা? ঠিক না?

সকলেই এ প্রস্তাবে সম্মতি দিল, দিলনা কেবল যাহার হাতে চাবি।

সে শুধু একটু ঈষৎ হাসিয়া কহিল, ব্যস্ত কি শিরোমণি মশায়, যদি কিছু নষ্ট হয়েই থাকে ত, ভিখিরির কাছ থেকে আর আদায় হবেনা। আপনারা আজ আসুন, আমার যেদিন অবসর হবে, মিলিয়ে দেখ্‌তে আপনাদের সকলকেই আমি সম্বাদ দেব।

ফন্দি খাটিলনা দেখিয়া সবাই মনে মনে রাগ করিল। রায় মহাশয় উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, কিন্তু দায়িত্ব একটা—

জীবানন্দ তৎক্ষণাৎ সায় দিয়া কহিলেন, সে তো ঠিক কথা রায় মশায়। দায়িত্ব একটা আমার রইল বই কি।

দ্বারের বাহির হইয়াই শিরোমণি জনার্দ্দনের গা টিপিয়া কহিলেন, দেখ্‌লে ভায়া, ব্যাটা মাতালের ভাব বোঝাই ভার। গুয়োটা কথা কয় যেন হেঁয়ালি! মদে চুর হয়ে আছে। বাঁচবেনা বেশি দিন।

জনার্দ্দন শুধু বলিলেন, হুঁ। যা ভয় করা গেল, তাই হল দেখ্‌ছি।

শিরোমণি কহিলেন, এবার গেল সব শুঁড়ির দোকানে। বেটি যাবার সময় আচ্ছা জব্দ করে গেল।

একজন কহিল, হুজুর চাবি আর দিচ্চেননা।

শিরোমণি উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, আবার? এবার চাইতে গেলে গলা টিপে মদ খাইয়ে দিয়ে তবে ছাড়বে। কথাটা উচ্চারণ করিয়াই তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

ঘরের মধ্যে জীবানন্দ খোলা দ্বারের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া স্থির হইয়া বসিয়া ছিল; প্রফুল্ল কহিল, দাদা, আবার একটা নূতন হাঙ্গামা জড়ালেন কেন, চাবিটা ওঁদের দিয়ে দিলেই ত হোতো।

জীবানন্দ তাহার মুখের প্রতি চক্ষু ফিরাইয়া কহিলেন, হোতো না

প্রফুল্ল, হলে দিতাম। পাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে বলেই সে কাল রাতে আমার হাতে চাবি দিয়েছে।

প্রফুল্ল মনে মনে বোধ হয় ঠিক বিশ্বাস করিতে পারিলনা, জিজ্ঞাসা করিল, সিন্দুকে আছে কি?

জীবানন্দ একটু হাসিয়া কহিল, কি আছে? আজ সকালে তাই আমি খাতাখানা পড়ে দেখ্‌ছিলাম। আছে মোহর, টাকা, হীরে, পান্না, মুক্তোর মালা, মুকুট, নানা রকম জড়োয়া গয়না, কত কি দলিল-পত্র, তাছাড়া সোনা-রূপোর বাসন-কোশনও কম নয়। কত কাল ধরে জমা হয়ে এই ছোট্ট চণ্ডীগড়ের ঠাকুরের যে এত সম্পত্তি সঞ্চিত আছে, আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। চুরি-ডাকাতির ভয়ে ভৈরবীরা বোধ করি কাউকে জান্‌তেও দিত না।

প্রফুল্ল সভয়ে কহিল, বলেন কি! তার চাবি আপনার কাছে? একমাত্র পুত্র সমর্পণ ডাইনির হাতে?

জীবানন্দ রাগ করিলনা, কহিল, নিতান্ত মিথ্যা বলনি ভায়া, এত টাকা দিয়ে আমি নিজেকেও বিশ্বাস করতে পারতামনা। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, অথচ, এ আমি চাইনি প্রফুল্ল। আমি যতই তাকে পীড়াপীড়ি কোরলাম জনার্দ্দন রায়কে দিতে, ততই সে অস্বীকার করে আমার হাতে গুঁজে দিলে।

প্রফুল্ল নিজেও ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এর কারণ?

জীবানন্দ কহিল, বোধ হয় সে ভেবেছিল, এ দুর্নামের ওপর আবার চুরির কলঙ্ক চাপ্‌লে তার আর সইবেনা। এদের সে চিনেছিল।

প্রফুল্ল বলিল, কিন্তু আপনাকে সে চিন্‌তে পারেনি।

জীবানন্দ হাসিল, কিন্তু সে হাসিতে আনন্দ ছিলনা; কহিল, সে

দোষ তার, আমার নয়। তার সম্বন্ধে অপরাধ আমার আর যত দিকেই থাক্, আমাকে চিন্‌তে না পারার অপরাধ গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত আমি একটা দিনের তরেও করিনি। কিন্তু আশ্চর্য্য এই পৃথিবী, এবং তার চেয়েও আশ্চর্য্য এর মানুষের মন। এ যে কি থেকে কি ঠিক্ করে নেয়, কিছুই বলবার যো নেই। এর যুক্তিটা কি জানো ভায়া, সেই যে তার হাত থেকে মর্‌ফিয়া নিয়ে চোখ বুজে খাওয়ার গল্পটা তোমার কাছে করেছিলাম, সেই হল তার সকল তর্কের শেষ তর্ক, সকল বিশ্বাসের বড় বিশ্বাস। কিন্তু, সে রাত্রে আর যে কোন উপায় ছিলনা, এদিকেও মরি, ওদিকেও মরি—সে ছাড়া আর কারও পানে চাইবার পথ ছিলনা,—এ সমস্ত ষোড়শী একদম ভুলে বসে আছে, শুধু একটি কথা তার মনে জেগে রয়েছে, যে নিজের প্রাণটা নিঃসংশয়ে তার হাতে দিতে পেরেছিল, তাকে আবার অবিশ্বাস করা যায় কি কোরে? ব্যস্, যা' কিছু ছিল, সমস্ত দিলে চোখ বুজে আমার হাতে তুলে। প্রফুল্ল, দুনিয়ায় ভয়ানক চালাক লোকেও মাঝে মাঝে মারাত্মক ভুল কোরে বসে, নইলে সংসার একেবারে মরুভূমি হয়ে দাঁড়াতো, কোথাও রসের বাষ্পটুকু জমবার ঠাঁই পেতনা।

প্রফুল্ল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, অতিশয় খাঁটি কথা দাদা। অতএব অবিলম্বে খাতাখানা পুড়িয়ে ফেলে তারাদাস ঠাকুরকে ডেকে ধমক্ দিন—জমানো মোহরগুলোয় যদি সলোমন সাহেবের দেনাটা শোধ যায় ত, শুধু রসের বাষ্প কেন, মুষলধারে বর্ষণ সুরু হতে পারবে।

জীবানন্দ কহিল, প্রফুল্ল, এই জন্যেই তোমাকে এত পছন্দ করি।

প্রফুল্ল হাত জোড় করিয়া বলিল, এই পছন্দটা এইবার একটু খাটো করতে হবে দাদা। রসের উৎস আপনার অফুরন্ত হোক্, কিন্তু মোসাহেবী কোরে এ অধীনের গলার চুঙ্গি পর্য্যন্ত কাঠ হয়ে গেল। এইবার একবার

বাইরে গিয়ে দুটো ডাল-ভাতের যোগাড় করতে হবে। কাল-পরশু আমি বিদায় নিলাম।

জীবানন্দ হাসিয়া কহিল, একেবারে নিলে? কিন্তু এইবার নিয়ে কবার নেওয়া হ'ল প্রফুল্ল?

বার চারেক। এই বলিয়া সে নিজেও হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, ভগবান মুখটা দিয়েছিলেন, তা' বড়লোকের প্রসাদ খেয়েই দিন গেল; দুটো বড় কথাও যদি না মাঝে মাঝে বার করতে পারি ত নিতান্তই এর জাত যায়। নেহাৎ অপরাধও নেই দাদা। বহুকাল ধরে আপনাদের জলকে কখনো উঁচু কখনো নীচু বলে বলে এ দেহটায় মেদ-মাংসই কেবল শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেচে, সত্যিকারের রক্ত বল্‌তে বোধ করি ছিটে ফোঁটাও আর বাকি নেই। আজ ভাব্‌ছি এক কাজ কোরব। সন্ধ্যার আবছায়ায় গা ঢাকা দিয়ে গিয়ে খপ্‌ কোরে ভৈরবী ঠাকরুণের এক খাম্‌চা পায়ের ধূলো নিয়ে গিলে ফেল্‌ব। আপনার অনেক ভাল-মন্দ দ্রব্যই ত আজ পর্য্যন্ত উদরস্থ করেচি, এ নইলে সেগুলো আর হজম হবেনা, পেটে লোহার মত ফুটবে।

জীবানন্দ হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, আজ উচ্ছ্বাসের কিছু বাড়াবাড়ি হচ্ছে প্রফুল্ল।

প্রফুল্ল পুনশ্চ হাত জোড় করিয়া কহিল, তা' হলে রসুন দাদা, এটা শেষ করি। মোসাহেবির পেন্সন বলে সেদিন যে উইলখানায় হাজার পাঁচেক টাকা লিখে রেখেচেন, সেটার ওপরে দয়া করে একটা কলমের আঁচড় দিয়ে রাখবেন,—চণ্ডীর টাকাটা হাতে এলে মোসাহেবের অভাব হবেনা, কিন্তু আমাকে দান করে অতগুলো টাকার আর দুর্গতি করবেননা।

জীবানন্দ কহিল, তা'হলে এবার আমাকে তুমি সত্যি-সত্যিই ছাড়লে?

প্রফুল্ল তেম্‌নি করযোড়ে কহিল, আশীর্ব্বাদ করুন এই সুমতিটুকু শেষ পর্য্যন্ত যেন বজায় থাকে।

জীবানন্দ মৌন হইয়া রহিল, প্রফুল্ল জিজ্ঞাসা করিল, কবে যাচ্চেন তিনি?

জানিনে।

কোথায় যাচ্চেন তিনি?

তাও জানিনে।

প্রফুল্ল কহিল, জেনেও কোন লাভ নেই দাদা। সহসা তাহার মুখের চেহারা বদ্‌লাইয়া গেল, কহিল, বাপ্‌ রে! মেয়েমানুষ ত' নয়, যেন পুরুষের বাবা। মন্দিরে দাঁড়িয়ে সে দিন অনেকক্ষণ চেয়েছিলাম, মনে হ'ল যেন পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত একেবারে পাথরে গড়া। ঘা মেরে মেরে গুঁড়ো করা যাবে, কিন্তু আগুনে গলিয়ে যে ইচ্ছেমত ছাঁচে ঢেলে গড়বেন, সেই বস্তুই নয়। পারেন ত' ও মতলবটা পরিত্যাগ করবেন।

জীবানন্দ কতকটা বিদ্রূপের ভঙ্গিতে প্রশ্ন করিল, তা'হলে প্রফুল্ল এবার নিতান্তই যাচ্চো?

প্রফুল্ল সবিনয়ে জবাব দিল, গুরুজনের আশীর্ব্বাদের জোর থাকে ত' মনস্কামনা সিদ্ধ হবে বই কি!

জীবানন্দ কহিল, তা' হতে পারে। কিন্তু কি করবে স্থির করেচ?

প্রফুল্ল বলিল, অভিলাষ ত' আপনার কাছে ব্যক্ত করেচি। প্রথমে চারটি ডাল-ভাতের যোগাড়ের চেষ্টা কোরব।

জীবানন্দ কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া প্রশ্ন করিল, ষোড়শী সত্যই চলে যাবে তোমার মনে হয়?

প্রফুল্ল কহিল, হয়। তার কারণ, সংসারে সবাই প্রফুল্ল নয়। ভাল

কথা দাদা, একটা খবর আপনাকে দিতে ভুলেছিলাম। কাল রাত্রে নদীর ধারে বেড়াচ্ছিলাম, হঠাৎ দেখি সেই ফকির সাহেব। আপনাকে যিনি একদিন তাঁর বটগাছে ঘুঘু শিকার করতে দেননি—বন্দুক কেড়ে নিয়েছিলেন—তিনি। কুর্ণিশ করে কুশল প্রশ্ন কোরলাম, ইচ্ছে ছিল মুখ-রোচক ছটো খোষামোদ টোষামোদ করে যদি একটা কোন ভাল রকমের ওষুধ-টুষুধ বার করে নিতে পারি ত আপনাকে ধরে পেটেণ্ট নিয়ে বেচে দু পয়সা রোজগার কোরব। কিন্তু ব্যাটা ভারি চালাক, সে দিক দিয়েই গেলনা। কথায় কথায় শুনলাম তাঁর ভৈরবী মাকে দেখ্‌তে এসেছিলেন, এখন চলে যাচ্চেন। ভৈরবী যে সমস্ত ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্চেন, তাঁর কাছেই শুন্‌তে পেলাম।

জীবানন্দ কৌতূহলী হইয়া উঠিল, কহিল, এঁর সদুপদেশেই বোধ করি তিনি চলে যাচ্চেন?

প্রফুল্ল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না। বরঞ্চ এঁর উপদেশের বিরুদ্ধেই তিনি চলে যাচ্চেন।

জীবানন্দ উপহাস করিয়া কহিল, বল কি প্রফুল্ল, ফকির সাহেব শুনি যে তাঁর গুরু। গুরু-আজ্ঞা লঙ্ঘন?

প্রফুল্ল কহিল, এ ক্ষেত্রে তাই বটে।

কিন্তু এত বড় বিরাগের হেতু?

প্রফুল্ল কহিল, বিরাগের হেতু আপনি। একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, কি জানি এ কথা আপনাকে শোনানো ভাল হবে কি না, কিন্তু ফকিরের বিশ্বাস, আপনাকে তিনি মনে মনে অত্যন্ত ভয় করেন,—পাছে কলহ বিবাদের মধ্য দিয়েও আপনার সঙ্গে মাথামাখি হয়ে যায়, এই তাঁর সকলের চেয়ে বড় ভয়। নইলে দেশের লোককে তিনি ভয় করেননি।

জীবানন্দ বিস্ফারিত চক্ষে তাহার প্রতি নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল। প্রফুল্ল একটুখানি হাসিয়া কহিল, দাদা, ভগবান আপনাকেও বুদ্ধি বড় কম দেননি, কিন্তু সর্ব্বস্ব সমর্পণ করে কাল তিনিই মারাত্মক ভুল করলেন, কি হাত পেতে নিয়ে আপনিই মারাত্মক ভুল করলেন, সে মীমাংসা আজ বাকি রয়ে গেল, যদি বেঁচে থাকি ত একদিন দেখ্‌তে পাবো আশা হয়।

জীবানন্দ এ কথারও কোনও উত্তর দিলনা, তেমনি নীরবে বসিয়া রহিল।

সন্ধ্যা হয় হয়, বেহারা পাত্র ভরিয়া মদ আনিয়া উপস্থিত করিল, জীবানন্দ হাত নাড়িয়া কহিল, নিয়ে যা,—দরকার নেই।

ভৃত্য বুঝিতে না পারিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলে প্রফুল্ল কহিল, কখন্ দরকার সেইটে বলে দিন্ না।

জীবানন্দ সহসা কখন্ যেন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল, প্রফুল্লর প্রশ্নে চোখ তুলিয়া কহিল, এখন ত' নিয়ে যা,—দরকার হলে ডেকে পাঠাবো। সে চলিয়া যাইতেছিল, জীবানন্দ ডাকিয়া কহিল, হাঁ রে, তোদের চা আছে?

প্রফুল্ল কহিল, শোন কথা। চা নেই ত আমি বেঁচে আছি কি কোরে?

তবে, তাই এক বাটি নিয়ে আয়।

বেহারা প্রস্থান করিলে প্রফুল্ল প্রশ্ন করিল, অকস্মাৎ অমৃতে অরুচি যে?

জীবানন্দ বলিল, অরুচি নয়,—কিন্তু আর খাবোনা।

প্রফুল্ল হাসিল। এবং ক্ষণেক পূর্ব্বে তাহারই প্রতি প্রযুক্ত বিদ্রূপ ফিরাইয়া দিয়া কহিল, এই নিয়ে ক'বার হল দাদা?

জীবানন্দ রাগ করিলনা, সেও হাসিয়া তাহারই অনুকরণ করিয়া কহিল, এ মীমাংসাটাও আজ না হয় বাকি থাক্ প্রফুল্ল, যদি বেঁচে থাকো ত একদিন দেখ্‌তে পাবে আশা করি।

প্রফুল্ল মুখ টিপিয়া শুধু একটু হাসিল, প্রত্যুত্তর করিলনা।

চাকর আলো দিয়া গেল। ক্রমশঃ সন্ধ্যার অন্ধকার যখন বাহিরে গাঢ় হইয়া আসিতেছিল, জীবানন্দ হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, যাই একটু ঘুরে আসি—

প্রফুল্ল আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, কই কাপড় ছাড়লেন না?

থাক্ গে।

আপনার সহচর? গাদা পিস্তলটি?

সেও থাক্। আজ একলাই ঘুরতে চোল্‌লাম।

প্রফুল্ল ভয়ানক আপত্তি করিয়া বলিল, না না, সে হয়না দাদা। অন্ধকার রাত, পথে ঘাটে আপনার অনেক শত্রু। এই বলিয়া সে তাড়াতাড়ি দেরাজ হইতে পিস্তল বাহির করিয়া হাতে গুঁজিয়া দিতে গেল।

জীবানন্দ দুই পা পিছাইয়া গিয়া কহিল, ওকে আর আমি ছুঁচিনে প্রফুল্ল—

প্রফুল্ল বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া কহিল, হঠাৎ হ'ল কি দাদা? না হয় পাইকদের ডেকে দিই, তাদের কেউ সঙ্গে যাক্।

জীবানন্দ মাথা নাড়িয়া কহিল, না তাও না। আজ থেকে আমি এম্‌নি একলা বার হব, যেন কোথাও কোন শত্রু নেই আমার। আমার থেকেও কারও কোন না ভয় হোক্;—তারপরে যা হয় তা আমার ঘটুক,—আমি কারও কাছে নালিশ কোরবনা। এই বলিয়া সে অন্ধকারে ধীরে ধীরে একাকী বাহির হইয়া গেল।

পরিপূর্ণ সুরাপাত্র অসম্মানে ফিরিয়া গেল দেখিয়া প্রফুল্ল ব্যঙ্গ করিয়াছে। করিবারই কথা। লিভারের দুঃসহ যাতনায় ও চিকিৎসকের তাড়নায় শয্যাগত-জীবানন্দর জীবনে এ অভিনয় আরও হইয়া গেছে; কিন্তু স্বেচ্ছায়, সুস্থদেহে মদের বদলে চা খাইয়া বাটীর বাহির হওয়া খুব সম্ভব এই প্রথম। সমস্ত জগৎটা তাহার বিস্বাদ ঠেকিল, এবং শান্তিকুঞ্জের ঘন ছায়ায় ঘেরা পথের মধ্যে যে দিকে চাহিল, সেই দিক হইতেই একটা অস্ফুট কান্নার সুর আসিয়া যেন তাহার কানে বাজিতে লাগিল। তাহার অভ্যস্ত জীবনের নিচে তাহারই যে আরও একটা সত্যকার জীবন আজও বাঁচিয়া আছে এ খবর সে জানিতনা। গেট পার হইয়া যখন মাঠের পথে বাহির হইয়া আসিল, তখন সন্ধ্যার ধূসর আকাশ ধীরে ধীরে রাত্রির অন্ধকারে পরিণত হইতেছিল; একদিকে শীর্ণ নদীর বালুময় শুষ্ক সৈকত আঁকিয়া বাঁকিয়া দিগন্তে অদৃশ্য হইয়াছে, আর একদিকে বৈশাখের শস্যশস্যহীন বিস্তৃত ক্ষেত্র চণ্ডীগড়ের পদমূলে গিয়া মিশিয়াছে। পথে পথিক নাই, মাঠে কৃষকদের আর দেখা যায়না, রাখাল বালকেরা গোচারণের কাজ আজিকার মত শেষ করিয়া গৃহে ফিরিয়া গেছে,—সান্ধ্য আকাশ-তলে জনহীন ভূখণ্ডের এই স্তব্ধ বিষণ্ণ মূর্ত্তি আজ তাহার কাছে অত্যন্ত করুণ ও অদ্ভুত মনে হইল। এই পথে, এমনি নির্জ্জন সন্ধ্যায় সে আরও কতবার যাতায়াত করিয়াছে; কিন্তু এতদিন ধরিত্রী যেন এই তাঁহার শান্ত দুঃখের ছবিখানি মাতালের রক্তচক্ষু হইতে একান্ত সঙ্কোচে গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। ওপারের রৌদ্র দগ্ধ প্রান্তর বহিয়া উষ্ণ বায়ু আসিয়া

মাঝে মাঝে তাহার গায়ে লাগিতেছিল ;—কিছুই নূতন নয়,—কিন্তু সেই দিকে চাহিয়া অকস্মাৎ রুদ্ধ অভিমানের কান্নায় যেন আজ তাহার বুক ভরিয়া উঠিল। মনে মনে বলিতে লাগিল, মা পৃথিবী, তোমার দুঃখের তপ্ত নিঃশ্বাসটুকুও কি লজ্জায় এতদিন চেপে রেখেছিলে, পাষণ্ড বলে জান্‌তে দাওনি? সংসারে আপনার বল্‌তে আমার কেউ নেই, নিজের ছাড়া কারও সুখ দুঃখের কখনো ভাগ পাইনি,—সেও কি মা, আমার দোষ? আজ আছি, কাল যদি না থাকি, দুনিয়ায় কারও ক্ষতিবৃদ্ধি নেই, এ কথা কি তুমিই কোনদিন ভেবেচ মা?

এ অভিযোগ যে সে কাহার কাছে করিল, মা বলিয়া যে সে বিশেষ কাহাকে লক্ষ্য করিয়া ডাকিল, বোধ হয় সে নিজেই ঠিক মত উপলব্ধি করে নাই; তথাপি গিরি-গাত্র-স্খলিত উপলখণ্ড সকল যেমন নির্ঝরের পথ ধরিয়া আপনার ভারবেগে আপনিই গড়াইয়া চলে, তেমনি করিয়াই তাহার সদ্য উৎসারিত আকস্মিক বেদনার অনুভূতি চোখের জলের পথ ধরিয়া কথার মালা গাঁথিয়া গাঁথিয়া নিরন্তর বহিয়া চলিতে লাগিল। মাঠের জল নিকাশের জন্য চাষারা একবার এই পথের উপর দিয়া নালা কাটিয়া দিয়াছিল। নন্দী মহাশয়ের আদেশ অর্জ্জন করিবার মত প্রচুর দক্ষিণা যখন তাহারা কোন-মতেই সংগ্রহ করিতে পারে নাই, তখনই শুধু সর্ব্বনাশ হইতে আত্মরক্ষা করিতে এই কাজ করিয়াছিল; কিন্তু দরিদ্রের এই দুঃসহ স্পর্দ্ধা এককড়ি হুজুরের গোচর করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, নিরুপায়ের অশ্রুজলে ভ্রূক্ষেপ মাত্র করেন নাই। স্থানটা তখন পর্য্যন্ত অসমতল অবস্থাতেই ছিল। দরিদ্র-পীড়নের এই উৎকট চিহ্ন এই পথে কতবারই ত তাহার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, কিন্তু আজ ইহাই চোখে পড়িয়া দুই চোখ অশ্রুপ্লাবিত হইয়া উঠিল। মনে মনে কহিল, আহা! কত

ক্ষতিই না জানি হয়েছে। কত ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে হয়ত পেটভরে দুবেলা খেতেও পাবেনা। কেনই বা মানুষে এ সব করে? যায়গাটা অন্ধকারেই ক্ষণকাল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কহিল, হাতে টাকা থাক্‌লে কালই মিস্ত্রী লাগিয়ে এটা বাঁধিয়ে দিতাম, প্রতি বৎসর এ নিয়ে আঁর তাদের দুঃখ পেতে হোতোনা। আচ্ছা, কত টাকা লাগে?" সে পথ ছাড়িয়া মাঠে নামিয়া গেল, এবং সমস্তটা মন দিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিল। এ সম্বন্ধে কোন ধারণাই তাহার ছিলনা, কত ইট, কত চুণ-বালি, কত কাঠ কি-কি আবশ্যক কিছুই সে জানিতনা, কিন্তু কথাটা তাহাকে যেন পাইয়া বসিল। সেইখানে ভূতের মত অন্ধকারে একাকী দাঁড়াইয়া সে কেবলই মনে মনে হিসাব করিতে লাগিল এই ব্যয় তাহার সাধ্যাতীত কিনা! পথের ওধার দিয়া কি একটা ছুটিয়া গেল। হয়ত, কুকুর কিম্বা শিয়াল হইবে, কিন্তু তাহার চমক্ ভাঙ্গিল। পরের জন্য দুঃখ বোধ করা এমনই অভ্যাস-বিরুদ্ধ যে, চমক্ ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই ইহার সমস্ত তামাসাটা এক মুহূর্ত্তে ধরা পড়িয়া তাহার ভারি হাসি পাইল। তাড়াতাড়ি রাস্তায় উঠিয়া আসিয়া শুধু বলিল বাঃ! বেশ ত কাণ্ড! কেউ যদি দেখে ত কি ভাবে? জীবানন্দ আজ মদ না খাইয়াই বাহির হইয়াছিল, তাহার আজিকার এই মনের দুর্ব্বলতার হেতু সে বুঝিল, অবসাদগ্রস্ত চিত্তের মাঝে কেন যে আজ অকারণে কেবল কান্নার সুরই বাজিয়া বাজিয়া উঠিতেছে ইহারও কারণ বুঝিতে তাহার বিলম্ব ঘটিলনা। আরও একটা জিনিস নিজের সম্বন্ধে আজ তাহার প্রথম সন্দেহ হইল যে দীর্ঘদিনের অভ্যাস আজ তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘেরিয়া একেবারে স্বভাবে রূপান্তরিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আপনাকে আপন বলিয়া দাবী করিবার দাবী হয়ত তাহার চিরদিনের মত হাতের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। কিসের জন্য বাটীর বাহির হইয়াছিল ঠিক স্মরণ করিতে পারিলনা, ঝোঁকের

মাথায় জোর করিয়া যখন ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়াছিল, তখন স্থির সঙ্কল্প হয়ত কিছু ছিলনা, হয়ত, অগোচরে অস্পষ্টরূপে অনেক কথাই ছিল,— যাহা এখন একেবারে লেপিয়া একাকার হইয়া গেল। গৃহত্যাগের কোন উদ্দেশ্যই মনে পড়িলনা। কিন্তু গৃহে ফিরিতেও ইচ্ছা করিলনা। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া রাস্তা ছাড়িয়া পায়ে হাঁটা যে পথটা মাঠের উপর দিয়া কোনাকুনি চণ্ডীগড়ের দাক্ষিণ ঘুরিয়া গিয়াছে অন্ধকারে সেই পথেই সে পা বাড়াইল। পথটা দীর্ঘ এবং বন্ধুর, প্রতি পদক্ষেপেই বাধা পাইতে লাগিল, কিন্তু ধাক্কা খাইয়া, হোঁচট খাইয়া পথ চলিতে চলিতে বিক্ষিপ্ত চিত্ততল তাহার কখন যে ইঁট ও কাঠ ও চুন এবং সুরকির চিন্তায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, সে জানিতেও পারিলনা। জিনিসটা কিছুই নয়, ছোট একটা সাঁকো, বীজগ্রামের জমিদারের কাছে তাহার চেয়ে তুচ্ছ বস্তু আরত কিছু হইতেই পারেনা। সেটা তৈরী করার মধ্যে না আছে শিল্প, না আছে সৌন্দর্য্য; তবুও এই শিল্পসৌন্দর্য্যহীন সামান্য বস্তুটাই যেন কত দুঃখীর সুখ দুঃখের সঙ্গে মিশিয়া তাহার মনের মধ্যে আজ এক নূতন রসে ভরিয়া অসামান্য হইয়া দেখা দিল। তাহাকে কতপ্রকারে ভাঙিয়া কত রকমে গড়িয়া সে যেন আর শেষ হইতেই চাহিলনা। অথচ, এ সকল যে শুধু তাহার অবসন্ন মনের ক্ষণস্থায়ী খেয়াল, সত্য বস্তু নয়, কাল দিনের বেলা ইহার চিহ্নমাত্র রহিবেনা, এ কথাও সে বিস্মৃত হইলনা,—উৎসবের মাঝে গোপন শোকের মত কোথায় যেন বিঁধিয়াই রহিল। অথচ, আজ রাত্রির মত এই ছেলেমানুষিটাকে সে কোন মতেই ছাড়িতে পারিলনা, প্রশ্রয় দিয়া দিয়া কল্পনার পরে কল্পনা যোজন করিয়া অবিশ্রাম চলিতে লাগিল। সহসা কালো আকাশপটে চণ্ডী মন্দিরের চূড়া দেখা দিল। এতদূরে আসিয়াছে তাহার হুঁস ছিলনা; আরও কাছে আসিয়া মন্দিরের ছোট দরজাটা তখনও

খোলা আছে দেখিতে পাইয়া নিঃশব্দে ভিতরে প্রবেশ করিল। দেবীর আরতি অনেকক্ষণ শেষ হইয়া গেছে, মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ, সমস্ত প্রাঙ্গণে ঘোর অন্ধকার, শুধু নাটমন্দিরের একধারে মিট মিট করিয়া একটা প্রদীপ জ্বলিতেছে। জীবানন্দ নিকটে গিয়া দেখিল জন চার পাঁচ লোক মশার ভয়ে আগাগোড়া মুড়ি দিয়া ঘুমাইতেছে, শুধু কে একজন থামের আড়ালে চুপ করিয়া বসিয়া মালা জপ করিতেছে। জীবানন্দ আরও একটু কাছে গিয়া লোকটিকে দেখিবার চেষ্টা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে তুমি?

লোকটি জীবানন্দর ধপ্‌ধপে শাদা পরিচ্ছদ অন্ধকারেও অনুভব করিয়া তাঁহাকে ভদ্র ব্যক্তি বলিয়া বুঝিল, কহিল, আমি একজন যাত্রী বাবু।

ওঃ—যাত্রী! কোথায় যাবে?

আজ্ঞে, আমি যাবো শ্রীশ্রী পুরীধামে।

কোথা থেকে আস্‌চো? এরা বুঝি সব তোমার সঙ্গী? এই বলিয়া জীবানন্দ ঘুমন্ত লোকগুলিকে দেখাইয়া দিল।

লোকটি ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আজ্ঞে না, আমি একাই আস্‌চি মানভূম জেলা থেকে। এদের কারও বাড়ী মেদিনীপুর, কারও বাড়ী আর কোথাও, —কোথায় যাবে, তাও জানিনে। দু'জন ত কেবল আজ দুপুর বেলাতে এসেছে;

জীবানন্দ জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, কত লোক এখানে রোজ আসে? যারা থাকে তারা দু'বেলা খেতে পায়, না?

লোকটা বিব্রত হইয়া পড়িল। লজ্জিতভাবে কহিল, কেবল খাবার জন্যেই সবাই থাকেনা বাবু। পায়ে হাঁটা আমার অভ্যাস ছিলনা, তাই ফেটে গিয়ে ঘায়ের মত হল। মা ভৈরবী নিজের চোখে দেখে হুকুম দিলেন যতদিন না সারে এখানে থাকো।

জীবানন্দ কহিল, বেশ ত থাকোনা। যায়গার ত আর অভাব নেই হে।

কিন্তু মা ভৈরবী ত আর নেই শুনতে পেলাম।

জীবানন্দ হাসিয়া কহিল, এরই মধ্যে শুনতে পেয়েচ? তা' না-ই তিনি থাকলেন, তাঁর হুকুম ত আছে। তোমাকে যেতে বলে সাধ্য কার? তোমার যতদিন না পা-সারে, তুমি থাকো। এই বলিয়া জীবানন্দ তাহার কাছে আসিয়া বসিল। লোকটা প্রথমে একটু ভয় ও সঙ্কোচ অনুভব করিল, কিন্তু সে ভাব রহিলনা। এবং দেখিতে দেখিতে অন্ধকারে এই নির্জ্জন নিস্তব্ধ দেবায়তনের একান্তে পরাক্রান্ত এক ভূস্বামী ও দীন গৃহহীন আর এক ভিক্ষুকের সুখ দুঃখের আলোচনা একেবারে ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল। লোকটির নাম উমাচরণ, জাতিতে কৈবর্ত্ত, বাটী আগে ছিল মানভূম জেলার বংশীতট গ্রামে। গ্রামে অন্ন নাই, জল নাই, চিকিৎসক নাই,—এ যাঁহার ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি, তিনি পশ্চিমের কোন্ এক সহরে ওকালতী করেন। রাজায় প্রজায় প্রীতি নাই, সম্বন্ধ নাই, আছে শুধু শোষণ করিবার বংশগত অধিকার। এই ফাল্গুনের শেষে বিসূচিকা রোগে তাহার স্ত্রী মরিয়াছে, উপর্যুক্ত দুই পুত্র একে একে চোখের উপর বিনা চিকিৎসায় প্রাণত্যাগ করিয়াছে, সে কোন উপায় করিতে পারে নাই; অবশেষে জীর্ণ ঘরখানি সে তাহার এক বিধবা ভ্রাতুষ্কন্যাকে দান করিয়া চিরদিনের মত গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছে। এ জীবনে আর তাহার ফিরিবার আশা নাই, ইচ্ছা নাই,—এই বলিয়া সে ছেলেমানুষের মত হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। জীবানন্দর চোখ দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। পরের কান্না তাহার কাছে নূতন বস্তু নয়; এ সে জীবনে অনেক দেখিয়াছে, কিন্তু কোন দিন এতটুকু দাগ পর্য্যন্ত ফেলিতে পারে নাই, আজও সে ছাড়া আর কেহ জানিতেও পারিলনা, কিন্তু অন্ধকারে জামার খুঁট দিয়া মুছিতে

মুছিতে তাহারা ইচ্ছা করিতে লাগিল কোথাও ছুটিয়া গিয়া যে স্ত্রী তাহার মরে নাই, যে ছেলে তাহার জন্মে নাই, যে গৃহ তাহাকে ত্যাগ করিয়া আসিতে হয় নাই, তাহাদেরই জন্য এই অপরিচিত লোকটার মতই ডাক ছাড়িয়া কাঁদে। খানিকপরে সে কতকটা আত্ম সম্বরণ করিয়া কহিল, বাবু, আমার মত দুঃখী আর সংসারে নেই।

জীবানন্দ কহিল, ওরে ভাই, সংসারটা ঢের বড় যায়গা, এর কোথায় কে কি ভাবে আছে বল্‌বার যো নেই।

ইহার তাৎপর্য্য সম্যক্ উপলব্ধি করিবার মত শিক্ষা বা শক্তি এই সামান্য লোকটার ছিলনা, জীবানন্দ নিজেও তাহা আশা করিলনা, কিন্তু থামিতেও পারিলনা। তাহার অশ্রুসিক্ত কণ্ঠস্বরের অপূর্ব্বতা তাহার কানে কানে এমন অমৃত সিঞ্চন করিল যে সে লোভ সে সাম্‌লাইতে পারিলনা। বলিতে লাগিল, দুঃখীদেরও কোন আলাদা জাত নেই দাদা, দুঃখেরও কোন বাঁধানো রাস্তা নাই। তা'হলে সবাই তাকে এড়িয়ে চল্‌তে পারত। হুড়মুড় করে যখন ঘাড়ে এসে পড়ে তখনই মানুষে তাকে টের পায়। কিন্তু কোন্ পথে যে তার আনাগোনা আজও কেউ তার খোঁজ পেলেনা। আমার সব কথা তুমি বুঝবেনা ভাই, কিন্তু সংসারে তুমি একলা নও,—অন্ততঃ একজন সাথী তোমার বড় কাছেই আছে, তাকে তুমি চিন্‌তে পারোনি।

লোকটি চুপ করিয়া রহিল। কথাও বুঝিলনা, সাথী যে কে আছে তাহাও জানিলনা। জীবানন্দ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, তুমি মায়ের নাম করছিলে ভাই, আমি বাধা দিলাম। আবার সুরু কর, আমি চোল্‌লাম। কাল এম্‌নি সময়ে হয়ত আবার দেখা হবে।

লোকটি কহিল, আর ত দেখা হবেনা বাবু, আমি পাঁচ দিন আছি, কাল সকালেই আমাকে চলে যেতে হবে।

চলে যেতে হবে? কিন্তু এই যে বল্‌লে তোমার পা সারেনি, তুমি হাঁটতে পারোনা?

সে কহিল, মায়ের মন্দির এখন রাজা বাবুর। হুজুরের হুকুম তিন দিনের বেশি আর কেউ থাকতে পাবেনা।

জীবানন্দ হাসিয়া কহিল, ভৈরবী এখনও যায়নি, এরই মধ্যে হুজুরের হুকুম জারি হয়ে গেছে! মা চণ্ডীর কপাল ভাল! এই বলিয়া হঠাৎ তাহার একটা কথা মনে পড়িয়া ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, আজ অতিথিদের সেবা হ'ল কি রকম? কি খেলে ভাই?

সে কহিল, যারা তিনদিন আসেনি তারা মায়ের প্রসাদ সবাই পেলে।

আর তুমি? তোমার ত তিনদিনের বেশি হয়ে গেছে?

লোকটি ভালমানুষ, সহসা কাহারও নিন্দা করা স্বভাব নয়, বলিল, ঠাকুর মশাই কি কোরবেন, রাজাবাবুর হুকুম নেই কি না?

তাই হবে! বলিয়া জীবানন্দ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিল। খুব সম্ভব অনাহুত যাত্রীদের সম্বন্ধে পূর্ব্বে হইতেই এম্‌নি একটা নিয়ম ছিল, কিন্তু ষোড়শী তাহা মানিয়া চলিতে পারিতনা। এখন তারাদাস এবং এক-কড়ি নন্দী উভয়ে মিলিয়া জমিদারের নাম করিয়া সে ব্যবস্থা অক্ষরে অক্ষরে প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। এই যদি হয়, অভিযোগ করিবার খুব বেশি হেতু নাই, কিন্তু মন তাহার কোন মতেই এ কথা স্বীকার করিতে চাহিলনা। অন্তর হইতে সে বার বার করিয়া কহিতে লাগিল, এমন হইতেই পারেনা! এমন হইতেই পারেনা! বুভুক্ষুকে আহার দিবার আবার বিধিব্যবস্থা কি! ওই যে ক্ষুধার্ত্ত অতিথি ওইখানে অনাহারে বসিয়া রহিল, ক্ষুধাকে তাহার বাঁধিয়া রাখিবে ইহারা কোন্ আইন-কানুনে? কহিল, ওহে ভাই, কাল আবার আমি আস্‌বো, কিন্তু চুপি চুপি চলে যেতে পাবেনা, তা' বলে যাচ্ছি।

কিন্তু ঠাকুরমশাই যদি কিছু বলে ?

জীবানন্দ কহিল, বল্‌লেই বা। এত দুঃখ সইতে পারলে আর বামুনের একটা কথা সইতে পারবেনা ? ধীরে ধীরে বাহির হইয়া যাইতেছিল, হঠাৎ মন্দিরের বারান্দায় থামের আড়ালে মানুষের চাপা গলা শুনিয়া বিস্মিত হইল। প্রথমে মনে করিল, নিভৃতে কেহ আরাধনা করিতে আসিয়াছে, কিন্তু কথাটা তাহার কানে গেল। কে একজন বলিতেছে, আমাদের মায়ের সর্ব্বনাশ যে করেছে তার সর্ব্বনাশ না করে আমরা কিছুতে ছাড়বনা বলে দিচ্চি।

অন্য জন জবাব দিল, মায়ের চৌকাট ছুঁয়ে দিব্যি কোরলাম খুড়ো,— ফাঁসি যেতে হয়, তাও যাবো।

আর একজন বলিল, হঃ—আমাদের আবার জেল ! আমাদের আবার ফাঁসি ! মা চলে যেতে চাচ্চে, আগে যাক্—

অন্ধকারে না চিনিল মানুষ, না চিনিল গলা, তবুও মনে হইল একজনের গভীর কণ্ঠস্বর সে কোথায় যেন শুনিয়াছে, একেবারে অপরিচিত নয়। চেষ্টা করিলে হয় ত মনে করিতেও পারিত, কিন্তু আজ তাহার সে দিকে মনই গেলনা। সে তো অনেকের অনেক সর্ব্বনাশ করিয়াছে,—অতএব, নিজেই ত সে ইহার লক্ষ্য হইতে পারে, কিন্তু আজ তাহা নির্ণয় করিবার ইচ্ছাই হইলনা। মনে মনে হাসিয়া কহিল, বাস্তবিক, ঠাকুর দেবতার মত এমন সহৃদয় শ্রোতা আর নেই। হোকনা মিথ্যা দম্ভ, তবু তার দাম আছে। দুর্ব্বলের ব্যর্থ পৌরুষ তবু একটু গৌরবের স্বাদ পায়। আহা !

অলক্ষ্যে, নিঃশব্দে যখন বাহির হইয়া আসিল তখন রাত্রি বোধ হয় দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। নির্ম্মল, কালো আকাশ তারায় তারায় ঠাসা। সেই অসংখ্য নক্ষত্রলোক হইতে ঝরিয়া অদৃশ্য আলোকের আঁভাস অন্ধকার পথের মাটিকে ধূসর করিয়া দিয়াছে। তাহারই মাঝে মাঝে ইত-

স্ততঃ বিক্ষিপ্ত কঠিন মাটির স্তূপ পথশ্রান্ত পথিকের মত কতকাল ধরিয়া যে নিঃশব্দে বসিয়া আছে তাহার ইতিহাস নাই, তাহারই একটির পাশে গিয়া সে ঠিক তেম্নি করিয়াই ধূলার উপর বসিয়া পড়িল। সুমুখের কতকটা পতিত জমির একধারে ষোড়শীর কুটীর, গাছের আড়ালে বেশ স্পষ্ট দেখা না গেলেও তাহার মনে হইল অনেকগুলি মানুষ যেন সার বাঁধিয়া বাহির হইয়া আসিল, এবং অনতিদূর দিয়া যখন চলিয়া গেল, তখন ইহাদেরই কথাবার্ত্তা হইতে জীবানন্দ এইটুকু সংগ্রহ করিল যে ষোড়শীর গো-যান আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে এবং কাল প্রত্যুষেই সে চণ্ডীগড় ত্যাগ করিয়া যাইবে। ভক্ত প্রজার দল তাহার পদধূলি লইয়া ঘরে ফিরিতেছে। ষোড়শীকে নিষেধ করিবার পথ নাই, নিষেধ করিলে সে শুনিবেনা, এই কয়দিনে এতটুকু তাহাকে সে চিনিয়াছে,—কিন্তু, মন তাহার ব্যথায় ভরিয়া উঠিল। সজ্ঞানে ও অজ্ঞানে ইহার বিরুদ্ধে যত অন্যায় করিয়াছে, একটি একটি করিয়া এতকাল পরে তাহার তালিকা করা অসম্ভব, কিন্তু সেই সকল অগণিত অত্যাচারের সমষ্টি আজ তাহার চোখের উপর স্তূপাকার হইয়া উঠিল। ইহাকে সরাইয়া রাখিবার স্থান সংসারে সে কোথাও দেখিলনা। স্ত্রী বলিয়া স্বীকার করিতে যাহাকে সে লজ্জা বোধ করিয়াছে, গণিকা বলিয়া তাহাকেই কামনা করিবার শয়তানী সে যে কোথায় পাইয়াছিল ভাবিয়া পাইলনা। আজ সমস্ত হৃদয় তাহার ষোড়শীকে একান্ত মনে চাহিতেছে, এ তাহার অধিকারের দাবী, অথচ, চিরদিন ইহাকেই উপেক্ষা করিয়া, অপমান করিয়া, মিথ্যার পরে মিথ্যা জমা করিয়া সে যে প্রাচীর গড়িয়া তুলিয়াছে, আজ তাহাকে লঙ্ঘন করিবার পথ তাহার কই ?

হঠাৎ সম্মুখেই দেখিতে পাইল কে একজন দ্রুতপদে চলিয়াছে। তাহাকে অন্ধকারে চিনিতেও বিলম্ব হইলনা, ডাকিল, অলকা ?

ষোড়শী চমকিয়া দাঁড়াইল। এ যে জীবানন্দ তাহা সে ডাক শুনিয়াই বুঝিয়াছিল। একটু সরিয়া আসিয়া তিক্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি এখানে কেন?

জীবানন্দ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, কি জানি, এম্‌নিই বসে ছিলাম। তুমি যাত্রার আগে ঠাকুর প্রণাম করতে যাচ্চো, না? চল, আমি তোমার সঙ্গে যাই।

এই একটা বেলার মধ্যে তাহার কণ্ঠস্বরে কি যে অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, ষোড়শী বিস্ময়ে মৌন হইয়া রহিল। ক্ষণেক পরে কহিল, আমার সঙ্গে যাবার বিপদ আছে, সে তো আপনি জানেন?

জীবানন্দ বলিল, জানি। কিন্তু, আমার পক্ষ থেকে একেবারে নেই। আজ আমি একা এবং সম্পূর্ণ নিরস্ত্র,—একগাছা লাঠিও সঙ্গে নেই।

ষোড়শী কহিল, শুনেচি। প্রফুল্লবাবু আপনাকে খুঁজতে বেরিয়েছিলেন, তাঁর কাছেই খবর পেলাম আজ আপনি নিরস্ত্র বাড়ী থেকে একলা বেরিয়ে গেছেন, এবং—

এবং, ঝোঁকের উপর মদ না খেয়ে বার হয়ে গেছি, না?

ষোড়শী কহিল, হাঁ। কিন্তু চণ্ডীগড়ে এ কাজ আর আপনি ভবিষ্যতে করবেননা।

জীবানন্দ কহিল, এ কাজ আমি প্রত্যহ কোরব, এবং যতদিন বাঁচবো,—কোরব। প্রফুল্ল তোমাকে এত কথা বলেছে, এ কথা বলে নি যে এ জীবনে আর যাই কেন না স্বীকার করি পৃথিবীতে আমার শত্রু আছে এ আমি একদিনও আর স্বীকার কোরবনা?

ষোড়শী স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ইহার যুক্তি লইয়াও তর্ক করিলনা, এ কথার স্থায়িত্ব লইয়াও প্রশ্ন করিলনা। জীবানন্দর মুখের

চেহারা অন্ধকারে সে দেখিতে পাইলনা, কিন্তু এই তাহার অদ্ভুত কণ্ঠস্বর নিশীথে এই নির্জ্জন প্রান্তরের মধ্যে তাহার দুই কান ভরিয়া এক আশ্চর্য্য সুরে বাজিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে কহিল, আমার সঙ্গে মন্দিরে গিয়ে আপনার কি হবে?

জীবানন্দ কহিল, কিছুই না। শুধু যতক্ষণ আছো, সঙ্গে থাক্‌বো, তারপরে যখন যাবার সময় হবে তোমাকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে আমি বাড়ী চলে যাবো।

ষোড়শী তৎক্ষণাৎ জবাব দিতে পারিলনা। জীবানন্দ কহিল, যাবার দিনে আজ আর আমাকে তুমি অবিশ্বাস কোরোনা অলকা। আমার জীবনের দাম তুমি ত জানো, আর হয়ত দেখাও হবেনা। আমাকে যে তুমি কত রকমে দয়া করে গেছ, আমার শেষ দিন পর্য্যন্ত আমি সেই সব কথাই স্মরণ কোরব।

ষোড়শী কহিল, আচ্ছা,আসুন,—এই বলিয়া সে অগ্রসর হইল। মিনিট দুই নিঃশব্দে চলার পরে জীবানন্দ কহিল, লোকে বলে,ও দয়ার যোগ্য নয়। আচ্ছা অলকা, দয়ার আবার যোগ্যতা অযোগ্যতা কি? দয়া যে করে সে তো নিজের গরজেই করে। নইলে, দয়া পাবার যোগ্যতা আমার ছিল এত-বড় দোষারোপ করতে ত শুধু অতিবড় শত্রু নয়, তুমি পর্য্যন্ত পারবেনা।

ষোড়শী মৃদুস্বরে বলিল, আমার চেয়ে আপনার বড় শত্রু সংসারে বুঝি আর কেউ নেই?

জীবানন্দ বলিল, না।

মন্দিরে প্রবেশ করার পরে জীবানন্দ হঠাৎ বলিয়া উঠিল, মজা দেখ অলকা, যাদের নিজের অন্ন নেই, সংসারে তারাই অপরের অন্নে সব চেয়ে বড় বাধা। ষোড়শী জিজ্ঞাসু মুখে ফিরিয়া চাহিতে কহিল,আজ আমি এত-

ক্ষণ পর্য্যন্ত এই মন্দিরেই বসে ছিলাম। ভৈরবী নেই এখন জমিদার কর্ত্তা। হুজুরের নাম করে তাই এরই মধ্যে যাত্রীদের উপর তেরাত্রির আইন জারি হয়ে গেছে। তোমার সেই যে খোঁড়া অতিথিটি, পা না সারা পর্য্যন্ত যাকে তুমি থাকতে অনুমতি দিয়েছ, তার মুখেই শুনতে পেলাম হুজুরের কড়া হুকুমে আজ তার অন্ন বন্ধ। সে বেচারা অভুক্ত ব'সে চণ্ডীনাম জপ করছিল,—হুজুরের কল্যাণ হোক্, কাল সকালেই না কি আবার তাকে চলে যেতে হবে, পা দুটো তার থাক আর যাক্।

ষোড়শী কহিল, আমার বাবা বুঝি হুকুম দিয়েছেন?

জীবানন্দ বলিল, শুধু তোমার বাবা কেন, গরীব দুঃখীর প্রতি দয়া দাক্ষিণ্য করতে অনেক বাবাই এ গ্রামে আছেন, আর হুজুরের সুনামে ত' স্বর্গ-মর্ত্ত্য ছেয়ে গেল। লোকটার কাছে বসে বসে তাই ভাবছিলাম অলকা, তোমার যাবার পরে সন্ন্যাসিনীর আসনে বসে এই সব বাবার দল যে তাণ্ডবকাণ্ড বাধাবে তাকে আমি সামলাবো কি করে?

ষোড়শী চুপ করিয়া রহিল। জীবানন্দ নিজেও বহুক্ষণ অবধি মৌন থাকিয়া মনে মনে কত কি যেন ভাবিতে লাগিল, অকস্মাৎ একসময়ে বলিয়া উঠিল, তোমাকে আমার বড় প্রয়োজন অলকা। দুটো দিনও কি আর তোমার থাকা চলেনা?

ষোড়শী শান্ত কণ্ঠে শুধু কহিল, না। তার পরে সে উঠিয়া গিয়া রুদ্ধ মন্দিরের দ্বারে অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রণাম করিয়া যখন ফিরিয়া আসিল, জীবানন্দ কহিল, আর একটা দিন?

ষোড়শী বলিল, না।

তবে সকল অপরাধ আমার এইখানে দাঁড়িয়ে আজ ক্ষমা করে যাও?

কিন্তু তাতে কি আপনার খুব বেশি প্রয়োজন আছে?

জীবানন্দ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, এর উত্তর আজ দেবার আমার শক্তি নেই। এখন কেবল এই কথাই আমার সমস্ত মন ছেয়ে আছে অলকা, কি করলে তোমাকে একটা দিনও ধরে রাখতে পারি। উঃ—নিজের মন যার পরের হাতে চলে যায় সংসারে তার চেয়ে নিরুপায় বুঝি আর কেউ নেই। আমার সব চেয়ে বড় দুঃখ লোকে জান্‌বে আমি তোমাকেই শাস্তি দিয়েছি, তুমি সহ্য করেছ, আর নিঃশব্দে চলে গেছ। তুমি যাবার আগে তোমার মা চণ্ডীকে জানিয়ে যাও, যে এর চেয়ে মিথ্যে আর নেই!

ষোড়শী কোন উত্তর না দিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া আসিবার মুখে সহসা জীবানন্দ দুই হাত প্রসারিত করিয়া কহিল, তোমার ঠাকুরের সুমুখে দাঁড়িয়ে আজ এই কথাটি আমাকে বলে দাও কি করলে তোমাকে আমি কেবল একটি দিন কাছে রাখ্‌তে পারি? তার পরে তুমি—

ষোড়শী পিছাইয়া গিয়া কহিল, চৌধুরী মশায়, আপনার পাইক-পিয়াদারা কি কেউ নেই যে এত অনুনয় বিনয়? আপনি ত জানেন, আমি কারও কাছে নালিশ কোরবনা।

জীবানন্দ পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল। রাগ করিলনা, প্রতিঘাত করিলনা, সবিনয়ে ধীরে ধীরে কহিল, তুমি যাও, অসম্ভবের লোভে আর তোমাকে আমি পীড়ন কোরবনা। পাইক-পিয়াদা সবাই আছে অলকা, কিন্তু, যে নিজে ধরা দেবেনা, জোর করে ধরে রেখে তার বোঝা বয়ে বেড়াবার জোর আর আমার গায়ে নেই।

ষোড়শী পথ ছাড়া পাইয়াও পা বাড়াইলনা, কহিল, আমি কোথায় যাচ্চি সে কৌতূহলও বোধ করি আর আপনার নেই?

জীবানন্দ কহিল, কৌতূহল? বোধ হয় তার সীমা নেই,—কিন্তু তাতে জ্বালাও আর নেই অলকা। আমি কেবল এই কামনা করি, সেখানে কষ্ট

তোমাকে যেন কেউ না দেয়! তোমার প্রতি যারা বিরূপ, তারা যেন তোমাকে সম্পূর্ণ ভুলে থাক্‌তে পারে। হঠাৎ গলাটা যেন তাহার ধরিয়া আসিল, কিন্তু নিজের দুর্ব্বলতাকে আর সে প্রশ্রয় দিলনা, মুহূর্ত্তে সাম্‌লাইয়া ফেলিয়া কহিল, আমি জানি, যে লোক স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে যায় তার সঙ্গে লড়াই চলেনা। যেদিন আমাদের হাতে তোমার চাবি ফেলে দিলে সেই দিন তোমার কাছে আমাদের একসঙ্গে সকলের হার হ'ল। তোমার জোরের আজ আর অবধি নেই,—তবু ত মানুষের মন বোঝেনা। যতদিন বেঁচে থাকব, এ আশঙ্কা আমার কোনদিন ঘুচ্‌বেনা।

ষোড়শী সেইখানে গড় হইয়া প্রণাম করিয়া জীবানন্দর পায়ের ধূলা মাথায় তুলিয়া লইয়া কহিল, আপনার কাছে আমার একান্ত অনুরোধ,—

কি অনুরোধ অলকা?

ষোড়শী মুহূর্ত্ত কাল নীরব থাকিয়া কহিল, সে আপনি জানেন।

জীবানন্দ একটুখানি ভাবিয়া বলিল, হয়ত জানি, হয়ত ভেবে দেখ্‌লে জান্‌তেও পারব,—কিন্তু সেই যে একদিন বলেছিলে সাবধানে থাক্‌তে,—কি জানি, সে বোধ হয় আর পেরে উঠবনা। আজই কিছুক্ষণ পূর্ব্বে এই মন্দিরের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কে দু'জন দেবতার চৌকাট ছুঁয়ে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করে শপথ করে গেল তাদের মায়ের যে সর্ব্বনাশ করেছে তার সর্ব্বনাশ না কোরে তারা বিশ্রাম করবেনা,—আড়ালে দাঁড়িয়ে নিজের কানেই ত সমস্ত শুন্‌লাম,—দুদিন আগে হলে হয়ত মনে হত, সে বুঝি আমি,—দুশ্চিন্তার সীমা থাক্‌তনা, কিন্তু আজ কিছু মনেই হলনা,—কি অলকা?

না কিছুনা, বলিয়া ষোড়শী জোর করিয়া আবার সোজা হইয়া

দাঁড়াইল। অন্ধকারে জীবানন্দ দেখিতে পাইলনা, সহসা তাহার মুখ ছাইয়ের মত সাদা হইয়া গেল। কহিল, চলুন আমার ঘরে গিয়ে একটুখানি আজ বসতে হবে। আমাকে গাড়ীতে তুলে না দিয়ে বাড়ী যেতে আপনাকে আমি দেবনা। আসুন—

গরুর গাড়ীর নিচে চাদর মুড়ি দিয়া গাড়োয়ান শুইয়াছিল, সে ষোড়শীর পায়ের শব্দ অনুভবে বুঝিয়া কহিল, মা, শৈবাল-দীঘি ত দশবারো কোশের পথ, একটু রাত থাকতে বার না হলে পৌছতে কাল পহর বেলা উত্‌রে যাবে।

ষোড়শী বলিল, আচ্ছা তাই হবে। কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া আসিয়া কহিল, কোথায় যাচ্চি বোধ করি শুন্‌তে পেলেন ?

জীবানন্দ কহিল, পেলাম বই কি।

ষোড়শী কহিল, বেশি দূর নয়। আপনার আক্রোশ এ পথটুকু অনায়াসে খুঁজে বার করতে পারবে।

কিন্তু তোমার ওপর আক্রোশ ত আমার নেই।

ঘর খুলিয়া ষোড়শী প্রবেশ করিল, কহিল, আমার একটি মাত্র কম্বল গাড়ীতে পাতা। আপনাকে বস্‌তে দিই এমন কিছু নেই। নির্ম্মলবাবু হলে আঁচল বিছিয়ে দিতাম, কিন্তু আপনাকে ত তা মানাবেনা। এই বলিয়া সে মুচকিয়া একটু হাসিয়া ঘরের কোন হইতে একখানি কুশাসন গ্রহণ করিয়া মেঝের উপর পাতিয়া দিয়া বলিল, যদি অপরাধ না নেন ত—

জীবানন্দ নিঃশব্দে উপবেশন করিয়া নীরব হইয়াই রহিল।

এতবড় শ্লেষের উত্তর না পাইয়া ষোড়শী মনে মনে বিস্মিত হইল। প্রদীপের আলো অতিশয় ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছিল, ষোড়শী উজ্জ্বল করিয়া দিয়া সেটা হাতে করিয়া জীবানন্দর মুখের কাছে আনিয়া মুহূর্ত্তকাল স্থির ভাবে থাকিয়া কহিল, কি ভাব্‌চেন বলুন্‌ ত ?

আমার ভাব্‌নার কি অন্ত আছে ?

অন্ত না থাকে আদি ত আছে, তাই বলুন।

জীবানন্দ মাথা নাড়িয়া কহিল, না, তাও নেই। যার অন্ত নেই তার আদিও থাকেনা।

ষোড়শীর মুখে আসিয়া পড়িল, বলে ও সকল কেবল দর্শন শাস্ত্রের বুলি,—শুধু বাক্য,—ও লইয়া সংসার চলেনা, কিন্তু জীবানন্দর মুখ দেখিয়া তাহার নিজের মুখে স্বর বাহির হইলনা। মনে মনে সে সত্যই বিস্ময়াপন্ন হইয়া অনুভব করিল, একটা কেবল সুচতুর উত্তর দিবার জন্যই এ কথা আজ সে বলে নাই—এ লইয়া আর বাদানুবাদ করিতে সে চাহেনা। যাহাকে একান্তই নিষ্ফল বলিয়া বুঝিয়াছে সে লইয়া আর তর্ক কেন ?

সেইখানে চুপ করিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া ষোড়শী উঠিয়া গিয়া প্রদীপ রাখিয়া হাত ধুইল, কহিল, আমার একটা অনুরোধ রাখ্‌বেন ?

কি ?

এই ঘরে একদিন আমার কাছে আপনি চেয়ে খেয়েছিলেন, আজ তেমনি আমার চাওয়ায় আপনাকে খেতে হবে।

দাও। ক্ষিদেও পেয়েচে।

সে জানি। আমরা পুরুষ মানুষের মুখের পানে চাইলেই টের পাই। এই বলিয়া ষোড়শী জল হাতে মুছিয়া লইয়া সামনেই ঠাঁই করিয়া দিল। দেবীর প্রসাদ আজ ছিলনা, কিন্তু প্রজারা আজ তাহাকে অনেক কিছু দিয়া গিয়াছিল, তাহাই পাতায় করিয়া সাজাইয়া আনিতে ষোড়শী রান্নাঘরে চলিয়া গেলে একাকী চারিদিকে চাহিয়া সেদিনের সেই দোয়াত ও কলমটা কুলুঙ্গির উপরে তাহার চোখে পড়িল। মিনিট দুই চিন্তা করিয়া সে তাহা পাড়িয়া আনিল। পকেট হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া

তাহার শাদা অংশটা ছিঁড়িয়া লইয়া প্রদীপের সুমুখে আসিয়া সে পত্র লিখিতে বসিল। বোধ হয় তিন চারি ছত্রের বেশি নয়, শেষ করিয়া ভাঁজ করিল, এবং উপরে ষোড়শীর নাম লিখিয়া তাহা পকেটে রাখিয়া দিল। খানিক পরে খাবার লইয়া ষোড়শী প্রবেশ করিল। শালপাতায় জলে-ভিজানো সরু ধানের চিঁড়া, শালপাতের ঠোঙায় দধি, আর একটা পাতায় কিছু ফল মূল ও চিনি, এবং ঘটিতে করিয়া জল আনিয়া তাহার সম্মুখে রাখিয়া দিয়া একটুখানি মলিন হাসি হাসিয়া বলিল, সেদিন ধনীর দেওয়া ঠাকুরের প্রসাদ ছিল, আর আজ গরীবের ঘরের চিঁড়ে দই আর একটু চিনি। এ কি আপনার মুখে রুচ্‌বে?

জীবানন্দ হাত মুখ ধুইয়া খাইতে বসিয়া বলিল, তুমি খেতে দিলে মুখের জন্যে ভাবিনে অলকা, কিন্তু পেটে সহ্য হলে হয়। আমার আবার সেই কলিকের ব্যথাটায়—

কথা শেষ না হইতেই ষোড়শী চক্ষের পলকে পাতাটা টানিয়া লইল। ব্যাকুল ম্লানমুখে কপালে করাঘাত করিয়া কহিল, আমার পোড়াকপাল, তাই ভুলেছিলাম! কিন্তু এ তো আপনাকে আমি প্রাণান্তে খেতে দিতে পারবনা।

জীবানন্দ নিজের কথায় লজ্জাবোধ করিয়া কহিল, বেশি না খেলে বোধ হয় ক্ষতি হবেনা।

ষোড়শী বলিল, বোধ হয়! বোধ হয় নিয়ে আপনাদের চলে, কিন্তু আমাদের চলেনা।

কিন্তু এর জন্যে ত তোমার দুঃখ হবে?

ষোড়শী চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, দুঃখ হবে কি গো? যাবার সময় তোমার মুখের খাবার কেড়ে নিয়েচি, কিচ্ছু দিতে পারিনি,—

আমি ত কেঁদেই মরে যাবো। একটু মৌন থাকিয়া হঠাৎ ভারি একটা অনুনয়ের স্বরে বলিয়া উঠিল, ওবেলা নানা ঝঞ্চাটে রাঁধ্‌তে পারিনি, এ বেলা সন্ধ্যার পরে রেঁধেচি। ভাত, মাছের ঝোল—

মাছের ঝোল কি রকম?

ষোড়শী হাসিয়া কহিল, কেন, আমি কি বিধবা না কি? আমি ত সব খাই।

এতক্ষণ পরে জীবানন্দ হাসিল, বলিল, তা'হলে সেগুলি সব নিজের জন্যে রেখে আমাকে দয়া করে ফলার খাওয়াতে গেলে কেন?

ষোড়শী তৎক্ষণাৎ কহিল, আমার দোষ হয়েচে, অপরাধ হয়েচে,—একশবার ঘাট স্বীকার করচি। যদি বলেন ত আপনার কাছে আমি দশ হাত মেপে নাকে খত্‌ দিতে পারি—এই বলিয়া সে ভিজা-চিঁড়ার পাতাটা তুলিয়া লইয়া ভাত ও মাছের ঝোল আনিতে হাসিমুখে উঠিয়া গেল।

ষোড়শীর প্রশ্নের উত্তরে জীবানন্দ যখন বলিয়াছিল তাহার ভাবনার আদি অন্ত নাই, তখন সে মিথ্যা বলে নাই, বোধ করি বাড়াইয়াও বলে নাই। এ জীবনে নিজের জীবনকে সে কখনও আলোচনার বিষয় করে নাই, এবং কোন দিন কোন প্রয়োজনই তাহার মুহূর্ত্তের প্রয়োজনকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পায় নাই। তাই, তাহার ক্ষণকালের রুমালের প্রয়োজন ক্ষণপরের ঢাকাই চাদরের ঢের বড়; তাই, আস্তরণের অভাবে শয্যায় তাহার বহুমূল্য শাল পাতা, এই জন্যই সে হাতের কাছে এ্যাশ-ট্রে না পাইলে সোণার ঘড়ির ডালার উপরে জ্বলন্ত চুরুট রাখিতে লেশমাত্র ইতস্ততঃ করেনা। ভবিষ্যৎ তাহার কাছে সত্যবস্তু নয়, যে আসে নাই সেই অনাগতের প্রতি সে ভ্রুক্ষেপ মাত্র করেনা। নারীর

যে দেহটা সে চোখে দেখিতে পায়, তাহারই প্রতি তাহার আসক্তি, কিন্তু চোখ মেলিয়া যাহাকে দেখা যায়না, সেই তাহার দেহের অতিরিক্ত যে নারীত্ব,—তাহার প্রতি তাহার কোন লোভই ছিলনা। কিন্তু গ্রহবশে, যৌবনের একান্তে আসিয়া আজ যে গহনে সে পথ ভুলিয়াছে ইহার কোন সন্ধানই সে জানিতনা। কিসের জন্য যে অলকার আশে পাশে মন তাহার অহর্নিশি ঘুরিয়া মরিতেছে, নানাবিধ কৃচ্ছ্রসাধনায় যৌবন যাহার ক্ষুব্ধ, নিপীড়িত, রূপ যাহার কঠিন ও কান্তিহীন তাহাকে অনুক্ষণ কামনা করিয়া সংসার যখন তাহার এমন বিস্বাদ হইয়া গেল, তখন কারণাতীত এই মোহের কৈফিয়ৎ সে নিজের কাছেই খুঁজিয়া পাইতনা। কোন্ অবিদ্যমানে এই রমণী যে তাহার কোন অপূর্ণতা সম্পূর্ণ করিয়া দিবে, কি তাহার প্রয়োজন এই অপরিচিত চিন্তার সে কূল পাইতনা।

ভাত খাইতে বসিয়া এক সময়ে সে বিমনা হইয়া পড়িয়াছিল। সম্মুখে, খোলা দোরের দিকে পিঠ করিয়া ষোড়শী বসিয়াছিল, দুই একটা সাধারণ প্রশ্নের ঠিক মত জবাব না পাইয়া সে বলিয়া উঠিল, আপনি কি ভাব্চেন, আমার উত্তর দিচ্চেন না।

জীবানন্দ মুখ তুলিয়া কহিল, কিসের ?

ষোড়শী বলিল, এইবারে ত আপনার চণ্ডীগড় ছেড়ে বাড়ী যাওয়া উচিত ? আর ত এখানে আপনার কাজ নেই।

জীবানন্দ বোধ হয় অন্যমনস্কতার জন্যই বুঝিতে পারিলনা, কহিল, কাজ নেই ?

ষোড়শী বলিল, কই, আমি ত আর দেখ্তে পাইনে। এ গ্রাম আপনার, একে নিষ্পাপ করবার জন্যেই আপনি এসেছিলেন! আমার

মত অসতীকে নির্ব্বাসিত করার পরে আর এখানে আপনার কি আবশ্যক আছে আমি ত দেখ্‌তে পাইনে।

কিন্তু তুমি ত অসতী নয়। এই বলিয়া জীবানন্দ চোখ মেলিয়া তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল। ক্ষণকাল মাত্র তাহাদের চোখে চোখে মিলিল, তাহার পরে ষোড়শী মুখ ফিরাইয়া লইল। কিন্তু এতক্ষণ এত কথাবার্ত্তার মধ্যে যে বস্তুটা সে লক্ষ্য করে নাই, এই ক্ষণিকের দৃষ্টিতে এই প্রথম দেখিতে পাইয়া সে যথার্থই বিস্মিত হইল। জীবানন্দর চোখে বুদ্ধির সেই অতি-তীক্ষ্ণতা ছিলনা, মুখের কথার মত চাহনি তাহার স্পষ্ট, সরল এবং স্থূল। তাহার বক্রোক্তি ও অভিমান যে এই লোকটির কাছে নিষ্ফল হইয়াছে তাহা সে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইল। একটু চুপ করিয়া কহিল, কিন্তু এ কথা ত এতদিন আমার চেয়ে আপনিই বেশি জান্‌তেন।

জীবানন্দ বলিল, কিন্তু নির্ম্মল তোমাকে ভালবাসে এ তো সত্য।

প্রত্যুত্তরে ষোড়শী তাহার আরক্ত মুখ অপরের দৃষ্টির আড়ালে রাখিয়া কহিল, সে কি আমার দোষ? আর কেউ যদি ভালবাসার কদর্য্যতায় জীবন আমার দুর্ভর করে তোলে সেও কি আমার অপরাধ? কিন্তু কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই সে তাহার মুখ দেখিয়া অনুতাপে বিদ্ধ হইয়া তাড়াতাড়ি কহিল, কিন্তু আমার দোষের জন্যে ত আর এরা দায়ী নয়? এই বলিয়া সে সম্মুখের অন্ন-পাত্রটা দেখাইয়া বলিল, খাওয়া বন্ধ হল কেন? সবই যে পড়ে রইল।

না, এই ত খাচ্চি, বলিয়া সে আহারে মন দিল।

গাড়োয়ান হাঁকিয়া কহিল, মা, আর কি বেশি দেরি হবে?

না বাবা, আর বেশি দেরি হবেনা। গলা খাটো করিয়া কহিল, চণ্ডীগড় থেকে আপনাকে কিন্তু যেতেই হবে, তা' বলে দিচ্চি।

জীবানন্দ কহিল, কোথায় যাবো বল?

কেন, আপনার নিজের বাড়ীতে। বীজ গাঁয়ে।

বেশ, তাই যাবো।

কিন্তু কালকেই যেতে হবে।

জীবানন্দ মুখ তুলিয়া বলিল, কালই? কিন্তু কাজ আছে যে। মাঠের জলনিকেশের একটা সাঁকো করা দরকার। এদের জমিগুলো সব ফিরিয়ে দিতে হবে, সে তো তোমারই হুকুম। তা' ছাড়া মন্দিরের একটা ভালো বিলি-ব্যবস্থা হওয়া চাই,—অতিথি অভ্যাগত যারা আসে তাদের ওপর না অত্যাচার হয়,—এ সব না করেই কি তুমি চলে যেতে বল্‌চ?

ষোড়শী মুস্কিলে পড়িল। কিন্তু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ সব সাধু সঙ্কল্প কি কাল সকাল পর্য্যন্ত থাক্‌বে?

জীবানন্দ এই পরিহাসে যোগ দিলনা, চুপ করিয়া রহিল।

ষোড়শী বলিল, কিন্তু আবশ্যকের চেয়ে একটা দিনও বেশি থাক্‌বেননা আমাকে কথা দিন। এবং সে কটা দিন আগেকার মত সাবধানে থাক্‌বেন বলুন?

এ কথারও সে জবাব দিলনা, নিঃশব্দে বসিয়া আহার করিতে লাগিল। ষোড়শী জিদ্ করিলনা, কিন্তু কথার চেয়ে এই নীরবতা জীবানন্দর ভিতরের পরিবর্ত্তন তাহার কাছে অধিকতর সুব্যক্ত করিল।

খাওয়া শেষ হইলে বাহিরে আসিয়া ষোড়শী তাহার হাতে জল ঢালিয়া দিল; একমাত্র গামছাটা পুঁটলির কাজে নিযুক্ত হইয়া আগে হইতেই গাড়ীর মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছিল, নিজের অঞ্চলটা সে তাহার হাতে তুলিয়া দিয়া শুধু কহিল, এই নিন্।

জীবানন্দ হাত-মুখ মুছিয়া হঠাৎ বলিল, এ কিন্তু তুমি আর কাউকে দিতে পারতেনা অলকা।

ষোড়শী আঁচলটা তাহার টানিয়া লইয়া আনত মুখে শুধু কহিল, ঘরে এসে আর একটু বসুন, গুছিয়ে নিয়ে বার হয়ে পড়তে আর বেশি দেরি হবেনা। আমাকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে তবে আপনি যেতে পাবেন।

জীবানন্দ কহিল, অর্থাৎ তোমাকে নির্ব্বাসিত করার কাজটা যেন নিঃশেষ করেই যেতে পারি। ভালো, আমি তাই করে যাবো, কিন্তু তোমারও একটা কাজ রইল। আমার কৃত-কর্ম্মের ফল আমি ভোগ কোরবনা ত কে করবে,—সে অভিযোগ আমি একটিবারও কারো কাছে করিনি,—কিন্তু যাবার সময় তোমার কাছে শুধু এইটুকু মাত্র দাবী কোরব, আমি তার বেশি আর দুঃখ না পাই। এই বলিয়া সে ঘরে আসিয়া পকেট হইতে চিঠি বাহির করিয়া ষোড়শীর হাতে দিয়া কহিল, সারাদিন তোমার খাওয়া হয়নি, এইবার কিছু মুখে দাও, আমি ততক্ষণ অন্ধকারে খানিক ঘুরে আসি। ঠিক সময়ে উপস্থিত হব। এই বলিয়া সে বাহির হইবার উপক্রম করিতেই চক্ষের পলকে ষোড়শী দ্বার রোধ করিয়া দাঁড়াইল। এত কথার মধ্যেও যে এই পরদুঃখ-বিমুখ আত্ম-সর্ব্বস্ব লোকটি তাহার না-খাইবার অতি তুচ্ছ ব্যাপারটি মনে রাখিয়াছে এই কথা মনে করিয়া তাহার স্বর ফুটিল, হাতের চিঠিখানির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ তো আমাকেই লেখা, আপনার সুমুখেই কি এ পত্র আমি পড়্‌তে পারিনে?

জীবানন্দ কহিল, পারো, কিন্তু অনাবশ্যক। এর জবাব দেবার ত প্রয়োজন হবেনা। আমাকে দুঃখ থেকে বাঁচাবার জন্যে তার ঢের বেশি দুঃখ তুমি নিজে নিয়েচ। নইলে এমন করে হয়ত তোমাকে যেতেও হোতোনা। আমার শেষ অনুরোধ এতেই লেখা আছে, তা' যদি রাখ্‌তে পারো তার চেয়ে আনন্দ আর আমার নেই।

ষোড়শী কহিল, তা' হলে পড়ি ?

জীবানন্দ চুপ করিয়া রহিল। ষোড়শী কাগজখানি হাতের উপর মেলিয়া ধরিয়া হেঁট হইয়া সেই ছত্র কয়েকের লিখনটুকু এক নিঃশ্বাসে পড়িয়া ফেলিয়া নির্ব্বাক ও নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বাহিরে তাহার নাম লিখা থাকিলেও, বস্তুতঃ, এ পত্র তাহার নয়। ভিতরে ছিল,—

ফকির সাহেব,

ষোড়শীর আসল নাম অলকা। সে আমার স্ত্রী। আপনার কুষ্ঠাশ্রমের কল্যাণ কামনা করি, কিন্তু তাহাকে দিয়া কোন ছোট কাজ করাইবেন না। আশ্রম যেখানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন সে আমার নয়, কিন্তু তাহার সংলগ্ন শৈবাল-দিঘী আমার। এই গ্রামের মুনাফা পাঁচ ছয় হাজার টাকা। আপনাকে জানি। কিন্তু আপনার অবর্ত্তমানে পাছে কেহ তাহাকে নিরুপায় মনে করিয়া অমর্য্যাদা করে, এই ভয়ে আশ্রমের জন্যই গ্রামখানি তাহাকে দিলাম। আপনি নিজে একদিন আইন ব্যবসায়ী ছিলেন, এই দান পাকা করিয়া লইতে যাহা কিছু প্রয়োজন, করিবেন; সে খরচ আমিই দিব। কাগজ-পত্র প্রস্তুত করিয়া পাঠাইলে আমি সহি করিয়া রেজেষ্টারি করিয়া দিব।

শ্রীজীবানন্দ চৌধুরী।

ষোড়শী বাহিরে গিয়া তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া ফেলিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, তুমি এত খবর কোথায় পেলে? আমি যে কুষ্ঠাশ্রমের দাসী হয়ে যাচ্চি এই বা তুমি জান্‌লে কি কোরে?

জীবানন্দ কহিল, কুষ্ঠাশ্রমের কথা অনেকেই জানে। আর তোমার কথা? আজই দেবতার স্থানে দাঁড়িয়ে যারা শপথ কোরে গেল, নিজের কানে শুনেও অন্ধকারে আমি যাদের চিন্‌তে পারিনি, তুমি তাদের চিন্‌লে কি কোরে?

ষোড়শী ইহার ঠিক জবাবটা দিতে না পারিয়া, হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, তোমার কি সংসারে আর মন নেই? সমস্ত বিলিয়ে নষ্ট করে দিয়ে কি তুমি সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যেতে চাও না কি?

প্রশ্নটা দুই জনের কানেই অদ্ভুত ঠেকিল। জীবানন্দ প্রথমে জবাব দিতে পারিলনা, কিন্তু দেখিতে দেখিতে সে কি রকম উত্তেজিত হইয়া উঠিল। বলিল, আমি সন্ন্যাসী? মিছে কথা। সংসারে আর আমি কিছুই নষ্ট করতে পারবনা। এখানে আমি বাঁচ্‌তে চাই—মানুষের মাঝখানে মানুষের মত বাঁচ্‌তে চাই। বাড়ী চাই, ঘর চাই, স্ত্রী চাই, ছেলে পুলে চাই,—আর মরণ যেদিন আট্‌কাতে পারবনা, সেদিন তাদের চোখের উপর দিয়েই চলে যেতে চাই। আমার অনেক গেছে, কত যে গেছে শুন্‌লে তুমি চম্‌কে যাবে,—কিন্তু আর আমি লোকসান করতে পারবনা।

ষোড়শী সভয়ে আস্তে আস্তে বলিল, কিন্তু আমি ত সন্ন্যাসিনী। পৃথিবীতে স্ত্রীলোকের অভাব নেই,—কিন্তু এর মধ্যে আমাকে তুমি জড়াতে চাইচ কেন?

জীবানন্দ চুপ করিয়া রহিল। পৃথিবীতে স্ত্রীলোকের অভাব আছে কি নাই, এ কথা তাহাকে বলিবার স্পর্দ্ধা যাহার হইল তাহাকে সে আর কি বলিবে?

গাড়োয়ান প্রাঙ্গণ হইতে তাড়া দিয়া বলিল, মা রাত পোহাতে যে আর দেরি নেই।

চল, বাবা যাচ্চি। এই বলিয়া ষোড়শী শেষ তেলটুকু প্রদীপের মধ্যে ঢালিয়া দিয়া ক্ষীণ দীপশিখা সমুজ্জল করিয়া দিয়া বাহির হইয়া আসিল। ঘরে তালা বন্ধ করিবার আবশ্যক ছিলনা, জীর্ণদ্বারে শুধু শিকলটি তুলিয়া

দিয়া,গলায় অঞ্চল দিয়া জীবানন্দর পদপ্রান্তে ভূমিষ্ঠ প্রমাণ করিয়া তাহার পদধূলি লইয়া কহিল, আমি চোল্‌লাম।

জীবানন্দ কহিল, খাবার সময়টুকুও হলনা।

না। প্রজারা জানে আমি ভোর বেলায় যাত্রা কোরব, তারা এসে পড়বার পূর্ব্বেই আমার বিদায় হওয়া চাই। একটু হাসিয়া কহিল, এক আধ দিন না খেলে আমাদের মরণ হয়না।

সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া জীবানন্দ তাহাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিল। গাড়ী ছাড়িয়া দিলে তাহার কানের কাছে মুখ আনিয়া কহিল, অলকা, তোমার মা একদিন তোমাকে আমার হাতে দিয়েছিলেন,তবু তোমাকে পেলামনা, কিন্তু সেদিন আমাকে যদি কেউ তোমার হাতে সোঁপে দিতেন,আজ বোধ হয় তুমি অন্ধকারে আমাকে এমন কোরে ফেলে যেতে পারতেনা।

ইহার জবাব যোড়শী খুঁজিয়া পাইলনা। শুধু কথাগুলার একটা অব্যক্ত, অপরিসীম ব্যাকুলধ্বনি তাহার দুই কান আচ্ছন্ন করিয়া রহিল। গাড়ী মোড় ফিরিবার পূর্ব্বেও সে মুখ বাড়াইয়া দেখিল শেষ নিশার প্রগাঢ় অন্ধকারে ঠিক সেইখানেই সে তেম্‌নি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

রাত্রি প্রভাত হইতে তখন খুব বেশি বিলম্ব ছিলনা, জীবানন্দ মাঠের পথ ধরিয়া তাহার গৃহে ফিরিল। কিছুক্ষণ হইতে একটা অস্ফুট কোলাহল তাহার কানে যাইতেছিল,কিছুদূর অগ্রসর হইতেই সুমুখের আকাশে ঊষার আরক্ত আভার মত রাঙা আলো তাহার চোখে পড়িল। এবং চলার সঙ্গে সঙ্গেই এই শব্দ ও আলোক উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিতে লাগিল। অবশেষে কাছাকাছি আসিয়া দেখিতে পাইল বহুলোকের ব্যর্থ চীৎকার ও ছুটাছুটির মধ্যে, বীজগ্রামের জমিদার গোষ্ঠীর প্রমোদভবন, তাহার মাতামহের অত্যন্ত সাধের শান্তিকুঞ্জ অগ্নিদাহে ভস্মীভূত হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই।

সকাল হইতে না হইতে চণ্ডীগড়ের সমস্ত ইতর-ভদ্র হাহাকার করিয়া আসিয়া পড়িল। শিরোমণি আসিলেন, রায় মশায় আসিলেন, তারাদাস আসিলেন, এবং আরও অনেক ভদ্র ব্যক্তি,—পোড়া শান্তিকুঞ্জের সব পুড়িল, না দৈবাৎ কিছু রক্ষা পাইল ; এবং যাহা পুড়িল তাহার দাম কত, এবং যাহা বাঁচিল তাহা সামান্য এবং অকিঞ্চিৎকর কি না, ইত্যাদি তথ্য সবিস্তারে ও নিশ্চয় করিয়া আহরণ করিতে ছুটিয়া আসিলেন। এবং ইহা কেমন করিয়া হইল ও কে করিল ? সকলের মাঝখানে এককড়ি নন্দী তুমুল কাণ্ড করিতে লাগিল। সর্ব্বনাশ যেন তাহারই হইয়া গেছে। সে সর্বসমক্ষে ডাক ছাড়িয়া প্রকাশ করিল যে, এ কাজ সাগর সর্দ্দারের। সে ও তাহার জন দুই সঙ্গীকে কেহ কেহ কাল অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছে। থানায় এত্তেলা পাঠান হইয়াছে, পুলিশ আসিল বলিয়া। সমস্ত ভূমিজ গোষ্ঠীকে যদি না সে এই ব্যাপারে আণ্ডামানে পাঠাইতে পারে ত তাহার নামই এককড়ি নন্দী নয়,—বৃথাই সে এতকাল হুজুরের সরকারে গোলামী করিয়া মরিল !

নির্ব্বাপিত-প্রায় অগ্ন্যুত্তাপ হইতে একটু দূরে একটা বটবৃক্ষছায়াতলে সভা বসিয়াছিল, জীবানন্দ উপস্থিত ছিলেন, তাঁহার মুখের উপর শ্রান্তির অবসন্নতা ছাড়া উদ্বেগ বা উত্তেজনা কিছুই ছিলনা, একটু হাসিয়া কহিলেন, তা'হলে তোমাকেও ত এদের সঙ্গে যেতে হয় এককড়ি। জমিদারের গমস্তাগিরি কাজে তুমি যাদের ঘরে আগুন দিয়েচ, সে খবর ত আমি জানি। আগুন লাগাতে কেউ তাদের চোখে দেখেনি, মিথ্যে সন্দেহের

উপর পুলিশ যদি তাদের অত্যাচার করে, সত্যি কাজের জন্য তোমাকেও তার ভাগ নিতে হবে।

তাঁহার কথা শুনিয়া সকলেই অবাক্ হইল। এককড়ি প্রথমে হতবুদ্ধি হইয়া রহিল, পরে ইহাকে পরিহাসের আকৃতি দিতে ওষ্ঠ হাস্যের সহিত বলিল, হুজুর মা-বাপ। আমাদের সাত পুরুষ হ'ল হুজুরের গোলাম। হুজুরের আদেশে শুধু জেল কেন, ফাঁসি যাওয়াও আমাদের অহঙ্কার।

জীবানন্দ বিরক্ত হইয়া কহিলেন, আমাকে না জানিয়ে পুলিশে খবর দেওয়া তোমার উচিত হয়নি। যা পুড়েছে সে আর ফিরবেনা কিন্তু এর উপর যদি পুলিশের সঙ্গে জুটে নতুন হাঙ্গামা বাধিয়ে দু'পয়সা উপরি রোজগারের চেষ্টা কর তা'হলে লোকসানের মাত্রা ঢের বেড়ে যাবে।

অনেকেই মুখ টিপিয়া হাসিল। এককড়ি জবাব দিতে পারিলনা,— ক্রোধে মুখ কালো করিয়া শুধু মনে মনে তাহাদের বংশলোপ কামনা করিল। নদীর দিকের চাকরদের ঘরগুলা বাঁচিয়াছিল, তাহারই দ্বিতলের গোটাদুই ঘরে উপস্থিত মত বাস করিবার সঙ্কল্প জানাইয়া জীবানন্দ অভ্যাগত হিতাকাঙ্ক্ষীর দলটিকে বিদায় দিয়া কেবল তারাদাস ঠাকুরকেই কাল সকালে একবার দেখা করিতে আদেশ করিলেন।

তারাদাস কহিল, কাল রাত্রে ষোড়শী চলে গেছে—

আমি খবর পেয়েচি।

গোটা কয়েক থালা-ঘটি-বাটি পাওয়া যাচ্চেনা—

তা'হলে সেগুলো আবার কিনে নিতে হবে।

এই অগ্নিদাহের সম্বন্ধে অচিরকাল মধ্যে মুখে-মুখে নানা কথা প্রচারিত হইয়া গেল। জমিদার সে রাত্রে গৃহে ছিলেননা, ইহা লইয়া অধিক আলোচনা অনেকের কাছেই নিষ্প্রয়োজন মনে হইল, কিন্তু ষোড়শী ভৈরবীর

যাওয়ার সহিত যে ইহার ঘনিষ্ঠ যোগ আছে,এবং এ কাজ যাহারা করিয়াছে জানিয়া বুঝিয়াও যে জমিদার তাহাদের অব্যাহতি দিলেন এই কথা লইয়া অনুমান ও সংশয় প্রকাশের অবধি রহিলনা। রায়মহাশয় বিষয়ী লোক, এককড়ির ফাঁদের মধ্যে জীবানন্দ পা দিলনা দেখিয়া ইহাঁর বিষয়-বুদ্ধির প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা শত গুণে বাড়িল, কিন্তু নিজের জন্য তিনি অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। ষোড়শীকে তাড়ানোর কাজে তিনিও একজন পাণ্ডা, এবং জমিদারের গৃহ যাহারা ভস্মীভূত করিয়া দিল তাহারা আশে পাশেই কোথাও অবস্থিতি করিতেছে এই কথা স্মরণ করিয়া বিছানার মধ্যে তাঁহার সর্ব্ব শরীর ঘর্ম্মপ্লুত হইয়া উঠিল। পাহারার জন্য চারিদিকে লোক মোতায়েন করিয়াও তিনি সারারাত্রি বারান্দায় পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। আর শুধু কি কেবল বাড়ী? তাঁহার অনেক ধানের গোলা, অনেক খড়ের মাড়, শস্য সঞ্চয়ের বিপুল ব্যবস্থা,—এই সকল রক্ষা করিতে তাঁহাকে অনুক্ষণ সতর্ক থাকিতে হইবে। ভয়ে ভয়ে দিন কাটিতে লাগিল,—তবুও দিনগুলা যাহোক্ করিয়া কাটিয়াছে, কিন্তু, ইতিমধ্যে এমন একটা কাণ্ড ঘটিল যাহাতে ভাবিয়া পার পাইবার আর পথ রহিলনা। আদালতের পরওয়ানা আসিয়া পৌঁছিল, ভূমিজ ও অন্যান্য প্রজারা একযোগে জমিদার ও তাঁহার নামে নালিশ রুজু করিয়াছে। যে জমিটা তাঁহারা একত্রে আকের চাষ ও গুড়ের কারখানা করিতে মান্দ্রাজী সাহেবকে বিক্রী করিয়াছিলেন, তাহাই বাতিল ও নাকোচ্ করিবার আবেদন। খবর আসিয়াছে কোর্টের প্রস্তাবে ও ইঙ্গিতে কলেক্টর সাহেব স্বয়ং সরজমিনে আসিয়া তদন্ত করিয়া যাইবেন। অনেক টাকার ব্যাপার, অতএব, এক-কড়ির সহযোগে অনেক ঢেরা-সই করিয়াছেন, অনেক বন্ধকী তমসুক ও কর্জ্জার খত্ প্রস্তুত করিয়াছেন,—একের বিষয় অপরকে বিক্রয় করিবার

যত প্রকার গলি-ঘুঁজি আছে অতিক্রম করিয়াছেন,—সেই সব মনশ্চক্ষে উপলব্ধি করিয়া বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। কিন্তু ইহার চেয়েও একটা বড় কথা এই যে, এই সকল হীন, মূর্খ, মৃতকল্প চাষীর দল এতবড় সাহস পাইল কি করিয়া যে গ্রামের মধ্যে বাস করিয়াও এই দুর্দ্দান্ত জীবানন্দ চৌধুরী ও জনার্দ্দন রায়ের নামে নালিশ করিয়া বসিল। জীবনের অধিকাংশ কাল যাহারা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, শীতের রাত্রে যাহারা বসিয়া কাটায়, মারীর দিনে যাহারা কুকুর বেরালের মত মরে, আবাদের দিনে এক মুষ্টি বীজের জন্য যাহারা ওই দরজার বাহিরে পড়িয়া হত্যা দেয়, তাহারা আদালতে দাঁড়াইবার টাকা পাইল কাহার কাছে? এ দুর্ম্মতি তাহাদের কে দিল? সে কি এই সোজা কথাটা ইহাদের বলিয়া দিতে পারিলনা যে কেবল জেলা-আদালতই নয়, হাইকোর্ট বলিয়াও একটা ব্যাপার আছে, যেখানে জীবানন্দ-জনার্দ্দনকে ডিঙাইয়া সাগর সর্দ্দার কখনও জয়ী হইতে পারেনা! ইংরাজের বিচারালয় ধনীর জন্য তৈরি, দরিদ্রের জন্য নয়,—তাঁহার অর্থ আছে, সামর্থ্য আছে, ব্যারিষ্টার জামাই আছে, বিশ্বস্ত উকিল-মোক্তার আছে,—এবং আরও কত-কি সুবিধা-সুযোগ আছে,—এই সকল আপনাকে আপনি বলিয়া জনার্দ্দন শক্তি ও সাহস সঞ্চয় করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সুবিধা বিশেষ হইলনা। কারণ, এ তো শুধু টাকা-কড়ি, জমি-জমা, কেনা-বেচাই নয়, এতদুপলক্ষে যে সকল আসামান্য কার্য্যগুলা সম্পন্ন করাইয়াছেন তাহার ফলস্বরূপ ফৌজদারী দণ্ডবিধি কেতাবের পাতায় পাতায় যে সকল কঠিন বাক্য লিপিবদ্ধ করা আছে, তাহাদের নিষ্ঠুর চেহারা আড়ালে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে অত্যন্ত ভয় দেখাইতে লাগিল।

এ কথা রাষ্ট্র হইতে যে অবশিষ্ট নাই সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতায় রায়মহাশয়

তাহা জানিতেন, তাই দিনের বেলাটা কোন মতে কাটাইয়া রাত্রের অন্ধকারে এককড়িকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, এবং জমিদার সরকার হইতে ইহার কিরূপ বিহিত হইতেছে জিজ্ঞাসা করিলেন।

এককড়ি কহিল, হুজুরের কাছে ত এখনও পেশ করাও হয়নি।

জনার্দ্দন রাগ করিয়া কহিলেন, করনি ত করগে। বুড়ো বয়সে কি শেষে ফাটক খাট্‌বো না কি ?

তাঁহার শঙ্কা ও ব্যাকুলতায় এককড়ি হাসিয়া বলিল, ভয় কি রায়মশায় ফাটক খাট্‌তে হয় ত আমিই খাট্‌বো আপনাদের যেতে দেবনা। কিন্তু গরীবের প্রতি দৃষ্টি রাখবেন, ভুল্‌বেন না।

জনার্দ্দন খুসি হইয়া কহিলেন, সে তো জানি এককড়ি, তুমি থাক্‌তে ভয় নেই, তুমি যা বোঝো উকিলের বাবাও তা বোঝেনা, কিন্তু জানো ত সব ? কে সাহেব না কি নিজে তদারকে আস্‌চে,—ব্যাটা মহা বদমাইস্! কিন্তু ভেতরের খবর কিছু জানো ? কে ব্যাটাদের বুদ্ধি দিলে বল ত ? টাকা কে যোগালে ?

এককড়ি অসঙ্কোচে ষোড়শীর নাম করিয়া বলিল, টাকা যোগালেন মা চণ্ডী, আর কে ? তাতেই ত তাড়াতাড়ি আড়ালে সরে গেল।

ছুঁড়ি আছে কোথায় বল ত ?

এককড়ি কহিল, কাছাকাছি কোথাও লুকিয়েচে,—জান্‌তে একদিন পারবই।

জনার্দ্দন ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, খবরটা নিয়ো। হাঙ্গামাটা কেটে যাক্, তার পরে।

এককড়ি নন্দী সেদিন এইখানে আহারাদি করিয়া অনেক রাত্রে বাড়ী গেল। অভিমান করিয়া বলিল, সেদিন সাগর সর্দ্দারের প্রসঙ্গে আপনারা

সবাই তাঁর মন যুগিয়ে মুখটিপে হাস্‌লেন, কিন্তু পুলিশের কাছে সেদিন খবরটি দিয়ে রাখলে আজ এ বিপদ আপনাদের ঘট্‌তোনা।

জনার্দ্দন সলজ্জে ত্রুটি স্বীকার করিলে, এককড়ি তখন প্রভুর সম্বন্ধে বিশেষ একটি সম্বাদ তাঁহার গোচর করিয়া কহিল, মদ খেয়ে বরঞ্চ ছিল ভাল, এখন কথা বলাই ভার। কলিক্ লেগেই আছে,—এতকালের অভ্যাস, হয়ত আর বেশি দিন নয়।

জনার্দ্দন বিশ্বাস করিতে পারিলেননা, কহিলেন সত্যি সত্যিই খায়না না কি?

এককড়ি মাথা নাড়িয়া বলিল, এটা সত্যি যে খায়না। সূর্য্যদেব পশ্চিমে ওঠাও সহজ,—কিন্তু কি জানেন রায়মশায়, ভয়ানক একগুঁয়ে লোক,—সেদিন সারাদিনের যন্ত্রণায় রাত্রে হাত পা প্রায় ঠাণ্ডা হয়ে এলো, ডাক্তার বাবু ভয় পেয়ে বল্‌লেন, আমার কথা রেখে অন্ততঃ এক চাম্‌চে খান,—হার্ট ফেল করতে পারে,—বাবুর কিন্তু ভয়ই হোলোনা। একটু হেসে বল্‌লেন, এতকালের মধ্যে ও বেচারা কখ্‌খনো ফেল্ করেনি, সমানে চলেছে, আজ যদি একদিন কোরে ফেলে ত তার দোষ দেবনা, কিন্তু আমি জীবনভরই ফেল্ করে আস্‌চি, আজ অন্ততঃ একটা দিনও আমাকে পাশ করতে দিন্। কেউ খাওয়াতে পারলেননা।

বল কি?

এককড়ি কহিল, খেয়াল চেপেছে বাড়ী মেরামত থাক্, ওই টাকায় মাঠের মাঝখানে এক সাঁকো, আর রূপসী বিলের উত্তর ধারে একটা মস্ত বাঁদ তুল্‌তে হবে। ইন্‌জিনিয়র বাবু এসেছিলেন, হিসেব করে বল্‌লেন, ও টাকায় দশখানা বাড়ী মেরামত হতে পারে। তার একভাগ এদিকে দিয়ে বাড়ীটা রক্ষে করুন। কিন্তু কিছুতেই না। দেওয়ানজী বাপের বয়সী

বুড়োমানুষ, বল্‌লেন জমিদারী বাঁধা পড়বে যে? বাবু বল্‌লেন, প্রজারা সব বছর বছর খাজ্‌না যোগাচ্চে আর মরচে! তাদের জমি বাঁচাবার জন্যে যদি জমিদারী বাঁধা পড়ে ত পড়ুকনা। ও শোধ যাবে।

রায় মহাশয় চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে বলিলেন, মাথা খারাপ টারাপ হয়নি ত?

ইহার দিন দুই পরে খবর লইয়া যখন জনার্দ্দন জানিতে পারিলেন এককড়ি আজও সে কথা হুজুরে পেশ করে নাই, তখন তিনি বিচলিত হইয়া উঠিলেন। অপদার্থ ও ভীতু বলিয়া মনে মনে তাহাকে তিরস্কার করিলেন, এবং রাত্রে সুনিদ্রা হইলনা। সাহেব হঠাৎ যদি একদিন এত্তেলা পাঠাইয়া সরজমিনে আসিয়া পড়ে ত বিপদের অবধি থাকিবেনা। সকল দিকে প্রস্তুত না থাকিলে যে কি ঘটিতে পারে বলা যায়না। স্থির করিলেন পরদিন দেখা করিয়া নিজেই সকল কথা নিবেদন করিবেন,—পরের উপর নির্ভর করিয়া সময় নষ্ট করিলে মরিতে হইবে।

সকালে একশত আটবার দুর্গানাম জপ করিলেন, শ্রীশ্রী৺চণ্ডীমাতার নাম লাল কালি দিয়া কাগজের উপরে লিখিয়া কাজটা পাকা করিয়া লইলেন, এবং হাঁচি, টিকটিকি, শূন্যকুম্ভ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার বিপত্তির বিরুদ্ধে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিয়া মোটা দেখিয়া জন চারেক লোক সঙ্গে করিয়া জমিদারের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। কিন্তু অধিকদূর অগ্রসর হইতে হইলনা, জন পাঁচ ছয় লোক ছুটিয়া আসিয়া যে খবর দিল, তাহা যেমন অপ্রীতিকর তেম্‌নি অপ্রত্যাশিত। বেশি নয়, কাঠা দশেক পরিমাণ বড় রাস্তার উপরেই একটা যায়গা কিছুদিন হইতে রায় মহাশয় দখল করিয়া ঘিরিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় ছিল, দোকান-ঘরটা এইখানে সরাইয়া আনিবেন। সম্প্রতি ৺চণ্ডীর এবং এই লইয়া ষোড়শীর সহিত তাঁহার

বাদানুবাদও হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু পরাক্রান্ত জনার্দ্দন রায়কে সে বাধা দিতে পারে নাই। এ সম্বন্ধে তাঁহার কি একটা দলিলও ছিল, কিন্তু গ্রামের লোকেরা তাহা বিশ্বাস করিতনা। আজ সকালে এইটাই তাঁহাকে বে-দখল করা হইয়াছে। জনার্দ্দন ধীরে ধীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, অনেকেই হাজির আছেন। শিরোমণি, তারাদাস, গগন চক্রবর্ত্তী এবং আরও কয়েকজন তাঁহার দলভুক্ত ভদ্রব্যক্তিদের সমক্ষে জীবানন্দ চৌধুরী নিজে হুকুম দিয়া এবং নিজের লোক দিয়া তাঁহার বেড়া ভাঙাইয়া মন্দির-সংলগ্ন ভূখণ্ডের অন্তর্গত করিয়া দিয়াছেন। কেহই প্রতিবাদ করিতে ভরসা করে নাই।

জনার্দ্দন দুঃসহ ক্রোধ দমন করিয়া সবিনয়ে কহিলেন, এ সব করার আগে হুজুর ত আমাকে একটা খবর পাঠাতে পারতেন।

জীবানন্দ হাসিয়া কহিলেন, তাতে অনর্থক দেরী হোতো বই ত নয়। খবর আপনার কাছে পৌঁছবেই জানি।

জনার্দ্দন বলিলেন, খবর পৌঁছেছে, কিন্তু একটা দিন আগে পৌঁছলে মামলা-মকদ্দমাটা হয়ত বাধত না।

জীবানন্দ তেমনি হাসিমুখে কহিলেন, এতেও ত বাধা উচিত নয় রায় মশায়। ভৈরবীদের হাতে দেবীর অনেক সম্পত্তিই বে-হাত হয়ে গেছে, আবার সেগুলো হাত বদল হওয়া দরকার।

জনার্দ্দন কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া কহিলেন, তার চেয়ে আর সুখের কথা কি আছে হুজুর। শুনতে পাই, সমস্ত গ্রামখানাই না কি একদিন মা চণ্ডীর ছিল, এখন কিন্তু—

খোঁচাটা সকলেই উপভোগ করিলেন। শিরোমণি ঠাকুর ত জনার্দ্দন রায়ের বুদ্ধি ও বাক্‌-চাতুর্য্যে উল্লসিত হইয়া উঠিলেন।

জীবানন্দর মুখের চেহারায় কোনরূপ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইলনা।

বলিলেন, তার ত্রুটি হবেনা রায় মশায়। মা চণ্ডীর সমস্ত দলিল পত্র, নক্‌শা, ম্যাপ প্রভৃতি যা কিছু ছিল আমি কলকাতায় এটর্ণির বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়েচি। কিন্তু আপনারা আমার সহায় থাক্‌বেন।

শিরোমণি জয়ধ্বনি করিলেন। কিন্তু কথাটা সত্য হইলে কোথাকার জল কোথায় গিয়া মরিবে চিন্তা করিয়া ক্রোধে ও শঙ্কায় জনার্দ্দনের মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু ইহার চেয়েও ঢের বড় বিপদ তাঁহার মাথার পরে ঝুলিতেছে স্মরণ করিয়া আজিকার মত তিনি আত্ম-সম্বরণ করিয়া গৃহে ফিরিলেন। যে উদ্দেশ্যে বাটীর বাহির হইয়াছিলেন তাহা ব্যর্থ হইল। পথে চলিতে চলিতে তাঁহার মনে হইল, আমার না হয় দু' একশ বিঘা টান ধরিতে পারে, কিন্তু নিজে যে সমস্ত চণ্ডীগড় গিলিয়া বসিয়াছেন তাহার কি? সুতরাং কথাটা যে নেহাৎ বাজে, নিছক ধোঁকা দিবার জন্যই বলা এ বিষয়ে আর সন্দেহ রহিলনা। বাড়ী ঢুকিয়া তামাকের জন্য একটা হুঙ্কার ছাড়িয়া বসিবার ঘরে পা দিয়াই কিন্তু তিনি চমকিয়া গেলেন। একধারে লুকাইয়া বসিয়া এককড়ি। তাহার মুখ শুষ্ক, চেহারা ম্লান,—কি হে, তুমি যে হঠাৎ এখানে? তোমার পাগ্‌লা মনিব ত ওদিকে লাঠালাঠি বাধিয়েচেন।

এককড়ি কহিল, জানি। আর সেই পাগলের কাছেই এখনি একবার আমাদের ছুটতে হবে।

জনার্দ্দন ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন বল ত?

এককড়ি কহিল, ছোট লোক ব্যাটাদের বুদ্ধি এবং টাকা কে জুগিয়েছে জান্‌তে পারলামনা; কিন্তু এটুকু জান্‌তে পারলাম তারা সাক্ষী মান্‌লে হুজুর গোপন কিছুই করবেননা। দলিল তৈরীর কথা পর্য্যন্ত না।

জনার্দ্দনের মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল। এই লোকটার একগুঁয়েমির

যে ভয়ানক ইতিহাস সেদিন শুনিয়াছিলেন তাহা স্মরণ হইল। তাঁহার মুখ দিয়া শুধু বাহির হইল,—এ কি লঙ্কাকাণ্ড করিবে না কি শেষে!

সাজা তামাক তাঁহার পুড়িতে লাগিল, স্নানের জল ঠাণ্ডা হইতে লাগিল, জনার্দ্দন ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলেন। জীবানন্দ তখন মন্দিরের একটা ভাঙা খিলান পরীক্ষা করিতেছিলেন, এবং তারাদাস অদূরে দাঁড়াইয়া তাঁহার প্রশ্নের জবাব দিতেছিল; জনার্দ্দন একেবারে সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন হুজুর! সমস্ত ব্যাপার একবার মনে করে দেখুন।

জীবানন্দ প্রথমে বুঝিতে পারিলেননা কিসের ব্যাপার, কিন্তু তাঁহার অস্বাভাবিক ব্যাকুলতা এবং প্রাঙ্গণের একধারে এককড়ি নন্দীকে দেখিতে পাইয়া কাল রাত্রের কথা স্মরণ হইল। বলিলেন, কিন্তু উপায় কি রায় মশায়? সাহেব জমি ছাড়তে চায়না সে সস্তায় কিনেচে,—তা'ছাড়া তার বিস্তর ক্ষতিও হবে। সুতরাং মকদ্দমা জেতা ছাড়া প্রজাদের আর ত পথ দেখিনে।

জনার্দ্দন আকুল হইয়া কহিলেন, কিন্তু আমাদের পথ?

জীবানন্দ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, সে ঠিক, আমাদের পথও খুব দুর্গম মনে হয়।

তাঁহার শান্ত কণ্ঠ ও নির্বিকার মুখের ভাব দেখিয়া জনার্দ্দন নিজেকে আর সামলাইতে পারিলেননা। মরিয়া হইয়া বলিয়া উঠিলেন, হুজুর পথ শুধু দুর্গম নয়,—জেল খাটতে হবে। এবং আমরা একা নয়, আপনিও হয়ত বাদ যাবেননা।

জীবানন্দ একটুখানি হাসিলেন, বলিলেন, তাই বা কি করা যাবে রায় মশায়। সখ করে যখন গাছ পোঁতা গেছে, তখন ফল তার খেতেই হবে বই কি।

জনার্দ্দন আর জবাব দিলেননা। ঝড়ের বেগে বাহির হইয়া গেলেন। এককড়ি সব কথা বোধ হয় শুনিতে পায় নাই, সে দ্রুতপদে কাছে আসিতেই তাহাকে চীৎকার করিয়া বলিলেন, এ আমাদের সর্ব্বনাশ করবে এককড়ি, আমার নির্ম্মলকে একটা টেলিগ্রাফ করে দাও,—সে একবার এসে পড়ুক।

চণ্ডীগড় হইতে নির্ম্মল অনেক দুঃখ পাইয়াই গিয়াছিল। ইহার ভাল এবং মন্দ সকল সংস্রব হইতে নিজেকে সে চিরকালের মত বিযুক্ত করিয়া যাইতেছে, যাইবার সময়ে ইহাই ছিল তাহার একান্ত অভিলাষ। ভগবানের কাছে কায়মনে প্রার্থনা করিয়াছিল, যাহা গত হইয়াছে তাহা আর যেন না ফিরিয়া আসে, ইহার কোন সংযোগ-সূত্রই আর যেন না জীবনে তাহার কোথাও অবশিষ্ট রহিয়া যায়। সে সোজা মানুষ। বিলাস ও সাহেবিয়ানার মধ্যে দিয়াও সে সংসারের সোজা পথটি ধরিয়াই চলিতে চাহিত। হৈমই ছিল তাহার একমাত্র,—তাহার গৃহিণী, তাহার প্রিয়তমা, তাহার সন্তানের জননী,—সৌন্দর্য্যে, স্নেহে, নিষ্ঠায়, বুদ্ধিতে ইহার বড় যে কোন মানুষই কোনদিন কামনা করিতে পারে তাহা সে ভাবিতেও পারিতনা, অথচ এত বড় সম্পদ তুচ্ছ করিয়াও যে মন তাহার একদিন উদ্‌ভ্রান্ত হইতে চাহিয়াছিল, ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত এই বিড়ম্বনা যখনই মনে হইত তখনই দুইটা কথা তাহাকে অত্যন্ত বিচলিত করিত। প্রথম এই যে, এই দুর্ম্মতির ইতিহাস তাহাকে হৈমর কাছ হইতে চিরদিন গোপন করিয়া রাখিতে হইবে! এবং দ্বিতীয়, ষোড়শীর চরিত্র। ইহার সম্বন্ধে বস্তুতঃ কিছুই সে জানেনা, তবুও যে কেন একদিন মন তাহার আসক্ত হইয়াছিল, নিজের চিত্তকে এই প্রশ্নই বারম্বার করিয়া করিয়া কেবল একটা উত্তরই নির্ম্মম নিঃসংশয়ে পাইতেছিল, ষোড়শী চরিত্রহীনা। অসম্ভব বস্তুতে মন তাহার প্রলুব্ধ হয় নাই, হইতেই পারেনা। সে পাওয়ার বাহিরে নয়, ইহা বুঝিয়াছিল বলিয়াই মন তাহার অমন করিয়া উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল।

এই কথা স্মরণ করিয়া সে এক প্রকার সান্ত্বনা লাভ করিত, এবং মনে মনে বলিত ও-পথে আর কখনও নয়। হৈমের বাপের বাড়ী, ইচ্ছা হয়, সে যাক্, কিন্তু নিজে সে চণ্ডীগড়ের নাম কখনও মুখে আনিবেনা।

সেদিন আদালত হইতে ফিরিয়া হৈমর কাছে শুনিল মায়ের চিঠি আসিয়াছে ; তিনি লিখিয়াছেন, রাত্রে লুকাইয়া ষোড়শী কোথায় যে চলিয়া গেছে কেহই জানেনা।

নির্ম্মল পরিহাসের চেষ্টায় জোর করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, কেউ জানেনা কোথায় গেছে ? সাগর সর্দ্দারও না, এমন কি জমিদার জীবানন্দ চৌধুরী পর্য্যন্ত না ?

হৈম রাগ করিয়া কহিল, তোমার এক কথা। সাগর জান্‌লেও জান্‌তে পারে, কিন্তু জমিদার জান্‌বে কি কোরে ? মেয়েদের নামে একটা দুর্নাম দিতে পার্‌লে যেন তোমরা বাঁচো !

তা বটে। বলিয়া নির্ম্মল বাহিরে যাইতেছিল, হৈম ডাকিয়া কহিল, আরও একটা কাণ্ড হয়েচে। সেই রাত্রে জমিদারের শান্তিকুঞ্জ কে একদম পুড়িয়ে দিয়েছে !

বল কি ?

হাঁ। লোকের সন্দেহ, রাগ করে সাগর পুড়িয়েছে। কিন্তু জমিদারের নামের সঙ্গে জড়িয়ে যে মিথ্যে দুর্নামটা তাঁর গ্রামের সকলে মিলে দিলে, তা' সত্যি হলে কি কখনো জমিদারেরই বাড়ী পুড়্‌তো ? তুমিই বল ?

নির্ম্মল চুপ করিয়া রহিল। হৈম কহিল, যে যাই কেন না বলুক, আমি কিন্তু নিশ্চয় জানি তিনি নির্দ্দোষী। চণ্ডীর এমন ভৈরবী আর কখনও ছিলনা। তাঁর দয়াতেই ছেলের মুখ দেখ্‌তে পেয়েচ, তা জানো ?

এ কথারও নির্ম্মল কোন উত্তর দিলনা। সকল ঘটনা জানিতে,

চিঠি লিখিয়া সকল সংবাদ সবিস্তারে আহরণ করিতে তাহার কৌতূহলের সীমা ছিলনা, কিন্তু এ ইচ্ছাকে সে দমন করিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। ষোড়শীর সকল সম্পর্ক হইতে আপনাকে সে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিবেই, এই ছিল তাহার পণ। কিন্তু পরদিন সকাল না হইতেই যখন শ্বশুরের জরুরি তার আসিয়া পড়িল এবং সন্ধ্যার মেলে শ্বাশুড়ীর চিঠি আসিল, পত্র পাওয়ামাত্র জামাই না আসিয়া পৌছিলে তাহার বৃদ্ধ শ্বশুরকে এ যাত্রা কেহই রক্ষা করিতে পারিবেনা, জেল তাঁহাকে খাটিতেই হইবে, তখন হৈম কাঁদিতে লাগিল, এবং নির্ম্মলকে আর একবার তোরঙ্গ ও বিছানাপত্র বাঁধিবার হুকুম দিয়া তাহার কাজের বন্দোবস্ত করিতে রাটী হইতে বাহির হইতে হইল।

দিন দুই পরে হৈমকে সঙ্গে করিয়া নির্ম্মল চণ্ডীগড়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল একটা ভয়ের মধ্যে সকলের দিন কাটিতেছে। কে যে কখন্ আগুন ধরাইয়া দিবে তাহার ঠিক নাই। চারিদিকে লোক নিযুক্ত হইয়াছে, কর্ত্তা শুকাইয়া যেন অর্দ্ধেক হইয়া গেছেন, কোথাও বাহির হননা,—এত বড় প্রতাপান্বিত ব্যক্তির নিজের গ্রামের মধ্যেই এতবড় দুর্গতি দেখিয়া নির্ম্মল বিস্মিত হইল। এখান হইতে বেশি দিন সে যায় নাই, কিন্তু কি পরিবর্ত্তন। খবর যাহা পাইল তাহা অত্যন্ত উল্টাপাল্টা রকমের, বিশেষ কিছু বুঝা গেলনা; কেবল একটা সংবাদে সকলেরই মিল হইল যে জমিদার জীবানন্দ চৌধুরীর মাথা খারাপ হইয়া গেছে। সে মদ ছাড়িয়াছে, প্রজাদের দিয়া নিজের বিরুদ্ধে নালিশ করাইয়া দিয়াছে, যে টাকায় পোড়া-বাড়ী মেরামত করা উচিত ছিল তাই দিয়া মাঠের সাঁকো তৈরী করাইতেছে,—এম্‌নি কত কি গল্প। কিন্তু, হঠাৎ কিসের জন্য যে এরূপ হইল, তাহা কেহই জানেনা। এই লোকটাকে নির্ম্মল

অতিশয় ঘৃণা করিত; ইহারই কাছে দরবার করিতে যাইতে হইবে মনে করিয়া সে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইল। অথচ, ব্যাপার যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে আর যে কি পথ আছে তাহাও চোখে পড়িলনা। ভূমিজ প্রজারা অত্যন্ত বিরুদ্ধ। একে ত তাহাদের সর্ব্বনাশ হইয়াছে, এবং তাহা সম্পাদন করিতে কোন চেষ্টারই ত্রুটি হয় নাই, তাহাতে তাহাদের একমাত্র শুভাকাঙ্ক্ষিণী ভৈরবী মাতার প্রতি যে অত্যাচার হইয়াছে তাহাতে ক্রোধের তাহাদের সীমা নাই। তাহারা কোন কথা শুনিবেনা। এদিকে মান্দ্রাজী সাহেবের বিস্তর ক্ষতি; তাঁহার কল-কব্জা আসিয়া পড়িয়াছে, সে ক্ষতিপূরণ করা এক প্রকার অসাধ্য ব্যাপার। জমির দখল তাঁহার চাই-ই। বিশেষতঃ, নিজে অনুপস্থিত থাকিয়া যে এটর্ণির দ্বারা তিনি কাজ চালাইতেছেন তিনি যেমন রুক্ষ, তেম্‌নি অভদ্র, তাঁহার কাছে কোন সুবিধারই আশা নাই। একমাত্র ভরসা নিজেদের মধ্যে এক হওয়া। যে হেতু, আর যাহাই হোক পিনালকোডের সেই দুরন্ত ধারাগুলো তাহাতে বাঁচিবার সম্ভাবনা। নিজেদের মধ্যে কবুল জবাব দিলে আর কোন রাস্তা নাই, অথচ, সেই পাগল লোকটা শাসাইয়া রাখিয়াছে হাকিমের কাছে সে কোন কথাই লুকাইবেনা। এই কথা নির্ম্মল হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারিত, কিন্তু আসিয়া অবধি সে যে-সকল গল্প শুনিল, বিশেষ করিয়া সেই মদ ছাড়ার কাহিনী,—হার্টফেলের ভয় দেখাইয়াও ডাক্তারে যাহাকে এক ফোঁটা গিলাইতে পারে নাই, সেই ভীষণ একগুঁয়ে লোকটার মাথায় হঠাৎ কি খেয়াল চাপিয়াছে কে তাহার কৈফিয়ৎ দিবে? অথচ, সে আসিয়াছে এই দুর্ম্মদ, একান্ত অবোধ ব্যক্তিকে সুবুদ্ধি দিতে। তাহাকে বুঝাইতে হইবে, ভয় দেখাইতে হইবে, অনুনয় বিনয় করিতে হইবে,—কি যে করিতে হইবে সে কিছুই জানেনা। এই অত্যন্ত অপ্রীতিকর কার্য্য হইতে নির্ম্মলের সমস্ত চিত্ত

যেন বিদ্রোহ করিতে লাগিল, কিন্তু উপায় কি? দুষ্কৃতকারী যে হৈমর পিতা। তাহাকে যে বাঁচাইতেই হইবে। হৈম কাঁদিতে লাগিল, শাশুড়ী কাঁদিতে লাগিলেন, এককড়ি চোরের মত আনাগোনা করিতে লাগিল, শ্বশুর না খাইয়া শয্যা গ্রহণ করিলেন,—অথচ মাঝে কেবল একটি দিন বাকি, পরশু দিন আসিবেন হাকিম তদন্ত করিতে।"

অপরাহ্ণের কাছাকাছি জীবানন্দের সহিত দেখা হইল তাহার মাঠের মাঝখানে। এতকাল জলনিকাশের পথ ছিলনা, তাই সাঁকো তৈরী হইতেছিল। প্রশান্ত হাস্যে দুই হাত বাড়াইয়া আসিয়া জীবানন্দ তাহাকে গ্রহণ করিয়া কহিল, আপনার আসার খবর আমি কালই পেয়েছি। ভাল আছেন আপনি? বাড়ীর সব ভাল? তাহার কথায় আচরণে গরিমা নাই, কৃত্রিমতা নাই,—যেমন সহজ, তেম্নি খোলা—তাহাকে সন্দেহ করিবার অবকাশ মাত্র নাই। এতখানির জন্য নির্ম্মল প্রস্তুত ছিলনা; তাহার আপনাকে আপনি যেন ছোট মনে হইল। মাথা যদি ইঁহার খারাপ হইয়াও থাকে ত, লজ্জা পাইবার নয়। জীবানন্দর কুশল প্রশ্নের উত্তর নির্ম্মল শুধু মাথা নাড়িয়াই দিল, এবং প্রতি-প্রশ্ন করিবার কথা হঠাৎ তাহার মনে হইলনা। জীবানন্দ কহিল, আপনি কুটুম্ব মানুষ, সমস্ত গ্রামের আদরের বস্তু, কিন্তু ইচ্ছে করে এমন যায়গায় এসে দেখা করলেন যে—সহসা মিস্ত্রি ও মজুরদের প্রতি দৃষ্টি পড়ায় কহিল, বাবারা আজ আমাদের একটু রাত্রি পর্য্যন্ত খাট্‌তে হবে। সপ্তাহ ধরে মেঘ করচে, আজকালের মধ্যেই হয়ত জল হবে। কিন্তু তা'হলে ত কোন-মতেই চল্‌বেনা। আমরা এমন কাজ করে যাবো যে আমাদের নাতি-পুতিদের পর্য্যন্ত ঘাড় নেড়ে বল্‌তে হবে যে, হাঁ, সাঁকো যারা করেছিল তাঁরা সত্যিকারের দরদ দিয়েই করেছিল। সেই ত আমাদের মেহন্নতয়ানা!

লোকগুলা গলিয়া গেল। বীজগাঁয়ের ভয়ঙ্কর জমিদার একসঙ্গে খাটিতেছেন, তাঁহার মুখের এই কথা ; তাহারা সমস্বরে প্রতিজ্ঞা করিয়া জানাইল যে তাহাদেরও সেই ইচ্ছা। জ্যোৎস্না যদি না মেঘে ঢাকে ত, তাহার রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত কাজ করিবে।

নির্ম্মল কহিল, আপনার সঙ্গে আমার একটু কাজ আছে।

জীবানন্দ বলিল, আর একদিন হলে হয় না ?

না, আমার বিশেষ প্রয়োজন।

জীবানন্দ হাসিল ; কহিল, তা বটে। অকাজের বোঝা বহাতে যাঁরা এতদূরে টেনে এনেছেন তাঁরা কি আপনাকে সহজে ছেড়ে দেবেন।

খোঁচাটা নির্ম্মলের গায়ে বাজিল। সে কহিল, সে তো ঠিক কথা। অকাজ মানুষে করে বলেই ত সংসারে আমাদের প্রয়োজন চৌধুরী মশায়। না হলে আপনাকেই বা এই মাঠের মাঝখানে বিরক্ত করবার আমার প্রয়োজন হ'ত কেন ?

জীবানন্দ কিছুমাত্র রাগ করিলনা, তেমনি প্রসন্ন মুখে বলিল, আমি কিছুমাত্র বিরক্ত হইনি নির্ম্মল বাবু। যে জন্য আপনি এসেছেন সে যে আপনার কর্ত্তব্য, এ বিষয়েও আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, না হলে আপনিই বা আসবেন কেন ? কিন্তু কর্ত্তব্যের ধারণা ত সকলের এক নয়। রায়মহাশয়ের আমি অকল্যাণ কামনা করিনে ; আপনার আসার উদ্দেশ্য সফল হলে আমি বাস্তবিক খুসি হব, কিন্তু আমার কর্ত্তব্যও আমি স্থির করে ফেলেচি, এ থেকে নড়চড় করা আর সম্ভব হবেনা।

নির্ম্মলের মুখ ম্লান হইল। সে একটু ভাবিয়া কহিল, দেখুন, এ ভালই হল যে অপ্রিয় আলোচনার ভূমিকার অংশটা আপনি দয়া করে আমাকে

উত্তীর্ণ করে দিয়ে গেলেন। এসে অবধি আপনার সম্বন্ধে আমি অনেক কথাই শুনেচি—

জীবানন্দ সহাস্যে বলিল, একটা এই যে আমার মাথা ঠিক নেই, সত্য কিনা বলুন?

নির্ম্মল কহিল, সংসারে সাধারণ মানুষের বিচার বুদ্ধির সঙ্গে অকস্মাৎ কারও কর্ত্তব্যের ধারণা যদি অত্যন্ত প্রভেদ হয়ে যায় ত দুর্নাম একটা রটেই। এ কথা কি সত্য যে আপনি সমস্তই স্বীকার করবেন?

জীবানন্দ কহিল, সত্য বই কি। তাহার কণ্ঠস্বরে গাম্ভীর্য্য নাই ঠোঁটের কোনে হাসির রেখা, তথাপি নির্ম্মল নিঃসংশয়ে বুঝিল ইহা ফাঁকি নয়। বলিল, এমন ত হতে পারে আপনার কবুলজবাবে আপনিই শুধু শাস্তি পাবেন, কিন্তু আর সকলে বেঁচে যাবেন।

জীবানন্দ কহিল, নির্ম্মলবাবু, আপনার কথাটা হ'ল ঠিক সেই পাঠশালার গোবিন্দর মত। পণ্ডিত-মশাই! মুকুন্দও যে আম চুরি করছিল! অর্থাৎ, বেতটা চারিয়ে না পড়লে তার পিঠের জ্বালা কমবেনা? এই বলিয়া সে হাসিতে লাগিল। তাহার সকৌতুক হাসির ছটায় নির্ম্মলের মুখ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল দেখিয়া সে জোর করিয়া তাহা নিবারণ করিয়া কহিল, রক্ষে করুন আপনি, ঐ আমি স্বপ্নেও চাইনে। আমার কৃত-কর্ম্মের ফল আমি ভোগ করলেই যথেষ্ট। নইলে, রায় মশায় নিস্তার লাভ করে সুস্থ-দেহে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করতে থাকুন, এবং আমার এককড়ি নন্দী মশায়ও আর কোথাও গমস্তাগিরি কর্ম্মে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করতে থাকুন, কারও প্রতি আমার কোন আক্রোশ নেই।

নির্ম্মল আইন ব্যবসায়ী, সহজে হাল ছাড়িবার পাত্র নয়, কহিল, এমন

ত হতে পারে কারও কোন শাস্তি ভোগ করারই আবশ্যক হবে না অথচ, ক্ষতিও কাউকে স্বীকার করতে হবেনা।

জীবানন্দ তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া বলিল, বেশ ত, পারেন ভালই। কিন্তু আমি অনেক চিন্তা করে দেখেচি সে হবার নয়। কৃষকেরা তাদের জমি ছাড়বেনা। কারণ, এ শুধু তাদের অন্ন-বস্ত্রের কথা নয়, তাদের সাত পুরুষের চাষ-আবাদের মাঠ, এর সঙ্গে তাদের নাড়ীর সম্পর্ক। এ তাদের দিতেই হবে। একটু চুপ করিয়া কহিল, আপনি ভালই জানেন, অন্যপক্ষ অত্যন্ত প্রবল, তার উপর জোর-জুলুম চলবেনা। চল্‌তে পারে কেবল চাষাদের উপর কিন্তু চিরদিন তাদের প্রতিই অত্যাচার হয়ে আসচে, আর হতে আমি দেবনা।

নির্ম্মল মনে মনে প্রমাদ গণিয়া কহিল, আপনার বিস্তীর্ণ জমিদারী, এই ক'টা চাষার কি আর তাতে স্থান হবেনা? কোথাও না কোথাও—

না না, আর কোথাও না,—এই চণ্ডীগড়ে। এইখানে আমি জোর করে তাদের কাছে ছ'হাজার টাকা আদায় করেচি,—আর সে টাকা যুগিয়েছেন জনার্দ্দন রায়,—সে শোধ করতেই হবে। কিন্তু অপ্রীতিকর আলোচনায় আর কাজ নেই, নির্ম্মলবাবু আমি মনস্থির করেচি।

এই ছ'হাজার টাকার ইঙ্গিত নির্ম্মল বুঝিলনা, কিন্তু এটা বুঝিল যে তাহার শ্বশুর মহাশয় অনেক পাকে আপনাকে জড়াইয়াছেন যাহা মুক্ত করা সহজ নয়। সে শেষ চেষ্টা করিয়া কহিল, আত্মরক্ষায় সকলেরই ত অধিকার আছে, অতএব শ্বশুর মশায়কেও করতে হবে। আপনি নিজে জমিদার, আপনার কাছে মাম্‌লা-মোকর্দ্দমার বিবরণ দিতে যাওয়া বাহুল্য,—শেষ পর্য্যন্ত হয়ত বা বিষ দিয়েই বিষের চিকিৎসা করতে হবে।

জীবানন্দ মুচকিয়া হাসিয়া কহিল, চিকিৎসক কি জাল-করার বিষে খুন করার ব্যবস্থা দেবেন ?

নির্ম্মলের মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। কহিল, জানেন ত, অনেক সময়ে ওষুধের নাম করলে আর খাটেনা। সে যাই হোক্, আপনি জমিদার, ব্রাহ্মণ, বয়সে বড়, আপনাকে শক্ত কথা বলবার ইচ্ছে আমার নেই; কিম্বা হঠাৎ কি কারণে আপনার ধর্ম্ম-জ্ঞান এরূপ প্রচণ্ড হয়ে উঠ্লো তাও জান্‌বার কৌতূহল নেই, কিন্তু একটা কথা বলে যাই যে, এ জিনিস আপনার স্বাভাবিক নয়। গভরমেণ্ট যদি প্রসিকিউট করে ত, জেলের মধ্যে একদিন তা' উপলব্ধি করবেন। আপনি সর্পকে রজ্জু বলে ভ্রম করচেন।

জীবানন্দ কহিল, এ কথা আপনার সত্য কিন্তু ভ্রম যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ রজ্জুটাই ত আমার সত্য !

নির্ম্মল বলিল, কিন্তু তাতে ত মরণ আটকাবেনা। আরও একটা সত্য কথা আপনাকে বলে যাই। এই সব নোংরা কাজ করা আমার ব্যবসা নয়। আপনাকে আমি অতিশয় ঘৃণা করি, এবং এক পাপিষ্ঠের জন্য আর এক পাপিষ্ঠকে অনুরোধ করতে আমি লজ্জা বোধ করি। কিন্তু সে আপনি বুঝবেননা—সে সাধ্যই আপনার নেই।

জীবানন্দর মুখের উপর কোন পরিবর্ত্তন দেখা গেলনা। লেশ মাত্র উত্তেজনা নাই, তেম্‌নি সৌম্য শান্ত কণ্ঠে কহিল, কিন্তু আপনাকে আমি ঘৃণা করিনে নির্ম্মলবাবু, শ্রদ্ধা করি। এ বোঝবার সাধ্যও ত আপনার নেই ! তাহার নির্ব্বিকার স্বচ্ছন্দতায় নির্ম্মল জ্বলিতে লাগিল, এবং এই প্রত্যুত্তরকে কদর্য্য উপহাস কল্পনা করিয়া তিক্তকণ্ঠে বলিল, চোর ডাকাতদের মধ্যেও বিশ্বাস বলে একটা বস্তু আছে, নিজেদের মধ্যে তারাও তা ভাঙে না। বিশ্বাসঘাতককে তারা ঘৃণা করে। কিন্তু জীবনী-ব্যাপী দুরাচারে

বুদ্ধি যার বিকৃত; তার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করে লাভ নেই—আমি চল্‌লাম। এই বলিয়া সে চক্ষের পলকে পিছন ফিরিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। জীবানন্দ চাহিয়া দেখিল অনেকেই হাতের কাজ বন্ধ করিয়া সবিস্ময়ে চাহিয়া আছে। সে ম্লানমুখে শুধু একটু হাসিয়া বলিল, সময় যেটুকু নষ্ট করলি বাবারা, সেটুকু কিন্তু পুষিয়ে দিস্।

কথাটা নির্ম্মলের কানে গেল।

দিন চারেকের মধ্যেই কৃষককুলের চিরদিনের দুঃখ দূর করিয়া জল-নিকাশের সাঁকো তৈরি শেষ হইল, গ্রাম গ্রামান্তর হইতে ভিড় করিয়া লোক দেখিতে আসিল, কিন্তু যে ইহা নির্ম্মাণ করিল সেই জীবানন্দ শয্যাগত হইয়া পড়িল। এ পরিশ্রম সে সহ্য করিতে পারিলনা। এই অজুহাতে এবং সাহেবের সহিত দেখা করিয়া নানা কৌশলে নির্ম্মল তদন্তের দিন এক সপ্তাহ পিছাইয়া দিতে পারিয়াছিল, কিন্তু সে দিনও সমাগতপ্রায়। কেবল দুটা দিন বাকি। বাঁচিবার একমাত্র পথ ছিল, এবং তাহাই অবলম্বন করিয়া জনার্দ্দন তারাদাসকে দিয়া চণ্ডীমাতার বিশেষ পূজার ব্যবস্থা করাইলেন, এবং নিজে মন্দিরের একান্তে বসিয়া সকাল সন্ধ্যায় কায়মনে ডাকিতে লাগিলেন মায়ের কৃপায় যেন এ যাত্রা জীবানন্দ আর না উঠে। সাহেব সর-জমিনে আসার পূর্ব্বেই যেন কিছু একটা হইয়া যায়! মেয়েকে লইয়া ষোড়শীর হাতে-পায়ে গিয়া পড়ার কথাও মনে হইয়াছিল, কারণ ছোট-লোকদের যদি কেহ ঠেকাইতে পারে ত কেবল সেই পারে, কিন্তু কোথায় সে? যে গাড়োয়ান তাহাকে লইয়া গিয়াছিল বহু চেষ্টাতেও তাহার সন্ধান মিলে নাই। সাতদিনের সময় পাইয়া হৈমর নিশ্চিত ভরসা হইয়াছিল ছেলেকে সঙ্গে করিয়া গিয়া একবার কাঁদিয়া পড়িতে পারিলে সে কিছুতেই না বলিতে পারিবেনা। কিন্তু সে আশা যে বৃথা হইতে বসিল।

এই কয়দিন প্রায় প্রত্যহই নির্ম্মলকে সদরে যাইতে হইতেছিল। এই যে বিশ্রী মামলাটা বাধিবে, তাহার সকল ছিদ্র পথই যে আগে হইতে বন্ধ করা আবশ্যক। সেদিন দুপুর বেলায় সে রেজেষ্ট্রী আফিসের বারান্দার একধারে একখানা বেঞ্চের উপর বসিয়া কতকগুলা প্রয়োজনীয় দলিল পত্রের নকল লইয়া নিবিষ্টচিত্তে পড়িতেছিল, হঠাৎ সুমুখেই ডাক শুনিল, জামাইবাবু সেলাম। ভাল আছেন?

নির্ম্মল চমকিয়া মুখ তুলিয়া দেখিল, ফকির সাহেব। তাঁহারও হাতে একতাড়া কাগজ। তাড়াতাড়ি উঠিয়া অভিবাদন করিয়া তাঁহার দুইহাত ধরিয়া পাশে বসাইয়া কহিল, শুনেছিলাম আপনাকে ডাক্‌লেই আপনার দেখা মেলে। এ কয়দিন মনে মনে আমি প্রাণপণে ডাকছিলাম।

ফকির হাসিলেন, কহিলেন, কেন বলুন ত?

যোড়শীকে আমার বড় প্রয়োজন। তিনি কোথায় আছেন আমাকে দেখা করতেই হবে।

ফকির বিস্মিত হইলেননা, আনন্দও প্রকাশ করিলেননা, বলিলেন, দেখা না হওয়াই ত ভাল?

নির্ম্মল অত্যন্ত লজ্জিত হইল। কহিল, আপনি হয়ত সর্ব্বজ্ঞ। তা' যদি হয়, জানেন ত আমাদের কত বড় প্রয়োজন।

ফকির কহিলেন, না আমি সর্ব্বজ্ঞ নয়, কিন্তু মা-যোড়শী কোন কথাই আমাকে গোপন করেননা। একটু থামিয়া বলিলেন, দেখা হওয়া না হওয়ার কথা তিনিই জানেন, আমি জানিনে, কিন্তু তাঁর সমস্ত ব্যাপার আপনাকে জানাতে আমার বাধা নেই। কারণ, একদিন যখন সবাই তাঁর সর্ব্বনাশে উদ্যত হয়েছিল, তখন আপনিই একাকী তাঁকে রক্ষা করতে দাঁড়িয়েছিলেন। আমি তাঁর মুখেই এ কথা শুনেছি।

নির্ম্মল কহিল, আর আজ ঠিক সেইটি উল্টে দাঁড়িয়েছে ফকির সাহেব। এখন, কেউ যদি তাঁদের বাঁচাতে পারে ত শুধু তিনিই পারেন।

ফকিরের মুখ অপ্রসন্ন হইল। ইহার বিস্তৃত বিবরণের জন্য তিনি কৌতূহল প্রকাশ না করিয়া কেবল কহিলেন, চণ্ডীগড়ের খবর আমি জানিনে। কিন্তু আমি বলি, তাঁদের ভাল করার ভার ভগবানের উপর আপনি ছেড়ে দিন। আমার মাকে আর এর মধ্যে জড়াবেননা নির্ম্মলবাবু।

বিগত দিনের সমস্ত দুঃখের ইতিহাস নির্ম্মলের মনে পড়িল। ইহার জবাব দেওয়া কঠিন, সে শুধু কুণ্ঠার সহিত প্রশ্ন করিল, এখন তিনি কোথায় আছেন?

যায়গাটাকে শৈবাল-দিঘী বলে।

সেখানে সুখে আছেন?

এইবার ফকির মৃদু হাসিয়া কহিলেন, এই নিন্। মেয়েমানুষের সুখে থাকার খবর দেবতারা জানেননা, আমি ত আবার সন্ন্যাসী মানুষ। তবে মা আমার শান্তিতে আছেন এইটুকুই অনুমান করতে পারি।

নির্ম্মল ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আদালতে আপনি কোথায় এসেছিলেন?

ফকির কহিলেন, তা' বটে। সন্ন্যাসী ফকিরের এ স্থান নিষিদ্ধ হওয়াই উচিত। কিন্তু সংসারের মোহ ত মানুষকে সহজে ছাড়েনা বাবা, তাই শেষ বয়সে আবার বিষয়ী হয়ে উঠেচি। ভাল কথা, বিনা পয়সায় আপনার মত আইনজ্ঞ ব্যক্তিও আর পাবোনা, এবং আপনাকেই কেবল বলা যায়। আমার এই কাগজগুলি যদি দয়া করে একবার দেখে দেন।

নির্ম্মল হাত বাড়াইয়া কহিল, এ কিসের কাগজ?

একটা দান-পত্রের খসড়া। এই বলিয়া ফকির তাঁহার কাগজের

বাণ্ডিল নির্ম্মলের হাতে তুলিয়া দিলেন। পরের কাজ করিবার মত সময় ও প্রবৃত্তি নির্ম্মলের ছিলনা; সে নিস্পৃহের মত তাহা গ্রহণ করিল, এবং ধীরে ধীরে তাহার পাক খুলিয়া পাঠে নিযুক্ত হইল। কিন্তু কয়েক ছত্র পরেই অকস্মাৎ তাহার চোখের দৃষ্টি তীব্র, মুখ গম্ভীর এবং কপাল কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। এই দানের সম্পত্তি অকিঞ্চিৎকর নয়, কয়েক পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া তাহার বিবরণ, সেইগুলির উপর কোনমতে চোখ বুলাইয়া লইয়া অবশেষে শেষ পাতায় আসিয়া যখন তাহার জীবানন্দর সেই চিঠিখানার প্রতি দৃষ্টি পড়িল, তখন লাইন কয়েকের সেই লিখনটুকু এক নিঃশ্বাসে পড়িয়া ফেলিয়া নির্ম্মল স্তব্ধ হইয়া রহিল।

ফকির তাহার মুখের ভাব লক্ষ্য করিতেছিলেন, বলিলেন, সংসারে কত বিস্ময়ই না আছে!

নির্ম্মলের মুখ দিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল, সে ঘাড় নাড়িয়া শুধু কহিল, হাঁ।

ফকির কহিলেন, খসড়াটা ঠিক ত?

নির্ম্মল কহিল, ঠিক। কিন্তু এ যে সত্য তার প্রমাণ কি?

ফকির বলিলেন, নইলে এ দান ষোড়শী নিতেননা। এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হবে নির্ম্মলবাবু? এই বলিয়া তিনি উৎসুক নেত্রে চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু জবাব পাইলেননা। নির্ম্মলের চোখের দৃষ্টি ঝাপ্‌সা এবং কপাল কুঞ্চিত হইয়াই রহিল, মন যে তাহার কোথায় গিয়াছিল ফকির বোধ করি তাহা অনুমান করিতেও পারিলেননা।

অকস্মাৎ দিন কয়েকের অবিশ্রান্ত বারিপাতে সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম্ম এমন অচল হইয়া গেল, যে অপ্রতিহত-গতি জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটও তাঁহার তদন্তের চাকাটাকে ঠেলিয়া আনিতে পারিলেননা। তবে তাঁহার হুকুম ছিল, ধরণ করিলেই তিনি চণ্ডীগড়ে পদার্পণ করিবেন, এবং সেই হুকুম তামিলের দিন পড়িয়াছে আজ। খবর পৌঁছিয়াছে গ্রামের বাহিরে বারুইয়ের তীরে তাঁহার তাঁবু খাটানো হইতেছে, মুর্গী, আণ্ডা, দুধ, ঘি প্রভৃতি যোগান দেওয়ার কাজে এককড়ি প্রাণপান্ত পরিশ্রম করিতেছে এবং খুব সম্ভব দ্বিপ্রহরের এদিকেই চণ্ডীগড়ে তাঁহার ঘোড়ার পদধূলি পড়িবে।

শেষ রাত্রি হইতে বর্ষণ থামিয়াছে, কিন্তু আকাশের চেহারা বদলায় নাই। এ মূর্ত্তি দেখিয়া জোর করিয়া বলিবার যো নাই দুর্য্যোগ থামিল, কিম্বা চারিদিক আবার আকুল করিয়া আসিবে। বাড়ী পোড়ার পরে, বাহিরের দিকে যে দ্বিতল ঘর দুখানিতে জীবানন্দ আশ্রয় লইয়াছিল, তাহারই একটি ক্ষুদ্র বারান্দায় ক্যাম্প খাট পাতিয়া সে সকাল বেলায় বারুইয়ের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া চুপ করিয়া পড়িয়াছিল। পাহাড়ের ঘোলা জল নামিয়া নদীর সেই শীর্ণ দেহ আর নাই; উদ্দাম স্রোত তট-প্রান্তে সবেগে আঘাত করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে;—জীবানন্দ কত কি যে ভাবিতেছিল তাহার ঠিকানা নাই। জ্বর এবং তাহার আজন্ম সহচর বক্ষশূল কমিয়াছিল, কিন্তু সারে নাই। আজও সে শয্যাশায়ী উঠিতে হাঁটিতে পারেনা। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের পৌঁছানোর খবর পাইলে সে পাল্কিতে করিয়া নিজে গিয়া দেখা করিবে। মিথ্যা কিছুই বলিবে না তাহা

সে স্থির করিয়াছে,—যেমন করিয়া মদ-ছাড়া সে স্থির করিয়াছিল, ঠিক তেমনি করিয়া ; যেমন করিয়া সে সঙ্কল্প স্থির করিয়াছিল এ জীবনে দুঃখ কাহাকেও আর দিবেনা, ঠিক তেমনি করিয়াই ইহাও সে স্থির করিয়াছিল। কিন্তু আজ যথার্থই তাহার কাহারও বিরুদ্ধে কোন বিদ্বেষ, কোন নালিশ ছিলনা ; সে মনে মনে এই বলিয়া তর্ক করিতেছিল যে, অপরাধ ত মানুষেই করে, অন্যায় ত মানুষের জন্যই সৃষ্টি হইয়াছে, সুতরাং তাহার সাক্ষ্যে সে ছাড়া আর কেহ শাস্তি পাইবে চিন্তা করিয়া সে বাস্তবিক বেদনা বোধ করিতেছিল। কি করিয়া বলিলে যে কাহারও কোন ক্ষতি হয়না এই কথাই যে কতরূপে সে আলোচনা করিতেছিল তাহার নির্দ্দেশ নাই, কিন্তু কোন বিষয়ই সুশৃঙ্খলায় শেষ পর্য্যন্ত ভাবিবার মত অবস্থা তাহার ছিলনা, তাই ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবল একই সমস্যা একই মীমাংসা লইয়া বার বার তাহার সুমুখে আসিতেছিল, এবং এই লইয়া সে যখন প্রায় হয়রান হইয়া উঠিয়াছিল, এমনি সময়ে সম্পূর্ণ একটা নূতন জিনিসের উপরে গিয়া তাহার মন এবং দৃষ্টি একই সময়ে স্থিতিলাভ করিল। একখানা ছোটো নৌকা স্রোতের অনুকূলে অত্যন্ত দ্রুতবেগে আসিতেছিল, এবং তাহার বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্রই মাঝি ডাঙার উপরে নোঙ্গর ছুড়িয়া ফেলিয়া তাহার গতিরোধ করিল। এ নদীতে নৌকা চলাচল অত্যন্ত বিরল। বৎসরের অধিকাংশ দিন যথেষ্ট জল থাকেনা বলিয়াই শুধু নয়, বর্ষাকালেও একটানা খরস্রোতে যাতায়াতের সুবিধা বড় হয়না। বিশেষতঃ, তাহারই বাটীর সম্মুখে আসিয়া যখন এমন করিয়া থামিল, তখন কৌতূহলে সে বালিসে ঠেস দিয়া উঁচু হইয়া বসিয়া দেখিল জন দুই পুরুষ এবং তিন জন রমণী নামিয়া আসিতেছেন। ঘন-পল্লব গাছের অন্তরালে ইঁহাদের স্পষ্ট দেখা না গেলেও একজনকে জীবানন্দ নিশ্চয়

চিনিতে পারিল, তিনি জনার্দ্দন রায়। প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকটি খুব সম্ভব তাঁহার পত্নী এবং অপরটি তাঁহার কন্যা ; হয়ত, কোথাও গিয়াছিলেন ম্যাজিষ্ট্রেট আসার সম্বাদ পাইয়া ত্বরা করিয়া ফিরিয়াছেন। শুধু একটা কথা সে বুঝিতে পারিলনা নিজেদের ঘাট ছাড়িয়া এতদূরে আসিয়া নৌকা বাঁধিবার হেতু কি ? হয়ত, সুবিধা ছিলনা, হয়ত, ভুল হইয়াছে, হয়ত বা ম্যাজিষ্ট্রেটের দৃষ্টিপথে পড়া তাঁহার ইচ্ছা নয় ; কিন্তু সে যাই হোক, লোকটি যখন রায় মহাশয় ও তাঁহার স্ত্রী ও কন্যা তখন কষ্ট করিয়া বসিয়া থাকা নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া জীবানন্দ আবার শুইয়া পড়িল। চোখ বুজিয়া সে মনে মনে হাসিয়া কহিল, অপরাধের সাজা দিবার মালিক কি একা আদালত ? এই মানুষটিকে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব হয়ত কখনো দেখেও নাই, দেখিলেও হয়ত চিনিতনা, তবুও ইহার শঙ্কা ও সতর্কতার অবধি নাই। স্ত্রী ও কন্যার কাছে এই যে ভীরুতার লজ্জা, দণ্ডের পরিমাণে ইহাই কি সামান্য ?

সহসা কে একজন আসিয়া তাহার শিয়রের দিকে বসিয়া পড়ার চাপে তুচ্ছ ক্যাম্প-খাটখানা মচ্ করিয়া উঠিল। জীবানন্দ চমকিয়া চাহিয়া কহিল, কে ? বারান্দায় প্রবেশ করিবার পদশব্দও সে কাহারও পায় নাই। যে বসিয়াছিল সে তাহার কপালের উপর একটা হাত রাখিয়া কহিল, আমি।

জীবানন্দ হাত বাড়াইয়া সেই হাতখানি নিজের দুর্ব্বল হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পরে আস্তে আস্তে বলিল, এই নৌকাতে তুমি এলে ?

হাঁ।

রায়মহাশয় তোমাকে ধরে নিয়ে এলেন তাঁকে বাঁচাতে হবে ?

হাঁ, কিন্তু সে হৈমর বাবাকে, জনার্দ্দন রায়কে নয়।

বুঝেচি। কিন্তু প্রজারা মকদ্দমা ছাড়বে কেন সাগর স্বীকার করবে কেন?

আমার কাছে তারা স্বীকার করেচে।

করেচে? আশ্চর্য্য। এই বলিয়া সে চুপ করিয়া রহিল।

ষোড়শী কহিল, না, আশ্চর্য্য নয়। আমাকে তারা মা বলে।

আমি তা' জানি। জীবানন্দর হাতের মুঠা শিথিল হইয়া আসিল; সে কিছুক্ষণ স্থিরভাবে থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল, ভালই হয়েছে। আজ সকলে থেকেই আমি ভাবছিলাম অলকা, এই ভয়ানক শক্ত কাজ আমি কোরব কি করে? আমি বাঁচলাম আর আমার কিছুই করবার রইল্না। তুমি সমস্তই করে দিয়েচ।

ষোড়শী মাথা নাড়িয়া কহিল, তোমার করবার আর কিছু না থাকতে পারে কিন্তু আমার কাজ এখনো বাকি রয়ে গেছে—এই বলিয়া সে জীবানন্দর যে হাতটা স্খলিত হইয়া বিছানায় পড়িয়াছিল, তাহা নিজের মুঠার মধ্যে গ্রহণ করিয়া তাহার কানের কাছে মুখ আনিয়া কহিল, নৌকো আমার প্রস্তুত, কোনমতে তোমাকে নিয়ে পালাতে পারলেই আমার এই সকল কাজের বড় কাজটা সারা হয়। চল। এই বলিয়া সে হেঁট হইয়া মাথাটা তাহার জীবানন্দর বুকের উপর রাখিয়া স্থির হইয়া রহিল। বহুক্ষণ কেহই কোন কথা কহিলনা, কেবল একজনের প্রবল বক্ষস্পন্দন আর একজন নিঃশব্দে অনুভব করিতে লাগিল।

জীবানন্দ কহিল, কোথায় আমাকে নিয়ে যাবে?

ষোড়শী কহিল, যেখানে আমার দুচোখ যাবে।

কখন যেতে হবে?

এখনই। সাহেব এসে পড়বার আগেই।

জীবানন্দ তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া ধীরে ধীরে কহিল, কিন্তু আমার প্রজারা? তাদের কাছে আমাদের পুরুষানুক্রমে জমা-করা ঋণ?

ষোড়শী তাহার দৃষ্টি এড়াইয়া চুপি চুপি বলিল, পুরুষানুক্রমেই আমাদের তা শোধ দিতে হবে।

জীবানন্দ খুসি হইয়া বলিল, ঠিক কথা অলকা। কিন্তু দেরি করলে ত চল্‌বেনা। এখন থেকেই ত আমাদের দুজনকে এ ভার মাথায় নিতে হবে।

ষোড়শী সহসা দুই হাত জোড় করিয়া কহিল, হুজুর দাসীকে এইটুকু শুধু ভিক্ষে দেবেন প্রজাদের ভার নেবার চেষ্টা করে আর ভারি ক[illegible] তুল্‌বেননা। সমস্ত জীবন ধরেই ত নানাবিধ ভার বয়ে এসেছেন, এখন অসুস্থ দেহে একটু বিশ্রাম করলে কেউ নিন্দে করবেনা। কিন্তু [illegible] সাহেব এসে পড়তে পারে, চলুন। প্রত্যুত্তরে জীবানন্দ শুধু একটুখা[illegible] হাসিয়া তাহার হাত ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, এমন কোরে আমার সমস্ত ক্ষমতা তুমি কেড়ে নিয়োনা অলকা,—আমাকে দুঃখীর কাজে লাগিয়ে দেখো কখ্‌খনো ঠক্‌বেনা।

কথা শুনিয়া অলকার দুই চক্ষু সহসা ছল্ ছল্ করিয়া আসিল, এবং এমন একান্ত আত্মসমর্পণের দ্বারা যে তাহার সর্ব্বস্ব জয় করিয়া লইয়াছে তাহারই মুখের প্রতি চাহিয়া তাহার পদতলের মাটিটা পর্য্যন্ত যেন অকস্মাৎ কাঁপিয়া দুলিয়া উঠিল; কিন্তু আপনাকে সে তৎক্ষণাৎ সম্বরণ করিয়া লইয়া হাতের উপরে একটু চাপ দিয়া হাসিয়া বলিল, আচ্ছা চল ত এখন নৌকায় বসে তখন ধীরে সুস্থে ভেবে দেখ্‌বো কি কি ক্ষমতা তোমার দেওয়া যেতে পারবে এবং কি কি একেবারেই দেওয়া চল্‌বেনা।

সেই ভালো। বলিয়া জীবানন্দ ষোড়শীর হাত ধরিয়া অগ্রসর হইল।

সমাপ্ত

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

১। বিরাজবৌ (দশম সংস্করণ)	...	১৸০
ঐ হিন্দি সংস্করণ (প্রথম সংস্করণ)	...	১।০
২। বিন্দুর ছেলে (দশম সংস্করণ)	...	২৲
৩। বড়-দিদি (অষ্টম সংস্করণ)	...	১৲
৪। পণ্ডিত মশাই (তৃতীয় সংস্করণ)	...	১।০
৫। অরক্ষণীয়া (ষষ্ঠ সংস্করণ)	...	॥০
৬। বৈকুণ্ঠের উইল (তৃতীয় সংস্করণ)	...	১৲
৭। মেজদিদি (পঞ্চম সংস্করণ)	...	১।০
৮। চন্দ্রনাথ (ষষ্ঠ সংস্করণ)	...	॥৹
৯। পরিণীতা (দ্বাদশ সংস্করণ)	...	১৲
১০। দেবদাস (তৃতীয় সংস্করণ)	...	১।০
১১। শ্রীকান্ত—১ম পর্ব্ব (তৃতীয় সংস্করণ)	...	১॥০
১২। শ্রীকান্ত—২য় পর্ব্ব (তৃতীয় সংস্করণ)	...	১॥০
১৩। কাশীনাথ (তৃতীয় সংস্করণ)	...	১॥০
১৪। নিষ্কৃতি (চতুর্থ সংস্করণ)	...	॥০
১৫। চরিত্রহীন (তৃতীয় সংস্করণ)	...	৩॥০
১৬। স্বামী (সপ্তম সংস্করণ)	...	১৲
১৭। দত্তা (চতুর্থ সংস্করণ)	...	২॥০
১৮। ছবি (তৃতীয় সংস্করণ)	...	॥০
১৯। গৃহদাহ (প্রথম সংস্করণ)	...	৪৲
২০। পল্লীসমাজ (নবম সংস্করণ)	...	॥০
২১। বামুনের মেয়ে (দ্বিতীয় সংস্করণ)	...	১॥০
২২। নব-বিধান	...	১৲

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।